ওঁ তৎ সৎ।

অথ হিমাদ্রি শিখরে।

দ্বিতীয় পুষ্প

লেখক—
পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী

মূল্য—২॥০

শ্রীবদ্রীনারায়ণের স্তুতি।

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল হেমমন্দির শোভিতম্।
নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল শ্রীবদ্রীনাথজী বিশ্বম্ভর ॥১॥
শেষ সমীরণ করত নিশিদিন ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্।
শ্রীবেদ ব্রহ্মা করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথজী বিশ্বম্ভর ॥ ২ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ধ্বনিকর ধূপ দীপ প্রকাশিতম্।
সিদ্ধ মুনিজন করত জয় জয় শ্রীবদরীনাথজী বিশ্বম্ভর ॥৩॥
শক্তি গৌরী গণেশ শারদ নারদমুনি উচ্চারণম্।
যোগ ধ্যানি অপার লীলা শ্রীবদরীনাথজী বিশ্বম্ভর ॥৪॥
যক্ষ কিন্নর করত কৌতুক জ্ঞান গন্ধর্ব্ব প্রকাশিতম্।
শ্রীলক্ষ্মী কমলা চামর ঢোলে শ্রীবদরীনাথজী বিশ্বম্ভর ॥৫॥
কৈলাশ মে এক দেব নিরঞ্জন শৈল শিখর মহেশ্বরম্।
রাজা যুধিষ্ঠির করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথজী বিশ্বম্ভর ॥৬॥
শ্রীবদরীনাথজীকে পঞ্চরত্ন পটত পাপ বিনাশনম্।
কোটী তীর্থ ভয়েৎ পুণ্য প্রাপ্তয়ে ফল দায়কম্ ॥৭॥

ভূমিকা

স্বামী যোগানন্দ সরস্বতীর সহিত আমার বহু দিন হইল আলাপ পরিচয় ও সখ্য হইয়াছে—তিনি একজন সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী, উপবীত গ্রহণের অল্প কয়দিন পরই সন্ন্যাস লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন, আকুমার ব্রহ্মচারী এই স্বামীজি অতি অমায়িক ও শিশুসুলভ সরল। তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছি· তিনি নিজে জীবন বিপন্ন করিয়াও হিমগিরির দুর্গম শিখরে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, আবার চীন, জাপান, তিব্বত, আফগানিস্থান ও ভারতের প্রায় সম্পূর্ণ তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়াছেন—তাঁহার মুখে হিমাচলের রহস্য কাহিনী ও দুর্গম পথের ইতিবৃত্ত বিস্ময়ে পুলকে স্তব্ধ হইয়া শুনিয়াছিলাম—তখন হইতেই তাঁহার বাসনা ছিল এই ভ্রমণ কাহিনী গ্রন্থকারে প্রকাশিত করা।

কৈলাসপতির কৃপায় আজ সেই ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হইল পরমভাগবত শ্রীমান অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থ প্রকাশে অকুণ্ঠ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, ভগবান্ এই মহাপ্রাণ সেবকের মঙ্গল বিধান করুণ এই প্রার্থনা।

এই গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ার জন্য স্বামীজি আমায় আদেশ করেন। তাঁহার এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কটী কথা নিবেদন করিব—নতুবা ভূমিকা লিখিবার মতন ও স্পর্দ্ধা আমার নাই।

নগাধিরাজ হিমাচল – 'অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল' শুভ্র তুষার কিরিটিনী কাঞ্চন জঙ্ঘা "অভ্রভেদী তুষার শৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মরাগ" চিরদিনই রহস্যের হাতছানি দিয়া ডাক দিয়াছে—সাধু তপস্বী, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এই ডাকে সাড়া দিয়াছেন, বহু তপস্বী সাধু, সন্ন্যাসী সংসারের কলকোলাহল হইতে দূরে নির্জনে এই হিমাচলের শান্তিময় ক্রোড়ে পরম পুরুষ ও চিরআরাধ্য হৃদয়-দেবতার ধ্যান করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক এই পর্ব্বতের শিখরের উচ্চে উঠিয়া রহস্য ভেদ করিতে ব্যস্ত, দুর্লভ ভেষজ রত্ন ও শিলাজতুর সন্ধানেও বহু রাসায়নিক ইহার অভ্যন্তরে বারবার অধ্যবসায়ের সহিত ভ্রমণ করিয়াছেন—এই পূণ্যভূমি ভারতের শীর্ষদেশে এই হিমাচল ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মতনই চিরদিন নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, সুগম্ভীর।

স্বামীজি এই পর্ব্বত শিখরে প্রায় ১৮ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছেন বহু দুর্গম ও ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহার বর্ণনা সাবলীল ও মনোমুগ্ধকর বহু পৌরাণিক আখ্যায়িকা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীকে সমৃদ্ধ করিয়াছে—আশা করা যায় এই গ্রন্থ সুধী সমাজকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে।

আমার উপর এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের ভার দিয়া স্বামীজি আমাকে বিপন্ন করিয়াছেন কারণ আমার সময় অল্প এবং প্রেসের গোলযোগ বশতঃ সমস্ত প্রুফ সময় মতন দেখা সম্ভব হয় নাই—এই জন্য বহু বর্ণাশুদ্ধি ও ভুল থাকা সম্ভব। গুণগ্রাহী পাঠক সমাজ এইসব ত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করিয়া লইবেন। 'সজ্জনাঃ গুণ-মিচ্ছন্তি' মধুমক্ষিকার ন্যায় সজ্জন পাঠকগণ ইহার মধ্যে ক্ষীরই অন্বেষণ করিবেন ইহাই আশা করা যায়। পরিশেষে যাঁহার কৃপায়

এই গ্রন্থখানি সুধী সমাজে প্রচারিত হইতে চলিল যাঁহার কল্যাণ হস্ত এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিল তাঁহারই উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাভক্তির সচন্দন অর্পিত করিয়া ভূমিকাটী শেষ করিলাম।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যদকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥

৭।১ হেসাম্ রোড, ভবানীপুর
মাঘী পূর্ণিমা
১৩৫৬ সাল।

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ভাগবতরত্ন।



নারায়ণেষু—

নিবেদনঃ

এই 'হিমাদ্রি শিখরে' গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য বহু বন্ধুবান্ধব আমায় বারংবার উৎসাহিত করিয়াছেন কিন্তু নানাকারণে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ইহার প্রকাশ সম্ভব হয় নাই।

হিমাচলের মধ্যে অনন্ত তীর্থ অনন্ত ঋষি দেবতা ও মহাপুরুষাদি অনন্তকাল ধরিয়া হেথায় তপস্যা করিয়াছেন ও করিতেছেন এই হিমাচলের মহিমা বর্ণনা করা আমার মতন ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে অসাধ্য। হিমাচলের মধ্যে কৈলাস শিখরে সদাশিব চির গৌরবে বিরাজিত আছেন। কৈলাস শিখরে শব্দের অর্থ—কৈ অর্থাৎ কৈবল্য মুক্তি ল াশ অর্থা বিলাস। শিখর শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুঝায়—সুতরাং কৈলাস শিখরকে সাক্ষাৎ শিবলোক বলা হয়। শিবলোক সকল প্রাণীর ও জীবের শেষ গন্তব্যস্থান। সংসারের যাবতীয় উৎকৃষ্ট পদার্থ এই কৈলাসে বিরাজমান তজ্জন্য তাহার শোভা মধুরতা সৌন্দর্য এত চিত্তাকর্ষক।

পরিশেষে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য জেলা খুলনার অন্তর্গত বকচর নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীমান অজিৎকুমার চক্রবর্ত্তী উদারতা পূর্ব্বক আর্থিক সাহায্য করিয়া হিমালয়ের তীর্থ প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারবর্গের মন সদাই ভগবৎ সেবায় নিমগ্ন থাকুক।

মদ্রচিত গায়ত্রীর ও প্রণবের ব্যাখ্যা 'মুক্তিপথ' নামক পুস্তকে ইতি-পূর্ব্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সমগ্র ব্যয়ভার পরম ভাগবত শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভাগবতরত্ন মহাশয় বহন করিয়াছিলেন। ইনি সেসন্ জজ সরকারী কার্য্যের গুরুভারে বিপন্ন হইয়াও হিমাদ্রিশিখরে গ্রন্থখানির প্রুফ সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠা দৃঢ়তর হউক ও ভগবৎকৃপা তাঁহার উপর অনন্তকাল বর্ষিত হউক। প্রেসের গোলযোগ ও অন্যান্য বহু কারণ জন্য যথোচিত প্রুফ সংশোধন করা সম্ভব হয় নাই তজ্জন্য পাঠক পাঠিকাগণ ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলি মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

বিধাতু বিশ্বরূপস্য তস্যোচ্ছায়া প্রভাবতঃ।
তস্যা জ্যোতিম্ময়াদ্ দেবা জ্যোতিরূপেণ নির্গতঃ॥
হিমাদ্রি শিখরে গ্রন্থস্তন্নাম শুদ্ধতাং গতঃ।
তদ্‌বিশ্বমূর্ত্তিপূজায়াম্ অস্তুদীপঃ শিবান্বিতঃ॥

সেই বিশ্বরূপী বিধাতার ইচ্ছা-প্রভাবে, সেই জ্যোতির্ম্ময়-লীলাময় দেবতা হইতে জ্যোতিঃ-রূপে নির্গত এবং তাঁহারই নামের দ্বারা শুদ্ধতা-প্রাপ্ত এই মহাগ্রন্থ হিমাদ্রি শিখরে তাঁহারই বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বনাথের পূজার উপচারস্বরূপ মঙ্গলময় প্রদীপ হউক।

ইত্যোম্

শিবমস্তু

মাঘী পূর্ণিমা
১৩৫৬ সাল

গ্রন্থকারস্য
শ্রীমৎ যোগানন্দ সরস্বতী

সূচী পত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভ্রমণের সার্থকতা	...	১
হিমালয় পঞ্চম খণ্ড	...	৭
ঘণ্টাকর্ণ	...	১৩
গন্ধমাদন পর্ব্বত	...	২৪
পুরাণে শ্রীবদ্রীনাথ	...	২৯
কেদার খণ্ড	...	৩২
বিশালপুরী বা বদরী বিশাল	...	৩৪
শ্রীবদরীনাথের বিগ্রহ	...	৩৮
শ্রীবদ্রীনাথের বর্ত্তমান বিগ্রহ	...	৪৩
পঞ্চপাণ্ডব তথা বদ্রীনাথ	...	৪৯
ভগবান নর-নারায়ণ	...	৫৩
মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে নরনারায়ণের বর দান	...	৫৮
নৈমিষারণ্যে প্রহ্লাদের সঙ্গে যুদ্ধ	...	৬১
শ্রীবদ্রীনাথের নিকটবর্ত্তী অন্য তীর্থ	...	৬৮
অগ্নি তীর্থ	...	৭১
পঞ্চশীলা	...	৭৭
নারদশীলা	...	৭৯
মার্কণ্ডেয়শীলা	...	৮১

বিষয়		পৃষ্ঠা
নরসিংহ লীলা ও বাবাহীলীলা	...	৮১
ব্রহ্মকপাল মোচন তীর্থ ও ব্রহ্মকুণ্ড হইতে মাতা মূর্ত্তি পর্য্যন্ত তীর্থ	...	৮৩
ইন্দ্রধারা তীর্থ	...	৮৪
মাতা মূর্ত্তি তীর্থ	...	৮৬
মাতা মূর্ত্তি হইতে সৎপথ বা স্বর্গারোহণ যাত্রা	...	৮৭
চতুঃস্রোত তীর্থ	...	৯২
সত্যপথ তীর্থ	...	৯৫
সোমকুণ্ড তীর্থ	...	৯৬
শ্রীরাম গুহা	...	১০৪
অলকাপুরি	...	১০৭
বসুধারা হইতে বদ্রীপুরি	...	১০৮
মুচুকুন্দ গুহা	...	১১০
কলাপ গ্রাম	...	১১১
চতুর্ব্বেদধারা	...	১১২
পঞ্চবদরী	...	১১৩
শ্রীবদ্রীকাশ্রম যাত্রা	...	১১৭
শ্রীনগর	...	১২৮
রুদ্রপ্রয়াগ	...	১৩১
কর্ণপ্রয়াগ	...	১৩২
নন্দপ্রয়াগ	...	১৩৪
যোশী মঠ	...	১৩৭
বিষ্ণুপ্রয়াগ	...	১৩৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
বদ্রীনাথপুরি	...	১৪৩
কেদার হইয়া বদ্রীনাথ	...	১৪৬
গুপ্তকাশী	...	১৪৮
শ্রীকেদারনাথ দর্শন	....	১৫৩
গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী হইয়া বদ্রীনাথ	....	১৬১
যমুনোত্রী	....	১৬৬
উত্তর কাশী	....	১৬৯
গঙ্গোত্রী	....	১৭৪
গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাত্রা ডেরাডুন মসুরী হইয়া	....	১৭৭
গঙ্গোত্রী হইতে কেদারনাথ	....	১৭৮
নন্দপ্রয়াগ হইতে গরুড় হইয়া আলমোরা	....	১৮০
কর্ণ প্রয়াগ হইয়া রাণীখেত	...	১৮২
কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা	....	১৮৪
কৈলাস দর্শন	....	১৯৬
লিঙ্গাষ্টকম	....	১৯৯
শিবলিঙ্গ ও শিবরাত্রি	....	২০০
লিঙ্গের প্রথম প্রাদুর্ভাব	...	২০৪
কৈলাসানন্দ	....	২১০
অন্য একটী মহাপুরুষের দর্শন	....	২১৫
মানস সরোবর	...	২২৫
রাক্ষস তাল	...	২৩৭
আলমোড়া	...	২৪৯

পরিশিষ্ট

চটির দূরত্ব

চটির নাম		মাইল
হরিদ্বার হইতে বদ্রীনাথ		১৮৪
সত্যনারায়ণ	,,	৮
ঋষিকেশ	,,	৭
লক্ষণ ঝোলা	,,	৩
গরুর চট্টি	,,	২
গুলর চট্টি	,,	৪
মহাদেব সৈন	,,	১
নাইমোহন	,,	১
ছোট বিজনী	,,	২
বড় বিজনী	,,	১
ম্যোডখাল	,,	১
কুণ্ড চট্টি	,,	ঃ
বন্দরভেল	,,	৩
মহাদেব সৈণ	,,	৩
সেমল চট্টি	,,	৪
কাঁডী ,,	,,	৩
ব্যাসঘাট	,,	৪
ছালড়ী	,,	২
উমরাসু		২
সোড়		৩
দেবপ্রয়াগ	,,	২
বিদ্যাকোটী	,,	৪
সীতাকোটী	,,	২
রাণীবাগ	,,	১॥০
কোল্টা	,,	১॥০

চটির নাম		মাইল
রামপুর	,,	২
অরকনী	,,	৩
বিল্বকেদার	,,	২
শ্রীনগর		
সুকতা		৫
ভট্টিসেরা		২
হাতীখাল		১
খাংকরা		৩
নরকোটা		৩
পঞ্চভাইয়ের চড়াই		১
গুলাবরায়		৩
রুদ্রপ্রয়াগ		
শিবানন্দী		৮
কনেড়া		৬॥০
গোচর		২॥০
চটুয়া পীপল		২
করণ প্রয়াগ		৪
উমট্টা		২
কৈকংডী		২
লঙ্গাসু		২
সোনলা		৪
নন্দ প্রয়াগ		৩
মৈঠাণা		৩
কোহেড়		২
চমোলী		২

চটির নাম	মাইল	চটির নাম	মাইল
মঠ	২	রামপুর	১
ছিনকা	২	অগস্ত্যমুনি	৪॥৹
কাবলা	২	সোড়ী	২
সিয়্যাসৈন	১	চন্দ্রাপুরি	২
হাট	৩	ভোরী	২॥৹
পীপলকোটী	২	কুণ্ড	৩॥৹
গরুর গঙ্গা	৩॥৹	গুপ্তকাশী	২॥৹
টংগনী	১॥৹	নালা চট্টী	১॥৹
পাতালগঙ্গা	৩	নারায়ণকুটী	২
গুলাবকুটী	২	ব্যোগমল্লা	১॥৹
হেলঙ্গ (কুমারচট্টি)	৩	মৈখণ্ডা	২
খনেটী	২	কাটা	২
ঝড়কুলা	২	রামপুর	৩
সিংহধারা	৩	ত্রিযুগীনারায়ণ	৪॥৹
জ্যোতির্ম্মঠ	১	সোমধারা	৩॥৹
বিষ্ণুপ্রয়াগ	২	গৌরিকুণ্ড	৩
ঘাট	৪॥৹	রামবাড়া	৪
পাণ্ডুকেশ্বর	৩॥৹	কেদারনাথ	৩
শেষধারা	১	কেদারনাথ হইতে বদ্রীনাথ	১০১
লামবগড়	২	কেদার হইতে নালাচট্টী	১৯
হনুমানচট্টি	৩	উখীমঠ	৩
বদ্রীনাথ	৩	গণেশচট্টী	৩॥৹
হরিদ্বার হইতে কেদারনাথের রাস্তার দূরত্ব	১৪৯	পোথিবাসা	৪
হরিদ্বার হইতে রুদ্রনাথ	৯৫	বনিয়াকুণ্ড	২
রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ছতোলী	৫	চোপথা	১
মঠ	১	তুঙ্গনাথ	৩
		জঙ্গলচট্টি	৩

চটির নাম	মাইল	চটির নাম	মাইল
পাংগর বাসা	২॥০	ডণ্ডোটী	২॥০
মণ্ডলচট্টী	৪	রাণাগাঁও	২
গোপেশ্বর	৪॥০	হনুমান ,,	২
চমোলী	৩॥০	খরসালী	৪
বদ্রীনাথ	৪৮	যমনোত্রী	৪
হরিদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ হইয়া যমুনোত্রী	১৬৬	যমনোত্রী হইতে গঙ্গোত্রী	৯৮
হরিদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ	৫৮	যমনোত্রী হইতে সিমলী	২৫
দেবপ্রয়াগ হইতে খর্সাড়া	১০	সিগোট	৭॥০
কোটেশ্বর	৪	নাকোরী	৩॥০
বনড্যা	৬	উত্তর কাশী	৬
ক্যারী	৮	যমনোত্রী হইতে উত্তর কাশী	৪২
টিহরা	৬	হরিদ্বার হইতে উত্তর কাশী	১৩৬॥০
সরাই	৫॥০	গঙ্গোরী	৩
ভল্ডিখানা	৬	নৈতালা	৩
ছাম	৫	মনেরী	৪
নগুণ	৫	কুম্থালটা	৪
ধরাসু	৫	মল্লাচট্টি	২
কল্যাণী	৪	ভটবাড়ী	২
গেণ্ডলা	৫	ভুকী	৬
সিলক্যারী	৫	গঙ্গানানী	৩
রাড়ীধার	৫	লোহারীনাগ	৪
ডংড়ালগাঁও	২	সুকী	৫
সিমলী	২	ঝালা	৩
গঙ্গানী	২	হর্সিল	২
যমুনা চট্টী	৬	ধরালী	২॥০
ওজরী	৬	জাংগলা	৪
		ভৈরোঘাটী	২॥০

চটির নাম	মাইল
ভৈরোঘাটী হইতে গঙ্গোত্রী	৬॥০
যমনোত্রী হইতে ,,	৯৮
হরিদ্বার হইতে ,,	১৯৬
গঙ্গোত্রী হইতে কেদারনাথ	১২১
গঙ্গোত্রী হইতে মল্লা	৪০
মল্লা হইতে স্যালী	৩
প্যালু	৩
ছুনা	২
বেলক	৪
পঙ্গরাণা	৫
ঝালা	৪
বুড়া কেদার	৫
ভোলাচট্টি	৪
ভৈরবচট্টী	৩
ভোটাচট্টী	২
ধূত্তচট্টি	৭
গোমাংডা	৪
ছফন্দা	৩
পংবালী	৩
মগু	১০
ত্রিযুগী নারায়ণ	৫
কেদারনাথ	১৩২

যাত্রা প্রত্যাবর্ত্তন

বদ্রীনাথ হইতে কর্ণপ্রয়াগ	৬৮
কর্ণপ্রয়াগ হইতে ঋষীকেশ	১০০
কর্ণপ্রয়াগ হইতে রামনগর	৯৮॥০
কর্ণপ্রয়াগ হইতে সিমলী	৪

চটির নাম	মাইল
সিরৌলী	২
ভটোলী	১॥০
আদিবদ্রী	৪
খেতী	৩॥০
জোকাপানী	১॥০
দিবালী খাল	২
থাড়গবেরা	৪
ধনার ঘাট	১॥০
মৈলচৌরী	৫
গনাই	৯॥০
ভ্যাড়	৫॥০
মাসী	২॥০
বৃদ্ধ কেদার	৪
ভিকিয়া সৈন	৩
শ্রীকোট	৩
বাসোট	২
থালখান	৩॥০
গুজর ঘাটী	৩
মছোড্ড	৩
পণ বাঘোখন	২
গোদী	২
টোটা আম	৬
সৌরাল	২
কুমরিয়া	৩
মোহন	৩
গঙ্গরিয়া	৫
রামনগর রেল	৮

চটির নাম	মাইল
যোশী মঠ হইতে কৈলাস	১৩০
যোশী মঠ হইতে তপোবন	৭
দার্ব্বাগ্রাম	১৫
দমপৃম গ্রাম	১০
নীতীঘাটী	১০
শিবচিলিঙ্গ	২০
জ্ঞানিমা মণ্ডী	২২
তীর্থপুরি	১২
তাকলাকোঠ	১২
তোয়	২
দারচীন	২০
কৈলাস হইতে মানস সরোবর	১০
তাকলা কোট হইতে কেছরনাথ	১০
মানস সরোবর হইতে জীজগুম্ফা	৮
বুম্বপু	১২
ডিগুফুগুম্ফা	৯
গৌরীকুণ্ড	৫
ঝিগুগুম্ফা	১৩
রাক্ষসতাল	৮
বর্খা	৭
লীপুলেখ	৬

চটির নাম	মাইল
প্রত্যাবর্ত্তন	
লীপুলেখ হইতে আলমোড়া	১৭৪
পালা	৭
শাঙ্কম	৮
কালাপানী	১০
গার্বিয়াং	১০
বুধি	৭
মালপা	৭
জুপতী	১০
সিরখা	১২
তিথল	৪
পীথল	৬
খেলা	৬
ধারচুলা	১১
দিদির হাট	৯
থল	১০
বেরীনাগ	১০
গণাই	১২
সীরাখাট	৭
ধোলচীন	১১
বারছীনা	৫
আলমোড়া	৭

হিমাদ্রি শিখরে

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম খণ্ড।

ভ্রমণের সার্থকতা।

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র-পদানু-সর্পণে,
শিরো হৃষীকেশ পদাভিবন্দনে
কামং চ দাস্যে ন তু কাম কাম্যয়া,
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়ারতিঃ॥

প্রাণি মাত্রেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য, ভগবৎ প্রাপ্তি সুখের উপলব্ধি আমি সুখী হই, দুঃখ যেন আমার জীবনে না আসে, যে রকম জীব অহং—আমি, এই শরীরকেই মনে করিয়া থাকে এই যে সুখ শব্দ ইহা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের ভোগের বিষয় বলিয়া ক্ষণিক সুখ, প্রকৃত সুখ যাহা শাস্ত্রে দেখা যায়—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" এই যে সুখানন্দ যদি জীব কিঞ্চিৎমাত্রও অনুভব করিতে পারে, তবে সেই যে সুখ এবং সেই যে আনন্দ জীবনে কখনও ভুলিতে পারে না। বিষয় সুখ জীবনে প্রচুর পরিমাণ লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু একটী কথা নির্বিবাদে স্বীকার করিতে হইবে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত বড় বড় জ্ঞানী, বিদ্বান্ ও মহাপুরুষেরা যাহা অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, বিষয় সুখ ক্ষণিক, অস্থায়ী, স্বল্প, সুখ কেবল শরীরের নয়, মনের, মন সদা কামনা বাসনায় পূর্ণ। মন যদি

নির্ব্বিষয় হয়, তবে ভোগের যত বস্তু সব কাক বিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ মনে হয়, (মনঃ নিবৃত্তি পরমো শান্তিঃ) জীবের একামত্র দুঃখের কারণ বিশ্বাসের অভাব, নির্ভরতার অভাব, যদি মন নির্ম্মল হয়, শুদ্ধ হয়, তবে দেখিবে মনের ভিতর প্রবল একপ্রকার শক্তি আসে, তখন পূর্ণভাবে নির্ভরতাও আসে, এই মনের শক্তি অর্জ্জন করিবার একমাত্র প্রধান উপায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা, সমস্ত শাস্ত্রে ও ঋষি-মুনির উপদেশ দুই ধারায় রহিয়াছে, এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ একমাত্র ব্রহ্মরূপ, ইহার অতিরিক্ত কিছুই নাই, ব্রহ্ম সত্য, আনন্দ তাঁহার স্বরূপ, এখন বিচার করা যাক্—যখন ব্রহ্ম সত্য তখন কেবল মাত্র আনন্দই আনন্দ, দুঃখ কোথা হইতে আসিবে ?

অন্য মতের লোক বলিয়া থাকে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহা মিথ্যা কেমন করিয়া মানিব ? যদি তোমার শরীরের কোন স্থানে ব্যধি হয়, তখন তোমার সেই আনন্দ কোথায় যায়, এইজন্যই জীব সদা সর্ব্বদা অহংভাব করিতে করিতে অতি দুঃখী হইয়া শরীর ত্যাগ করে।

যদি তুমি তোমার অহংভাব ত্যাগ করিয়া সমস্ত গুণের আগার একমাত্র শ্রীহরির চরণে সমর্পিত করিয়া দাও, তোমার অহং ভাবকে একেবারেই মিটাইয়া দাও, যাহা কিছু কর সব তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ কর, সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া যোগানন্দের পরম আনন্দ অনুভব কর শরণাগত হইয়া যাও। সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ কর। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম তাঁহারই জন্য সেইজন্য আত্মার

সার্থকতার জন্য ভগবৎ ধামের পূণ্যক্ষেত্রে যাত্রা কর, তবে তোমার মনুষ্য জীবন পরম সুখময় ও পরম শান্তিময় হইবে।

তীর্থ যাত্রার অনেক হেতু আছে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভ্রমণ করিতে করিতে মন শ্রান্ত হইলে তবে আত্মচিন্তার অনুকুল হয়, আবার কেহ কেহ বলেন তীর্থযাত্রা ভগবৎ প্রাপ্তির এক প্রধান সাধন। যাহা হউক তীর্থযাত্রা মনুষ্যমাত্রেরই পরম শ্রেয়ঃ এই কথা নির্বিবাদ স্বীকার করিতে তীর্থ যাত্রায় অজ্ঞান পাপের বোঝা সব মূলে নষ্ট হয়, আমাদের পুরাণেও দেখা যায়. রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, পাণ্ডবগণ ও পরশুরামাদি অবতারী বড় বড় জ্ঞানী, ঋষি, মহর্ষি, বড় বড় রাজা, মহারাজা সকলেই তীর্থে গিয়াছেন, এবং সকলে একবাক্যে তীর্থ মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। মহাভারতে ও পুরাণে তার্থযাত্রার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তীর্থযাত্রায় অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, পাপের নাশ :হয়, তথ্যপূর্ণ সঞ্চয় হয়, পরিণামে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। মনুষ্যপদ পাইয়াও যদি তীর্থ পর্য্যটন না করিয়া থাকে, তবে তাহার পদ মৃতের পদের মনে করিতে হইবে। সন্তুকারাম বলিয়াছেন—"পায়ী তীর্থযাত্রা খড়ো, দেহ সন্তদ্বারী পড়ো, পদে তীর্থযাত্রা কর, দেহ সাধুর শ্রীচরণে ফেলিয়া দাও।

যেই বীতরাগ সন্ত মহাত্মার অন্য কোন কাজ অবশিষ্ট নাই সেই সন্তলোক শিক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ জনতা আমার কর্ম্ম করে আমারই অনুসরণ করে, শাস্ত্রেও দেখা যায়—"সন্ত পরহিতেষু কৃতাভি যোগাঃ" সেইজন্য এই কলুষিত শরীরকে কষ্ট দিয়া তীর্থ

যাত্রা করিয়া থাকেন। তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শরীর মন বাণী এমন কি প্রত্যেক লোমকূপ হইতে মহান পুণ্যের জ্যোতি নির্গত হইয়া থাকে। তাঁহারা যেই তীর্থে যান সেই তীর্থ পরম পবিত্র হইয়া থাকে। শাস্ত্র তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি" ঐ প্রকারের মহাপুরুষ দর্শন মাত্রেই পুণ্য সঞ্চয় হয়। প্রকৃত তীর্থ তখন হয় যখন কোন সন্ত মহাত্মা পদার্পণ করেন। সাধুর সমস্ত বিভূতি জগতের কল্যাণের নিমিত্ত

জগতঃ কল্যাণা সন্তস্য বিভূতি
দেহ-কষ্টবিতা পরোপকারে।

এই হিমালয়ে অনন্তকাল হইতে কত রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচারণ তথা সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান, কত অসংখ্য সাধু মহাপুরুষ হিমালয়ে তপস্যা করিতেছেন, এই ঘোর কলিকালেও কত জ্ঞানী, ধ্যানী, আচার্য্য, ধনী, গরীব এবং ভক্ত আদি হিমালয়ে যান নাই, এমন বিরল লোক কে ? যিনি হিমালয়ের মনোমোহন দৃশ্য ও অনন্ত সৌন্দর্য্য দর্শন করে নাই। ভগবান্ জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য আদি সকলেই এই বিশাল হিমালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন।। এই মহান্ হিমালয়ের বিষয় বর্ণন করা আমার মত এক সাধারণ পরিব্রাজকের কর্ত্তব্য নয়।

তবে কেন তুমি বৃথা কাগজের সর্ব্বনাশ করিতেছ, এই প্ররোচনা তোমায় কে দিল, তুমি কোন বিদ্বান্ নও, সাহিত্যিক নও, কবি নও, তবে কেন এত কষ্ট করিয়া এবং বৃথা টাকা খরচা

করিতেছ ? ভাই তুমি যাহা বলিতেছ তাহা মিথ্যা নয়, আমি কোন বিদ্বান্ নই, কবি নই, কিন্তু আমিও একজন তীর্থযাত্রী, আমিও একজন দর্শক সন্ন্যাসী, এইভাবেই নেওয়া যাক্ তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। যেই হিমালয়ের একটুখানি ঝাঁকির দর্শনের নিমিত্ত কত ধনী, মানী, কুলীন, বিদ্বান, মুনিঋষি আদি কত অনন্তকাল হইতে অনন্তলোক আসিয়া থাকেন, আবার কত মূর্খ, অজ্ঞানী, আস্তিক, নাস্তিকও দৌড়ে দৌড়ে আসিয়া থাকে তাহাব মহিমা আমার মত অভিমানী জীব কি বর্ণন করিতে পারে। যাঁহার চরণতলে আস্তিক, নাস্তিক সকলে নত মস্তকে প্রণাম করিয়া থাকে। যাঁহার মহিমার প্রভাবে আবাল বৃদ্ধ বণিতা নর-নারী, প্রতি বর্ষ হাজার হাজার লোক স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, জন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে ত্যাগ করিয়া এই বিশাল হিমালয়ের তীর্থ দর্শনের লালসায় চলিয়া চলিয়া আসেন, যাঁহার অসীম শক্তির টানে স্বয়ং চলিয়া যাইতেছে, তাহার নিকট পথ প্রদর্শক শ্রান্ত ক্লান্ত জীব কি পথ প্রদর্শক হইবে ? যেমন সূর্য্যকে প্রদীপ দেখান মূর্খতা তদ্রূপই এই হিমালয় আজ কালের নয়, যখন হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন হইতে কত যুগ যুগান্তর চলিয়া যাইতেছে, তাঁহার কোন ইয়ত্তা নাই। কোন অভাগা হইবে যিনি হিমালয়ের কথা শুনে নাই, দেখে নাই। তাহার পরিচয় আমি এক ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা কি জানাইব। কেন না যিনি স্বয়ং পরিচিত তাহাকে কি পরিচয় করাইব। শত শত যাত্রী কত উৎকণ্ঠা, কত প্রেম, কত লালসা, কত পিপাসিত হইয়া, তথা নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া এই বিশাল হিম গিরিতে উঠিতেছে, এবং

যাহার যাহা যথাসাধ্য সেই মহান্ হিমরাজের শ্রীচরণে পূজার উপচার স্বরূপ "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" দিয়া পূজা করিতেছে, আবার কত লোক টাকা, পয়সা, সোণা, রূপা, হীরা, মুক্তাদি দিয়া সেই সর্ব্বাধার জগৎপতি হিমরাজের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া আপনাকে কৃত কৃত্য মনে করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেছে। আমার মত দীনহীন কাঙ্গালের নিকট কি আছে তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করি, আছে কেবল "নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমঃ নমঃ"—তাঁহার মহিমা অথবা পথ প্রদর্শক হওয়া বৃথা। ভাই, যাহাই বলনা কেন! আমি হিমরাজের যেই ঝাঁকি, যেই আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহা নিশ্চয় পুনঃ পুনঃ লিখিব। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—হে বিশ্ববাসীর অমৃতের বীর সন্তানগণ, ছুটে এস সেই হিমরাজের কিঞ্চিৎ মহিমাযুক্ত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বর্ণন করিয়া আপনাদের পথ প্রদর্শক হই। কারণ আমি যেই হিমরাজের অনন্ত ঝাঁকি, অনন্ত দৃশ্য ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছি, তাহা এই শরীর থাকিতে কখনও ভুলিতে পারিব না। তাহাতে যদি কেহ অসন্তুষ্ট হয়, অথবা পাপ হয়, তাহা আমি নত শিরে মানিয়া লইব। তবুও আমি বারংবার বলিয়া বেড়াইব জীবনে কেহ যদি শান্তি চান্ তবে নিশ্চয় একবার হিমালয়ের পঞ্চম খণ্ড ভ্রমণ করিয়া প্রাণে শান্তিলাভ করুন।

হিমালয় পঞ্চম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

খণ্ডার পঞ্চ হিমালয়শ্চ কথিতা নৈপাল কুর্ম্মাঞ্চলৌ।
কেদারোহথ জলংধরোহথে রুচির, কাশ্মীর সংজ্ঞোহন্তিমঃ॥

শাস্ত্রে হিমালয়কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম খণ্ড ইহার সীমা গোরকপুর হইতে নেপাল, এই খণ্ড তির্ব্বতের সীমা পর্য্যন্ত। এই খণ্ডে মহাদেব পশুপতি নামে বিরাজমান। পশুপতি-নাথ নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় তিন দিন ব্যাপিয়া খুব বড় মেলা হইয়া থাকে। রেলে যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে রকসাল, তাহার পর গাড়ী বদল করিয়া ছোট লাইনে বীরম্ গ্রাম পর্য্যন্ত যাইবার পর অমলেশগঞ্জ পর্য্যন্ত মটরে যাইয়া সীসাগড়ী ও চন্দ্রগড়ী নামক দুইটী পর্ব্বত পার হইতে হয়, তাহার পর নেপালের সমতলভূমিতে আসিয়া মোঁটারে করিয়া কাঠমণ্ড নামক প্রধান নগর। একটি কথা নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য নেপাল সরকারের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, নতুবা নেপালে প্রবেশ করিতে দিবে না। শিবরাত্রি সময় রক্সাল হইতে ইহা নিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড—কুর্ম্মাঞ্চল, বা কুমায়ু ইহার বিষয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় খণ্ড —জলন্ধর হইতে পাঞ্জাবের সমস্ত পর্ব্বত অর্থাৎ শিমলাদি। চতুর্থ খণ্ড—পাঞ্জাব হইতে কাশ্মীর এবং তিব্বতের কিছু অংশ পর্য্যন্ত সম্মিলিত। এই খণ্ডে মহাদেব অমরনাথ নামে বিরাজিত হইয়াছেন। কাশ্মীরের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিষয় বর্ণন করা একপ্রকার অসাধ্য, যে ভূমিকে কবিরা ভূঃস্বর্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ইহার রাজধানী শ্রীনগর। অমরনাথ যাইতে হইলে শ্রীনগর হইতে পাহিল গ্রাম পর্য্যন্ত মোটরে করিয়া আসিবার পর ৩৮ মাইল অবশিস্ট রাস্তা হাটিয়া অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার পর তবে অমরনাথ দর্শন হইয়া থাকে। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার দিন দর্শন হয়। কেবলমাত্র বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র দর্শন। অমরনাথে কোনও মন্দির নাই, একটী গুহার মধ্যে একপার্শ্বে কিছু বরফ পড়িয়া একটী লিঙ্গাকারের রূপ হয় ইহাই সর্ব্বারাধ্য দেবাদিদেব মহাদেব। রাত্রিবাস করিবার জন্য ৪ মাইল নিম্নে পঞ্চতরণি নামক স্থানে। ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর যাহা লিখিয়া বর্ণন করা অসাধ্য। মার্গ অতি দুর্গম। প্রতি পদে পদে মহা বিপদ, একটু পদ যদি এদিক সেদিক হয়, তবে একেবারেই অমরনাথ, অর্থাৎ আর মরিতে হইবে না।

পঞ্চম খণ্ড—কেদার খণ্ডকে বলিয়া থাকে। এই খণ্ড হরিদ্বার হইতে কৈলাস মানস-সরোবর পর্য্যন্ত। এই কেদার খণ্ডে অসংখ্য তীর্থ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান। লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতের মধ্যে যে কত তীর্থ রহিয়াছে, এবং কত যোগী সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষাদি

সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া এই মহান্ হিমরাজের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়া কাল অতিবাহিত করিতেছে তাহার কোন ইয়াত্তাই নাই। এই কেদারখণ্ড শিবের একমাত্র ক্রীড়াভূমি, এইখানে একমাত্র শিবেরই রাজধানী, তাঁহার যক্ষ, রাক্ষস, দানব, ভূত, প্রেত, পিশাচ আদি সদাসর্ব্বদা নিবাস করিয়া থাকে। যখন হইতে বিষ্ণু তাঁহার আড্ডা জমাইলেন, তখন হইতে কেদারখণ্ডের অন্তর্গত এই বদরীকাশ্রম প্রধান বৈষ্ণব প্রধান বৈষ্ণবখণ্ডে পরিণত হয়। এই বদরীনাথও অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান। কিন্তু তাহা হইলেও বিষ্ণুর থেকে শিবেরই বিশেষ আধিপত্য। সেইজন্য তীর্থযাত্রীরা প্রথমতঃ আদি কেদারনাথ বাবাকে দর্শন করিয়া পরে বদরীনাথজীর দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন ভারতের চারিদিকে চারিধাম; তদ্রূপ এই কেদারনাথখণ্ডেও চারিধাম বিদ্যমান। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী, কেদার-নাথ, বদ্রীনাথ, এই খণ্ডের অন্য নাম গড়বাল, গড়বাল কেন বলা হয়, তাহার অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে এই নামের প্রসিদ্ধি এই, পূর্ব্বে এই সব পাহাড়ের মধ্যে অনেক ছোট ছোট গড় ছিল, 'গড়' কিল্লাকে বলা হয়, পূর্ব্বে যদি কোন রাজবংশের কোনও রাজা অথবা রাজকুমারকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিত, অথবা কেহ যদি অন্য রাজ্য হইতে পরাজিত হইত, তখনই তাহারা কিছু জমি অধিকার করিয়া পাহাড়ের মধ্যে আপন আপন রাজ্য স্থাপিত করিত। মুসলমান রাজত্বের সময় পর্য্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চল শত্রুর জন্য অগম্য ছিল। সেইজন্য পাহাড়ে

মুসলমানের অত্যাচার খুবই কম হইয়াছিল পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বঙ্গদেশে মুসলমানেরা যেইরূপভাবে অত্যাচার করিয়াছিল, কিন্তু গড়বাল, নেপাল, কুমায়ু আদি স্থানে একেবারেই নিরাপদ ছিল। এই সব কারণে গড়বাল, নেপাল, কুমায়ু আদি স্থানে প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের ও তাহাদের বংশপরম্পরায় রাজ্য চলিয়া আসিতেছে, বহু কেল্লা বা গড় হওয়াতে এই প্রান্তের নাম গড়বাল হইয়াছে, এই গড়ের রাজা, ঠাকুর বা রাবত সব আপন আপন স্বতন্ত্র রাজা ছিল, সেইজন্য সদাসর্ব্বদা যুদ্ধ বিবাদ লাগিয়া থাকিত। পঁবার রাজবংশের রাজা অজয় পাল এই সব ছোট ছোট গড়ওয়ালা রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমস্ত প্রদেশে আপন এক ছত্ররাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই রাজ্যের নাম গড়বাল নামে প্রসিদ্ধ হয়, কিন্তু ১৫ শতাব্দির পূর্ব্বে কোথায়ও গড়বাল শব্দের উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এইখানে যক্ষ, রাক্ষস, ভূত পিশাচেরই একমাত্র নিবাস ছিল। অনেক পাহাড়ীরা লোকের নিকট গড় শব্দের অর্থ বিচিত্রভাবে বলেন। তাহাদের কথা এইরূপ—পূর্ব্বে এই প্রান্তে যক্ষ, রাক্ষস, দানব, দৈত্য আদি অসুর জাতির বংশ সব বাস করিত, কিরাত হুণ খস, কংকসাধ্র আদি অনার্য্য জাতিরই একমাত্র নিবাস ছিল। 'তাহাদের দেব দেবী ছিল দানব, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, আদি। এখনও কোন কোন রূপে তাহা প্রচলিত আছে। ঋষি মুনি যখন তপস্যার নিমিত্ত আসিতেন, তাহাদের বিশেস বিশেষ স্থান ছিল, সূর্য্য বংশীয় রাজাদেরও পূর্ব্বে সমস্ত ভারতের মধ্যে রাজত্ব ছিল। সেই সময়েও এই পার্ব্বত্য

অঞ্চলে অসুরের রাজত্ব ছিল, তখন ভগবান ইহাদের কিছু পাতালে পাঠাইয়া তবে শান্তি স্থাপন করিলেন? এবং অবশিষ্ট অনেকে উত্তরাখণ্ডে চলিয়া আসে, ইহারা আর্য্য জাতির সংসর্গে কিছু কিছু সভ্যভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাদের অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া থাকে। রাজা বলির পুত্র ভৌমাসুরের রাজধানী শোনিতপুর (গুপ্তকাশীর নিকট) অদ্যাবধি এই নামে প্রসিদ্ধ। যক্ষের রাজা কুবেরেরও এইখানে ক্রীড়াভূমি ছিল। মানার হুনিয়া অথবা মরিচারা আপনাকে কুবেরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ঘণ্টাকর্ণ রাক্ষসেরও এইখানে খুব আধিপত্য ছিল। দানবও এইখানে অনেক ছিল। এখনও এইখানকার গ্রামবাসীরা বন, পর্ব্বত, বৃক্ষ আদিকে আপন ইষ্টদেবতা মনে করিয়া পূজা করিয়া থাকে। দানবের অপভ্রংশ দানু। দানু নামে এখনও অনেক গ্রাম দেবতা আছে। যেমন কোড়াদানু (কোটী দানু) কেদার দানু (কেদার দানব) রূপ দানু (রূপ দানব) এই সব দানবের পূজা হইয়া থাকে। পিংডর নদীর ঘাটিতে এখনও দানু জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। অনেক গ্রামের নামও দানু নামে আছে। যেমন দানুকোট দাথকোটী, দানগী গ্রাম, দালপিগ্রাম আদি। এই প্রকারের যক্ষের অপভ্রংশ জাখ, জাগ দেবতা, জাকন দেবী আল-মোড়ায় একটী জাকনদেবীর মন্দির আমি জীর্ণোদ্ধার করাইয়াছিলাম। এই সকল দেবদেবীর নিত্য বিধিবৎ পূজা হইয়া থাকে। আবার অনেক গ্রাম, নদী, পর্ব্বতাদি ইহাদের নামে প্রসিদ্ধ আছে। যেমন জাখ, জাখড়ী (জক্ষিনি) জয়োলী, জখদেউ (যক্ষ দেবতা) জাখন

দেবী, জাখপানী, যক্ষ বাড়ী, আদি প্রসিদ্ধ আছে, ইহার অতিরিক্ত নাগ, ভৈরব, সিদ্ধ, গণদেবী; ঘোড়ারী, এরাড়ী, ভরাড়ী এবং নিরঙ্কার আদি অনেক দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। কেবল যে গড়বালে পূজা হয় তাহা নহে, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লামারাও নানা দেবতার পূজা করিয়া থাকে এইসব জায়গায় জন্তর মন্তর আদি যাদু বিদ্যায়ও ইহারা বড় প্রবীন।

ঘণ্টাকর্ণের এইখানে খুবই প্রভাব অনেক গ্রামে এখনও ঘণ্টাকর্ণের পূজা করিয়া থাকে। অনেক স্ত্রীলোক গলায় কর্ণে ঘণ্টা বাঁধিয়া পূজা করিয়া থাকে। এই ঘণ্টাকর্ণকে কেহ কেহ ঘড়ীয়াল বলিয়া থাকে। ঘণ্টাকর্ণের পূজায় মদ্য, মাংস আদি দিয়া পূজা করে। প্রতি বৎসর এখনও অসংখ্য ছাগল, ভেড়া মহিষাদি বলি দিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহারা মনুষ্য দিয়াও বলি করিত। কেননা ঘণ্টাকর্ণ স্বয়ং এক ব্রাহ্মণকে মারিয়া ভগবানের নিকট ভেট করিতে নিয়া গিয়াছিল। এইজন্যই ঘণ্টাকর্ণের নামের অপভ্রংশ-ঘংড়বাল বা গড়বাল নাম পড়িয়াছে। এরূপ ভাবের কথা আমি আরও অনেক লোকের নিকট শুনিয়াছিলাম। যাহা হউক আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখনও অনেক জীর্ণ শীর্ণ কিল্লার চিহ্ন দেখা যায়, এবং ঘণ্টাকর্ণেরও প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয়, ইহার নামে গড়বাল নাম হইয়াছে, তৃতীয় খণ্ডে এই ঘণ্টাকর্ণের বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

ঘণ্টাকর্ণ

তৃতীয় খণ্ড।

বিশুদ্ধসত্ত্বং তবধাম শান্তম্,
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়া ময়োহয়ং গুণসম্প্রবাহো.
ন বিদ্যতে তেহগ্রহ নানুবন্ধঃ।
তথাপি দত্তং ভগবান্ বিভর্ত্তি,
ধর্ম্মস্যগুপ্তৈ খলনিগ্রহায়॥

(হরিবংশ)

ভগবান্ শ্রীবদরীনারায়ণের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে পরিক্রমার কথা মণ্ডপের সমীপবর্ত্তী ঘণ্টাকর্ণের মস্তকহীন এক মূর্ত্তি আছে। ইনিই ভগবানের দ্বারপাল বা কতোবাল বলিয়া থাকে। এই ঘণ্টাকর্ণকে এবং এইখানে কি করিয়া ভগবানের দ্বারপাল হইল, হরিবংশ পুরাণে ৮৮ অঃ বড় সুন্দর কথা লিখিত হইয়াছে, ঘণ্টাকর্ণের কথা হইতে পরিচয় পাওয়া যায়, ইনি ভগবান নর-নারায়ণের পরম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু সে ভয়ঙ্কর পিশাচ ছিল, সদাসর্ব্বদা জীব হিংসা ইহার প্রধান কর্ম্ম ছিল, আবার এদিকে শিবের এক প্রধান ভক্ত ও অনুচর ছিল। শিবকে একমাত্র মুক্তিদাতা মনে করিয়া অন্য কোন

দেবতার নাম কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কর্ণের মধ্যে বড় বড় ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিত, এবং একমাত্র শিবনাম জপ করিত। ভগবান্ বিষ্ণুকে মহাশত্রু মনে করিত, সেইজন্য বিষ্ণুনাম যেন কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য অতি জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া নৃত্য করিত। এইরূপভাবে হাজার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ভূতপতি ভবানীনাথ শঙ্করের আরাধনা করিতে থাকে। তাহারপর শিব প্রসন্ন হইয়া একদিন তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার ভক্তিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমার যাহা মনোবাসনা বর প্রার্থনা করিয়া নিতে পার। ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন— হে প্রভু! হে দেবাদিদেব আশুতোষ যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় শীঘ্রই মুক্তি প্রদান করুন।

মুক্তিদাতা স্বামী কৈলাসপতি শিব মনে করিলেন, এখনও উহার মনে বিষ্ণুর প্রতি ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে। যাহার মনে একটুও ভেদ ভাবনা থাকে সে যেমন ভক্ত হউক না কেন, সে কখনও মুক্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে না। এই সব বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া পার্ব্বতিপতি ভোলানাথ বলিলেন, "হে বৎস, ধন, ঐশর্য্য, অষ্টসিদ্ধি আদি যাহা ইচ্ছা কর প্রার্থনা করিয়া নিতে পার, কিন্তু মুক্তি দিবার একমাত্র অধিকারী শ্রীবিষ্ণু। আমি মুক্তি দিতে পারি না। তোমার যদি মুক্তি লাভের প্রবল বাসনা হয়, তবে তুমি শ্রীমৎ নারায়ণের শরণাপন্ন হও, তাহার আরাধনা করিলে তোমার কৈবল্য মুক্তিলাভ হইবে।

এই কথা শুনিয়া ঘণ্টাকর্ণ চমকিত হইয়া গেল, এবং বলিলেন —"হায়, ভগবান্ ইহা আমার ভয়ানক ভুল হইয়া গিয়াছে, আমি আপনাকে একমাত্র মুক্তিদাতা মনে করি, অতএব আপনিই আমাকে মুক্তি প্রদান করুন। যেই বিষ্ণুর কথা আপনি বলিলেন, আমি সদা তাঁহার বিরোধী রহিয়াছি, দেখুন তাহার নাম যেন কর্ণে শুনিতে না পাই, সেইজন্য আমার কর্ণে কেমন করিয়া ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিয়াছি. "প্রভু, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করিয়া হইবে। এই মহা পাপীকে ভগবান্ বিষ্ণু কেমন করিয়া দর্শন দিবেন ? এই বলিয়া অতি দুঃখের সহিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ভগবান শঙ্কর বলিলেন, 'বৎস ! কোন দুঃখ করিওনা। শ্রীহরি বড়ই করুণাময়, ভক্তবৎসল, যদি একবার প্রেমের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হও, তবে তিনি তাহার সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন, তুমি তাঁহারই শরণে যাও।

ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন—আমার মত মহাপাপীকে তিনি কি ক্ষমা করিবেন ? যে আজীবন বিষ্ণুদ্রোহী হায় ! ভগবান্ জনার্দ্দন, মধুসূদন, অনাথের নাথ, তুমি কোথায়, একবার এই নরাধম মহাপাপীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন।

ভগবান শঙ্কর বলিলেন—আজকাল তিনি দ্বারকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব তুমি শীঘ্রই দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হও। নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে মুক্তিদান করিবেন।

এই কথা শুনিয়া ঘণ্টাকর্ণ আপন ভাই, বন্ধু তথা অনেক ভূত পিশাচ-আদিকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা যাইয়া উপস্থিত হইল. ইহাদের

সঙ্গে অনেক শিকারী কুকুর'ও ছিল। রাস্তায় চলিবার সময় যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই ভক্ষণ করিয়া তাহাদের পেটের অন্ত্রাদি মালার মতন করিয়া গলায় ঝুলাইয়া ঘণ্টাকর্ণ এক বিকটরূপ ধারণ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এবং নিরন্তর অচ্যুত, নারায়ণ, কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারী নাম করিয়া নৃত্য করিতে করিতে মার্গ অতিক্রম করিতেছিল, এবং চক্ষে অবিরত অশ্রুধারা পড়িতেছিল, আর সর্ব্বদা বলিতেছিল, হায়, ভগবান বাসুদেব কখন এই অধম মহাপাপীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন। যখন দ্বারকায় যাইয়া শুনিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৈলাসে যাইয়া শিবের আরাধনা করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তখন তাহার আরও উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল। তখনই সেই স্থান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে মিলিয়া কৈলাসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে রাস্তায় প্রথমে বদরীকাশ্রমে পৌছে, সেইখানে অসংখ্য ঋষি মহর্ষি প্রত্যক্ষভাবে বসিয়া শ্রীবদরী-শ্বরের ঘোর তপস্যা করিতেছিলেন সেইখানে একমাত্র তপস্বীগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা সেবা হইতেছিল। ঘণ্টাকর্ণের সঙ্গে যে সব কুকুরাদি ছিল, তাহাদের দেখিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র ও মৃগ আদি ও অন্যান্য বন্য জীব জন্তু ভয়ে চীৎকার করিয়া পলাইতে লাগিল। সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল। ভূত, প্রেত, পিশাচ'আদি মনুষ্য ও অন্যান্য জীব মারিয়া তাহাদের উষ্ণ রক্ত পান করিতে লাগিল। তাহাদের পেটের নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া গলায় মালার মতন করিয়া বিকট নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিল। এই সব কোলাহলের জন্য শান্ত বন অশান্ত হইয়া উঠিল, কেবল সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল

সেই হাহাকারের মধ্যে ও অতি কোলাহলের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে মাধব, হে মুক্তিদাতা আদি বলিতে বলিতে বড়ই করুণাপূর্ণ স্বরে অতি কাতরে ডাকিতেছিল, অতি দূর হইতে সেই শব্দ শুনা যাইতেছিল। ভগবান দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ, ঋষি, মুনির আরাধ্য দেব শিব আরাধনায় সেই বদরিবনে থাকিয়া সমাধি অবস্থায় লীন হইয়াছেন! তাঁহারা সমাধি অবস্থায় থাকিতে কোলাহলের শব্দ শুনিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখেন সম্মুখে ঘণ্টাকর্ণ এবং বহু ভূত, প্রেত, পিশাচ, আদি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভগবান তখন জিজ্ঞাসা করিলেন – ভাই তুমি কে? এবং কিজন্য এখানে আসিয়া এই শান্ত বনকে অশান্তিতে পরিণত করিতেছ। এই মহান্ পবিত্র ভূমিতে একমাত্র পুণ্যবান শান্তচিত্ত তপস্বীগণই আসিয়া থাকেন। হিংস্র শিকারী তথা পরপীড়ক পাপীলোক এই পবিত্র বনে প্রবেশ করিতে পারে না। তোমার এখানে আসিবার কারণ কি শীঘ্র বল। ঘণ্টাকর্ণ বলিল—তুমি কে প্রথমে আমাকে বল? ভগবান বলিলেন—আমি এই পবিত্র বনের রক্ষক, এইখানের জীবের দুঃখ কষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। যদি কেহ এখানে আসিয়া অন্যকে দুঃখ কষ্ট দিয়া থাকে, তাহাদের আমি কঠোর দণ্ড দিয়া থাকি। অতএব তুমি শীঘ্রই এই পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। এই কথা শুনিয়া ঘণ্টাকর্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানকে শুনাইলেন এবং বলিলেন—আমার নাম ঘণ্টাকর্ণ, আমি পিশাচ, ইহারা সকলে আমার ভাই ও সঙ্গী। আমি শিবের অনন্য ভক্ত, তথা মুক্তির ইচ্ছুক। ভগবান্ শিবের আজ্ঞায় মুক্তিদাতা শ্রীহরির শরণে আসিয়াছি, শুনিয়াছি

তিনি বড়ই করুণাময়, ভক্তবৎসল, অনাথ শরণ জনার্দ্দন, এই মহা-অধমকে কৃপা করিবেন কি ? এবং কখন এই মহাপাপীকে ঘৃণিত পিশাচ যোনী হইতে মুক্তি দিবেন, "হে, বন রক্ষক মনুষ্য তুমি পরম সুখে আপন কর্ম্ম কর। এবং আমি সেই অচিন্ত্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের ধ্যানে নিমগ্ন হই। এই বলিয়া রক্ত মাংস আদি রাখিয়া দিয়া পবিত্র গঙ্গার তীরে ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেল। ভগবানের ধ্যানে এরূপ ভাবে লীন হইয়া গেল, তাহার শরীরের চৈতন্য পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। অর্থাৎ একেবারেই সমাধিস্থ। তাহার এরূপ ভাব দেখিয়া ভক্ত বৎসল শ্রীহরি বড়ই প্রসন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই মাংসাহারী পিশাচের কেমন আশ্চর্য্যজনক ভক্তি, ইহার কেমন শুদ্ধভাব, কেমন উৎকৃষ্ট প্রীতি, এমন সমাধি বড় বড় যোগী-ঋষিদেরও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ইহাকে যোগীদেরও দুর্ল্লভ মুক্তি প্রদান করিব। এই প্রকারের ভাবনা ভাবিয়া ভগবান্ সেই পিশাচের হৃদয়ে চতুর্ভুজরূপে প্রকট হইলেন। হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের দর্শন পাইয়া পিশাচ প্রেম-বিহ্বল হইয়া গদ গদ্ভাব হইয়া গেল, এবং হৃদয়ে দেখিতে পাইলেন। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীকে অদ্ভুত দর্শন করিলেন। পরে প্রেমের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল," এবং রুদ্ধকর্ণে সেই ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিলেন। সংসার একেবারেই ভুলিয়া গিয়া ভগবানের দেবদুর্ল্লভ মনোমোহন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রস পান করিতে লাগিলেন।

ঘণ্টাকর্ণ ভগবানের রূপমাধুর্য্যে এমনভাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে তাহার সেই সমাধিভাব আর ভঙ্গ হয় না। তখন ভগবান আপন হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হৃদয় হইতে ভগবানের বিশ্বমোহনরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে জানিয়া সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল, তখন তাড়াতাড়ি চক্ষু খুঁলিয়া সম্মুখে দেখেন, সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ভগবান চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি শোভিত পীতবস্ত্র ধারণ করিয়া তথা কর্ণে কুণ্ডল, গলায় কৌস্তুবমণি শোভিত, বৈজয়ন্তী মালা মস্তকে মোহন চুড়াধারী, হৃদয়ের মূর্ত্তি বাহিরে দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিল, এবং অতি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কখনও হাস্য আবার কখনও রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছাগত হইয়া গড়াইতে লাগিল। এরূপভাবে অনেকক্ষণ যাবৎ প্রেমে বিহ্বল, বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া নাচিতে নাচিতে ভগবানের শ্রীচরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ভগবান তখন তাহার করকমল স্পর্শ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বর নিবার জন্য বলিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন তাহার আরাধ্য দেবতার পূজা করিবার কথা মনে পড়িল। সে তখন প্রভুর শ্রীচরণে পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, গন্ধ পুষ্পাদি দিয়া বিধিবৎ পূজা করিলেন। অবশেষে বলিল! হে প্রভু, আমি আপনার নৈবেদ্যের জন্য কোনও উচিৎ উপহার আনিতে পারি নাই। আসিবার সময়ে মনে মনে এই চিন্তা করিলাম, নৈবদ্যের জন্য কি বস্তু লইয়া যাই, প্রভুর জন্য কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লইয়া যাওয়া

ভাল। আমরা মাংসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য মনে করিয়া থাকি। তাহার উপর যদি কোন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণকুমার হয়, তবে তাহার মাংস আরও শ্রেষ্ঠ মনে করি। সেইজন্য আমি আসিবার সময়ে এক অতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকুমারকে মারিয়া আপনার জন্য নৈবদ্যের উপচারস্বরূপ নিয়া আসিয়াছি। অতএব আপনি এই মহা পবিত্র মাংসটুকু গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। এই বলিয়া মৃত ব্রাহ্মণ কুমারের শরীরটা ভগবানের নৈবদ্যের জন্য চর্ম্মাদি ছাড়াইয়া ফেলিয়া পবিত্র গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগবানকে অর্পণ করিলেন।

শাস্ত্র এইরূপ বলিয়া থাকে—'যদন্নঃ পুরুষ অত্তি, তদন্নং তস্য দেবতা'। মনুষ্য যে যাহা খায়, তাহা তাহাদের দেবতাকেও দিয়া থাকেন। ভগবান্ তাহার এই পবিত্রও শুদ্ধভাবকে দেখিয়া কোন অপ্রসন্ন হইলেন না। ভগবান ভক্তেরই অধীন, তিনি প্রেমের সহিত বলিলেন—হে বৎস, মাংস ভক্ষণ করা ভাল নয়, ইহাতে তমঃ গুণের উদয় হয়, আবার তাহার উপরে ব্রাহ্মণকুমারের মাংস, নর মাংস সর্ব্বদা অভক্ষ্য, ব্রাহ্মণ সদা অবধ্য, তাহাদের কখনও বধ করিও না। অদ্য হইতে তুমি জীব হিংসা কর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এখন হইতে তুমি স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া, ইন্দ্রপদ লাভের পর আবার আমার পরমধামে আসিয়া চিরশান্তি লাভ কর।

এই কথা বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। তখন হইতে ঘণ্টাকর্ণ কোতবাল বা দ্বারপাল হইয়া অনন্তকালের জন্য এই পবিত্র

পূণ্যভূমি শ্রীবদরীধামে নিবাস করিতে থাকেন। এখনও লোকের উপরে পরম ভক্ত রাজ ঘণ্টকর্ণের আবেশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে তাহা একটু কম হইয়া গিয়াছে, নতুবা পূর্ব্বে এত অধিক প্রভাব ছিল, যে কাহারও কোন জিনিষ চুরি হইয়া গেলে, ঘণ্টাকর্ণের আবেশ হইয়া যাইত। আমি নিজেই ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, এক সময়ে আমার একটী খুবই ভাল ফাউন্‌টেন্ পেন্ চুরি হইয়া যায়, ইহাতে আমার খুবই অসুবিধা হইতেছিল। কারণ এই জঙ্গলে তাহা কোথায়ও পাওয়া যাইতে পারে না। লোকের কথায় আমিও একদিন ঘণ্টাকর্ণের পূজা দিলাম, রাত্রে আমার উপরে আদেশ হইল, এই পাড়ার মঙ্গল সিংহ নামক একটী বালক নিয়া তাহার ঘরের আলনার উপরে রাখিয়াছে। সকাল বেলায় তাহার বাটীতে যাইয়া তাহার মাতাকে বলাতে, তখনই তাহার মাতা ঠিক্ সেই আলনার উপরেই কলম পাইয়া আমাকে ফেরৎ দিয়া দিল। অবশ্য মেয়েটীকে কিছু বক্‌শীস্ দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে মেয়েটা কিছুতেই গ্রহণ করিল না।

গড়বালে ঘণ্টাকর্ণের অদ্যাবধি খুবই প্রচার। স্থানে স্থানে লোকে মন্দির তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চলের নাকি ঘড্যায়াল বা গাড়য়াল বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এইখানে যখন ঘণ্টাকর্ণের পূজা হয়, তখন এই অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা আপন আপন কর্ণে ও গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া থাকে। ঐপ্রকারের মাংসাদি ভোগ দিয়া থাকে। ইহা শিবেরই একমাত্র ক্রীড়াভূমি, যখন হইতে নারায়ণ

আসিয়া এই ভূমিতে বসেন, তখন হইতে এই ভূমিতে কিছু কিছু সাত্ত্বিকভাবে পূজা পদ্ধতি চলিয়াছে। নতুবা শিবের গণ ডাকিনী, শাঁকিনী, ভূত, পিশাচ, তাল, বেতাল, যক্ষিণী, যোগিনী আদির পূজা খুবই প্রচার ছিল। পূর্ব্বে এই অঞ্চলে কিরাত, হূণ, রভশ, কর্ক, অসুর দৈত্য দানবেরই একমাত্র নিবাস ছিল।

এই প্রকারের ভক্ত বৎসল ভগবান নারায়ণ পিশাচ যোণী ঘণ্টাকর্ণকেও আপন সামীপ্য প্রদান করিয়া এবং নিজের দ্বারপাল করিয়া রাখিয়া ভক্ত মহিমার পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রেও দেখা যায়—

কৃষ্ণ-চিত্তঃ ভবেদ্‌ভক্তো ভক্তচিত্তো জনার্দ্দনঃ।
ভক্তানাং হৃদয়ে তস্য প্রেমলীলা বিনোদনঃ॥

ভক্ত—কৃষ্ণচিত্ত আর কৃষ্ণ – ভক্তচিত্ত। সেইজন্যই ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি প্রেম লীলার আনন্দানুষ্ঠান করেন। ভগবানের মহিমা সর্ব্বদা ভক্তের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভক্তের পদধূলি দ্বারা গঙ্গাদি তীর্থ সকল পরম পবিত্র হয়, ভক্তের দর্শনাদি দ্বারা মানব মাত্রেই পরম পবিত্র হয়, সাধুনাং দর্শনাৎ পুণ্যম্।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সব পর্ব্বতে বন্য অসভ্য জাতিরই নিবাস ছিল। নর নারায়ণের নিবাস হওয়াতে ইহাদের প্রভাব কিছু

কমিয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এখনও ইহার কিছু কিছু চিহ্ন আছে এখানকার লোকের আচার ব্যবহার দেখিলে তথা পূজা পদ্ধতি দোযপে পরিষ্কার বুঝা যায়। পিশাচরূপী মহাপাপী দুষ্ট ঘণ্টাকর্ণকেও তিনি দয়া করিয়াছিলেন। আর যে স্বয়ং মুক্তির আশায় আসিয়া বিশ্ব প্রভুর শ্রীচরণকমলে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়া আরাধনা করিতেছে তাহাকে মুক্তি দেওয়া আশ্চর্য্য কি ?

চতুর্থ খণ্ড।

গন্ধমাদন পর্ব্বত।

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধবগাহ্যস্থিতঃ পৃথিব্যং ইব মানদণ্ডঃ ॥

(কুমার সম্ভব

ভারতবর্ষের উত্তরদিকে দেবস্বরূপ পর্ব্বতের রাজা হিমালয় বিরাজমান। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত যেন পৃথিবীকে মাপিবার জন্যই বিধাতা ইহাকে মানদণ্ডস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। গিরিরাজ হিমালয় ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর শিরোমুকুটসদৃশ। এই হিমালয় সমস্ত পর্ব্বতের শিরোমণি, এত উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। নগাধিরাজ হিমালয়ের প্রশংসা করিতে গিয়া আপন আপন কাব্যে কবিরা বিলক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। এই শৈলেশ্বরের শোভা অবর্ণনীয়। ইহা হইতে গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু আদি পরম পবিত্র নদীর জন্ম হইয়াছে, এবং যাহার পুত্রী সাক্ষাৎ জগদম্বা সতী মহারাণী হইয়াছেন। আবার তিনিই শৈলসুতা পার্ব্বতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এবং যাহার বিবাহ দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্করের সঙ্গে হইয়াছে। হিমরাজ বিবাহ দিয়া চুপ করিয়া থাকেন নাই, তিনি দেবাদিদেব মহেশ্বরকে ঘর জামাই করিয়া ভবানীর সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত নিজের রাজধানীতে রাখিয়া শ্বশুর বাড়ীর সুখভোগ

করাইতেছেন। শ্বশুর ঘর যে কত আনন্দের, শ্বাশুড়ীর হাতে ভোজন যে কত সুমিষ্ট, তাহা সেই ভাগ্যবান্ জানে, যে শ্বশুর শ্বাশুড়ী থাকিতে ঐ সুখের অনুভব করিয়াছেন। যদি শ্বশুর ঘরে বিমল সুখ না থাকিত, তবে শিবজী সদা শ্বশুরালয়ে পড়িয়া থাকিত না। সত্য সত্যই শৈলরাজ হিমালয়ের মাহাত্ম্য শিব হইতে প্রচারিত। কৈলাসে সদা তিনি নিবাস করেন। কৈলাস তাহার নিবাস স্থান। এইখানে তিনি কেদারনাথ, রুদ্রনাথ, তুঙ্গনাথ, অমরনাথ, মুক্তিনাথ ও পশুপতি নাম ধারণ করিয়া বাস করিতেছেন।

আদি কেদারখণ্ডে হিমালয়ে সব তীর্থ বিদ্যমান হিমালয় হইতে শত শত নদী আসিয়া মহানদী গঙ্গাদেবীর আশ্রয় নিয়া জলনিধি মহান্ সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছেন। হিমালয় হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত শৈলসুতা গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হইয়াছেন। তিনি আপন পিতামাতার সঙ্গে প্রতিক্ষণ মিলিত হইতেছেন। মাতঃ, গঙ্গাদেবী আপনার সঙ্গে করিয়া কত যে মূল্যবান দ্রব্যাদি ও কত মাটী, বালী, পাথর আদি নিয়া আসিতেছেন, তাহার কোন ইয়ত্তাই নাই।

এই সবই আমাদের জীবনে খুবই উপযোগী বস্তু, ইনি আপন পতি দেবের ঘর হইতে মেঘরূপে জল বর্ষণ করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন। হিমালয়, গঙ্গা এবং সাগর এই তিন আমাদের জীবণাধার, যদি এই তিন না হইত তাহলে আমরাও থাকিতাম না,

এবং আমাদের অস্তিত্বও ইহার উপরে অবলম্বিত, ইহাদের সবের উপরে হিমালয় গিরিরাজ; ইনি সকলকে আশ্রয় দিয়াছেন। সমস্ত তীর্থের স্থান দিয়াছেন, আরও কত সিদ্ধ, ঋষী, মুনি ও কত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, তপর্ষি আদিকে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার মহিমা অপার, এইজন্য তিনি পরম পাবন ও পরম পূজনীয়, আবার ইনি পরম গহন, পরম অগম্য, পরম পবিত্র এবং পরম পরোপকারী। অনেক বড় বড় তেজর্ষি রাজা রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ইহারই শ্রীচরণে শরণ নিয়া কৃত কৃতার্থ মনে করিয়া থাকে। "মা গঙ্গার এত অধিক মহিমা শাস্ত্রে লিখিয়াছেন—"বেরাতীরে তপংকুর্য্যাৎ মরণং জাহ্নবী তটে,— নর্ম্মদা তীরে তপস্যা করিবে, আর জাহ্নবী পতিতপাবনী গঙ্গার তটে শরীর ত্যাগ করিবে। সেই গঙ্গাদেবীকেও গিরিরাজ স্থান দিয়াছেন। এই হিমালয়ের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ দর্শন পরম শান্তিময়, পরম পবিত্রময়, এবং যোগীদের যোগের প্রধান আশ্রয়ের স্থান।

এই হিমালয়ের মধ্যে গন্ধমাদন পর্ব্বতের স্থান। গন্ধমাদন শব্দের অর্থ একটুও মিথ্যা নয়। পুরাণে এইসব পর্ব্বতশ্রেণীকে গন্ধমাদন বলিয়াছেন। বদ্রীনারায়ণের মন্দির এই গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত। এই গন্ধমাদন নাম মিথ্যা নয়, কেননা এই সব পর্ব্বতের ঘাস, ফুল, পত্রের মধ্যে এমন একপ্রকার উৎকট মাদক গন্ধ আছে, তাহা অনুভব না করিলে বলা যায় না। এই সব স্থানের জঙ্গলের মধ্যে উৎপত্তি হয়, বন তুলসী, মদন পত্রাদি এত উৎকট গন্ধ তাহা বলা যায় না। এইখানের পর্ব্বতে যে ধূপ উৎপন্ন হয়,

অর্থাৎ যাহা শ্রীবদরীনারায়ণের পূজার উপচার স্বরূপ দেওয়া হয়, এই ধুপের মধ্যে কিছুই মিশাইতে হয় না। স্বতঃ এত সুগন্ধ হয়, চতুর্দ্দিক মোহিত করিয়া দেয়, শুকাইলেও গন্ধ তদ্রূপই থাকে। রুদ্রনাথের উপরের পর্ব্বতে এবং মালা গ্রামের জঙ্গলে ও পাণ্ডুকেশ্বরের পর্ব্বতে অনেক বিষাক্ত ঔষধের গাছ গাছড়া সব আছে, ইহাদের যে পুষ্প পত্রাদি আছে, যদি কেহ তাহাদের একটু ঘ্রাণ নেয়, তখনই মূর্চ্ছাগত হইয়া যায়, আমি নিজেই কৈলাস যাত্রায় ফিরিবার সময়ে একটী ফুলের গন্ধের ঘ্রাণ নিতেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চৈতন্য ছিল না। শ্রীবদরীনাথ হইতে যেই বিশাল হিমগিরি দেখা যায়, যাহা বার মাস বরফে আচ্ছাদিত থাকে, তাহাতে এমন সব স্থলপদ্ম জন্মে তাহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে। এইসব ফুলের গন্ধ যদি এক মিনিট সময় ঘ্রাণ নেওয়া হয়, তবে মূর্চ্ছাগত হইয়া যায়। এইখানে অন্য এক প্রকারের পুষ্পের গাছ আছে তাহার ফুল নীলা রঙ্গের হয়, তাহা খাইতে মিষ্টি কিন্তু ইহার একটুখানি শিকড় যদি পিসিয়া খায়, তখনই সে লোক মরিয়া যায়। অন্য একপ্রকারের ফুল হয়, তাহার পত্রের রস যদি এক গ্লাস জলে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তখন ঠিক যেন চিনি পানার মতন মধুর হইবে। কিন্তু পান করিবার সঙ্গে সঙ্গে এত অধিক বাহ্য হইবে তাহা আর বন্ধ হইবে না। এই সব কারণে বোধ হয় গন্ধমাদন নাম রাখিয়াছেন।

শ্রীবদরীনাথ ধাম এই গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরে, শ্রীনারায়ণ এই পবিত্র ধামের দেবতা, নারদ তাঁহার প্রধান অর্চ্চক এবং অলকানন্দা এই ক্ষেত্রের প্রধান তীর্থ। বহু পুরাণের স্থানে স্থানে শ্রীবদরীনাথ, নরনারায়ণের অলকানন্দার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন, বদরীনাথ ধামের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য বহু তীর্থ দেখা যায়, ভারতীয় সাংস্কৃতির প্রতীক, আমরা আপন সভ্যতা, জাতীয়তা, ধর্ম্ম তথা সংস্কৃতির বোধ পুরাণ এবং মহাভারতের সাহায্যে প্রাপ্ত হইতে পারি। অতঃ প্রথম অত্যন্ত সংক্ষেপে এইসব তত্ত্বের বিষয় বিচার করিব, কোথায় কোথায় পুরাণে ও মহাভারতে শ্রীবদরীনাথের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এই হিমালয়ে এমন কোন বস্তু নাই যাহা হিমরাজের রাজধানীতে নাই। কত যে অনন্ত ধন, রত্নাদি মূল্যবান দ্রব্য পড়িয়া রহিয়াছে তাহার কোন ইয়ত্তাই নাই। শ্রীরাম ভক্ত মহাবলী হনুমান লক্ষণের প্রাণ রক্ষার্থে এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ নিতে আসিয়াছিল। কিন্তু ঔষধ চিনিয়া নিতে না পারায় এই পর্ব্বতের কিয়দংশ উত্তোলন করিয়া নিয়া গিয়াছিল, তাহার চিহ্ন আজও সাক্ষী দিতেছে।

পঞ্চম খণ্ড।

পুরাণে শ্রীবদরীনাথ

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রানাং প্রথমং ব্রহ্মণাস্মৃতম্।
অনন্তরং চ বক্তেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ॥

(ব্রহ্মাণ্ড পুঃ)

প্রজাপতি ব্রহ্মা সমস্ত শাস্ত্রের পূর্ব্বে পুরাণকে প্রচার করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার মুখকমল হইতে চার বেদ উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা, স্বাধ্যায় আদি যাহা কিছু করিনা কেন, তাহার ফল মাহাত্ম্য সব পুরাণের সাহায্যে জানিতে পারি, কোন্ তীর্থ কোন জায়গায়, পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানিতে পারি না। শ্রীবদরীনাথের মাহাত্ম্য প্রায় পুরাণে কিছু না কিছু অবশ্য বর্ণন করিয়াছেন। কোথাও নর-নারায়ণের, কোথাও অলকানন্দা এবং ভাগীরথীর বর্ণন কোথায়ও মন্দাকিনীর বিষয়ের বর্ণন দেখা যায়। শ্রীবদরীক্ষেত্রে অনেক তীর্থ গুপ্ত ও প্রকাশ্যভাবে রহিয়াছে, পুরাণে তাহা দেখা যায়। বিশেষভাবে স্কন্দপুরাণেই খুব বড়, কেননা ইহার শ্লোক সংখ্যা ৮১১০০ ইহাতে ১৪ অধ্যায়ে নরের

উৎপত্তি, এবং ৭ খণ্ড, পুনঃ ইহাতে এক বৈষ্ণব খণ্ডও আছে। ইহাতে প্রায় তীর্থের বর্ণন করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণও বৃহৎ শ্লোক সংখ্যা ৫৫০০০, ইহাতে সৃষ্টি খণ্ডের ১৪ অধ্যায়ে নরের উৎপত্তি অতি বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছ। মহাদেবের হাতের কপাল্য কাশীতে ছুটিয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য কাশীতে কপালমোচন তীর্থ হইয়াছিল। উত্তরখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে নর-নারায়ণের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, এবং শ্রীবদরীনারায়ণেরও অলকানন্দা ও গঙ্গাস্নানের ফল তথা আদি কেদারনাথের বিষয়ে বর্ণন করা হইয়াছে, শ্রীমৎ ভাগবৎ পুরাণ সমস্ত পুরাণের শিরোমণি। ইহাতে শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০। দ্বাদশ স্কন্ধে পূর্ণ, ইহাতে অনেক স্থানে বদ্রীপুরীর বিষয়ে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন।

অমুক রাজা রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রয়মোবিশাপম্, বদরীকাশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন। এই প্রকারের কথা প্রায় স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান বদরীকাশ্রমের মাহাত্ম্যের গুণগান করিবার জন্য উদ্বভক্তকে পাঠাইয়াছিলেন। একাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারের বর্ণন করা হইয়াছে। নর-নারায়ণের অবতারের বিষয়েও ১১ শ্লোকে বেশ পরিস্কারভাবে লিখিয়াছেন। ৫ম স্কন্ধে ১৯শ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের বর্ণনা করিতে ভারতের আর্য্য জাতির প্রধান উপাস্য দেবতা ভগবান বদ্রীনারায়ণের উপাসনার কথায় বলিয়াছেন। এইপ্রকারের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বদ্রীনারায়ণই মনুষ্যের অন্তিমের গন্তব্যস্থান বনিয়াছেন। সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস ধারণ

করিবার সময়ে বিরজা হোম হইয়া থাকে; সেই সময়ে গুরুদেব আজ্ঞা দিয়া থাকেন বদ্রীনারায়ণে গিয়া তপস্যা কর. যেমন ব্রাহ্মণের ছেলেদের যজ্ঞোপবিত হইবার পরে বলিয়া থাকে কাশীধামে যাইয়া বেদ অধ্যয়ণ কর। এইপ্রকারের বহু প্রমাণ পুরাণে শ্রীবদ্রীকাশ্রমের বিষয়ে লিখিয়াছেন। যেমন দেবী ভাগবতে * ১১ স্কন্ধে ১৮০০০ হাজার শ্লোক, ইহাকে উপপুরাণ বলা হয়। ইহাতেও নারদ নারায়ণের সংবাদ স্থানে স্থানে বদ্রীনারায়ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বদ্রীক্ষেত্র কি প্রকারের উৎপন্ন হইয়াছে, কি প্রকারে কে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এবং বদরীক্ষেত্রে কি প্রকারে ইন্দ্র তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিয়াছে, বসন্ত কামদেব এবং অপ্সরাদের পাঠাইয়াছিল, তখন উর্ব্বশীর উৎপত্তি ইত্যাদি কথা বর্ণিত হইয়াছে। আরও অনেক পুরাণে দেখা যায়, বদ্রীনারায়ণের বিষয় লিখিত হইয়াছে, বায়ু পুরাণে, বামন পুরাণে, কুর্ম্ম পুরাণে, বরাহ পুরাণে, নারদ পুরাণে, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এবং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে ৪র্থ খণ্ডে বিভক্ত, ব্রহ্ম খণ্ড, প্রকৃতি খণ্ড, গণেশ খণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড আদি, ইহার শ্লোক সংখ্যা ১২ হাজার, ব্রহ্ম খণ্ডে ২৯শ অধ্যায় হইতে ৩০ অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীমন্নারায়ণের সম্বন্ধে সুন্দর কথা লিখিত হইয়াছে, শিবের বর পাইয়া এবং তাহার আজ্ঞা লইয়া নারদ মুনিজী মহারাজ বদরীকাশ্রমে গিয়াছিল, তখন ভগবান বিষ্ণু ঋষিদের সঙ্গে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল. আপনি এই ভয়ানক হিমের মধ্যে বসিয়া কাহার তপস্যা করিতেছেন? নারদমুনি বলিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করিতেছি, ভগবান বলিলেন, আমি এবং কৃষ্ণ অভিন্ন।

এরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বলিয়া বড় সুন্দরভাবে স্তুতি করিয়াছেন। প্রকৃতি খণ্ডে ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীদেবী, ভূদেবী, গঙ্গা, তুলসি, এই চারি পত্নীর বিষয়ে বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাধা ইহাকে দ্রবরূপে দেখিয়া পান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। তুলসী কি প্রকারে বদ্রীনারায়ণে তপস্যা করিয়াছিল। এই সব কথা খুবই সুন্দর ও বড় রোচকভাবে এবং অত্যন্ত সাহিত্যিক ও ললিতভাষায় বর্ণন করা হইয়াছে।

কেদার খণ্ড

কেদার খণ্ড নামে এক ভিন্ন গ্রন্থও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পুরাণান্তর্গত বলিয়াছেন, ইহাতে ২০৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। হরিদ্বার হইতে শ্রীবদরীনাথ, কেদারনাথ, যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত করা হইয়াছে। যদ্যপি বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত স্কন্ধ পুরাণে ২০৬ অধ্যায় পাওয়া যায় না। ইহাতে কেদার খণ্ড অবশ্য আছে, কিন্তু উহাতে ১০ অধ্যায় পর্য্যন্ত আছে। বদ্রীনাথের মাহাত্ম্য ভিন্ন ৮ অধ্যায় দেখা যায়। এতকিছু পাওয়া সত্ত্বে আমি এই গ্রন্থকে অপ্রমাণিক মনে করি না। ইহার শ্রেণী পৌরাণিক এই গ্রন্থ কখনও স্কন্ধ পুরাণের অন্তর্গত থাকিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে যে স্কন্ধ পুরাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা কোন স্বতন্ত্র যথাক্রম গ্রন্থ নয়, নানা বিষয়ের দ্বারা গ্রন্থের সাহায্যে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

সম্ভব সংগ্রহ করিবার সময়ে ভুল হইয়া গিয়াছে। মনে হয় বৃহৎ স্কন্দ পুরাণ ও ইহার অংশ। স্কন্দ পুরাণের বিষয় বলা অসম্ভব, কেননা তাহা অপ্রাপ্য। আবার পুরাণও অনেকপ্রকারের দেখা যায়, যেমন মহাপুরাণ, উপপুরাণ, উপপুরাণ, অল্পপুরাণ ইত্যাদি, এইজন্য ইহা বলা যায় না এই গুলি কোন অর্বাচীন পণ্ডিত দ্বারা মনগড়া লিখিত হইয়াছে। তাই, আমি শ্রদ্ধাবান্, সেইজন্য আমি সব বিশ্বাস করি, বিশ্বাসই আমার জীবনের পরম বন্ধু হউক। আমি অন্যান্য গ্রন্থ যেমন বিশ্বাস করি, এই কেদার খণ্ডকেও শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করি। এই কেদারখণ্ডও প্রায় ৮৷৯ শত বৎসরের পুরাতন হস্ত লিখিত গ্রন্থ, দেব প্রয়াগে আজ পর্য্যন্তও বিদ্যমান আছে। এখন বিচার করা যাক্, আজ হইতে দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে উত্তরা খণ্ডের মার্গ কত যে দুর্গম ছিল, তাহার অনুমান পর্য্যন্ত করা অসম্ভব। এখন বিচার করুন আজ হইতে ৮৷৯ শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার কে অনুমান করিবে ? সেই সময়ে উত্তরাখণ্ডের কোণায় কোণায় সমস্ত তীর্থের বিষয় লিখিয়া দেওয়া কোন মনুষ্যের কাজ নয়। কেদারখণ্ডের বিষয় খুবই সুন্দর সুললিত ভাষায় লিখিত। ইহাতে সঙ্গীত বিদ্যার বিষয়েও অপূর্ব্ব বর্ণনা আছে। এই প্রকারের বহু পুরাণে বদ্রী-কেদারের বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিশালপুরী বা বদরীবিশাল।

স্থূলসূক্ষ্ম শরীরং তু জীবস্য বসতিস্থলম্।
তদ্ বিনাশর্য্যৎ জ্ঞানা বিশালাতেন কথ্যতে॥

(স্কন্দ পুঃ)

অর্থাৎ—মনুষ্যের শরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই শরীর বাস করে, এই দুই শরীরকে জ্ঞানের দ্বারা নাশ করিতে পারে বলিয়া ইহাকে বিশাল বলা হয়।

শ্রীবদরীপুরীকে বিশাল কেন বলা হয়? এই বিশাল নামে পুরাণে অনেক অর্থ দেখা যায়। স্কন্দ পুরাণে লিখিয়াছে—এখানে পূর্ব্বে সমস্ত তীর্থদের, দেবতাদের ও সমস্ত ঋষিদের বাস ছিল বলিয়া বিশাল নাম পড়িয়াছে। কোন সময় দেবতাগণ ও মুনি-ঋষিগণ প্রত্যক্ষভাবে নিবাস করিতেন মনে হয়। বর্ত্তমানে আমরা কলিযুগের জীব বলিয়া সহসা দর্শনও পাই না। কিন্তু হিমালয়ের মধ্যে কেদার বদ্রী ঠিক যেন বিশালই। বদ্রীনাথের নিকট নারায়ণ পর্ব্বত, তাহাতে উঠিলে, বদরীনাথ বিশালপুরীর শোভা কত যে সুন্দর ও মনোরম

তাহা বর্ণনাতীত! আঁকিয়া বাঁকিয়া ভগবতী অলকানন্দা কল কল শব্দ করিয়া যেন মধুর নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। যদি কোন পুণ্যের প্রভাবে সেই মনোহর-তরঙ্গের শোভা চক্ষুর নিকটে আসিয়া যায়, তবে পুনঃ সংসার-সাগরের অতি সঙ্কটময় তরঙ্গের দর্শন কিপ্রকারে হইতে পারে? হে দেবী! তোমার পবিত্র জল পান করা মাত্রই আপনি পীতাম্বরধারী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পুর—বৈকুণ্ঠধামে নিবাস দিয়া থাকেন। হে মাতঃ! যদি শরীরধারীর কোন শরীর, আপনার পরম পাবনীর কোলে ত্যাগ করে, তবে সেই সময়ে সেই আনন্দের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রপদ প্রাপ্তি ও অত্যন্ত তুচ্ছ হইয়া থাকে। ভগবতী অলকানন্দার মহিমা আমার মত এ ক্ষুদ্রজীব কি বর্ণন করিতে পারে।

বরাহ পুরাণের আটচল্লিশ অধ্যায়ে কল্কী দ্বাদশী ব্রতের প্রসঙ্গে রাজা বিশালের কথা আছে। এবং অন্যান্য পুরাণেও আবার অন্য কথা লিখিয়াছেন, ইহার বিষয়ে এরূপ কথা লিখিত রহিয়াছে—

সূর্য্যবংশে বিশাল নামে কোন রাজা ছিলেন। ইনি শত্রুদ্বারা পরাজিত হইয়া অতি দুঃখে হিমালয়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতের কোনও গুহায় এই বদরী পুরীতে থাকিয়া ঘোর তপস্যা করিতে থাকেন। তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান নর-নারায়ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীরূপে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান তখন বলিলেন—হে রাজন্! আমি তোমার তপস্যায় অতি সন্তুষ্ট হইলাম, অতএব যে কোন বর তুমি প্রার্থনা করিয়া নিতে পার।

রাজা বলিলেন—ভগবান্ !আমি ইহা পূর্ব্বে জানিতে ইচ্ছুক আপনারা দুজন কে এবং বর দিবার জন্য শ্রেষ্ঠ দেবতা কে ? নর-নারায়ণ বলিলেন—তুমি যার জন্য তপস্যা করিতেছ এবং যাহাকে প্রসন্ন করিতে এ ঘোর অরণ্যে আসিয়া তপাস্য করিতেছ, সে অনাদি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমিই। রাজা বলিলেন— আমি একমাত্র ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছি।

নর-নারায়ণ বলিলেন—আমি বিষ্ণু, আমি শিব, আমি ব্রহ্মা, আমিই শক্তি এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভাব হইয়া থাকি।

তখন রাজা ভগবানের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এবং বিধিবৎ পূজা করিয়া, ভক্তি নম্রভাবে স্তুতি আদি করিবার পর বলিলেন্, ভগবান্ - যদি আপনি এ কাঙালের উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার যে রাজ্য শত্রু দ্বারা হৃত হইয়াছে, তাহা পুনঃ আমার প্রাপ্তি হউক্। যদ্দারা বিধিবৎ পূজা যজ্ঞাদি করিতে পারি ও আপনার উপরে অচল অটল ভক্তি বিশ্বাস লইয়া পরম শান্তিতে রাজ্য সুখভোগ করি।

ভগবান্ বলিলেন—হে রাজন্! তুমি ভুল করিতেছ যে কেহ এই পবিত্র পাবনতীর্থে আসেন, সে পুনঃ ফিরিয়া যাইতে পারে না। অতএব তুমি রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া এইখানে তপস্যা কর।

তাহা হইলে অন্তিমে পরমাগতি লাভ হইবে। পুনঃ রাজা আগ্রহ করিয়া বলিলেন, ভগবান্ আমার এখনও প্রবল ইচ্ছা রাজ্য প্রাপ্তির, হে প্রভু প্রথমে এই বরই দিন্। ভগবান্ বলিলেন—আচ্ছা তোমার রাজ্য তোমার পুনঃ প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু আমার এই পুরী আজ হইতে তোমারই নামে বিখ্যাত হইবে। যে কেহ আমার নামের পূর্ব্বে তোমার নাম লইবে তাহার মহান পূণ্য সঞ্চয় হইবে। তদবধি এই পুরীর নাম বিশাল বদরী নামে বিখ্যাত হইল। সেইজন্য বদরীনাথের যাত্রীরা মার্গ চলিবার সময় পরস্পর এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকে, বোল্ বদরী বিশাললাল কি জয়।

স্কন্দ পুরাণে বিশালপুরীর চারি নামের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, সত্যযুগে মুক্তিপ্রদা, ত্রেতায় "যোগসিদ্ধতা" দ্বাপরে বিশালা এবং কলিযুগে বদরিকাশ্রম।

কৃতে মুক্তিপ্রদা প্রোক্তা ত্রেতায়াং যোগসিদ্ধিদা।
বিশালা দ্বাপরে প্রোক্তা কলৌ বদযিকাশ্রমঃ॥
(স্কন্দ পুঃ)

ষষ্ঠ খণ্ড।

শ্রীবদরীনাথের বিগ্রহ

সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনা কাশং পরমাকাশং,
গোষ্ঠপ্রাঙ্গনরিঙ্গন লোল মনায়াসং পরমায়াসম্‌।
মায়াকল্পিত নানাকারমনাকারং ভুবনাকারং,
ক্ষমানাথমনাথং প্রণমত শ্রীবদরীং পরমানন্দম্‌॥

যেই পরমাত্মা সত্য তিনকালেও অবাধিত, জ্ঞান এবং অনন্ত-স্বরূপে আছেন। আবার যেই ভূতাকাশ হইতে পৃথক্‌ হইলেও পরমচিদাকাশ রূপ অথবা ছিদ্র রহিত এবং নিত্য স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, সেই নিরাকার পরমাত্মা সাকাররূপে প্রকট হইয়া ব্রজের গোশালার প্রাঙ্গনে ও গো বৎসের পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতে চঞ্চল বালকৃষ্ণ শ্রীশ্যামসুন্দরকে অতি সুন্দর দেখায়, প্রকৃতপক্ষে এই প্রভু সংসারে সমস্ত শ্রম রহিত নির্ব্বিকার ও কুটস্থ হওয়া স্বত্বেও অনাদি অবিদ্যার সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব—ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের অনুভব করিয়া শ্রমযুক্ত হইয়া যায়। যদ্যপি এই পরমাত্মা নির্গুণ নিরাকার, তথাপি অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়াশক্তির সম্বন্ধ হইতে বিবিধ দিব্যাদিদিব্য অনেক শরীরাদির আকার প্রতীত হয় এবং সমস্ত

চতুর্দ্দশ ভুবনের আকাশ হইতে বিশ্বরূপ—বিরাট হইতে দেখা যায়, আবার যিনি পৃথিবী দেবী এবং লক্ষ্মীদেবীর স্বামী, আর আপনি স্বয়ং অনাথ ও স্বতন্ত্র, যে প্রভু পরমানন্দ প্রচুর গোবিন্দ ভগবান্ শ্রীবদরী বিশাল—পরমাত্মাকে হে, জীবগণ! আপনারা সকলে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক কোটি কোটি দণ্ডবৎ নমস্কার করুন!

শ্রীবদরীনাথের বিগ্রহ এক শালগ্রাম শিলার দ্বারা প্রকট হইয়াছেন। এই বিগ্রহের কখন স্থাপনা হইয়াছে, কখন হইতে এই মন্দির তৈয়ার করিয়া পূজা—অর্চ্চনাদি হইতেছে, তাহার বিষয়ে কোন সঠিক কিছুই প্রমান পাওয়া যায় না। আমাদের পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নাই। আমাদের পরম নিধি সংস্কৃতির ইতিহাস ও সদাচারের মহান্ চাবি ও ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব যাহা কিছু আছে একমাত্র পুরাণই সার। আমাদের পুরাণে এই সব সন, শতাব্দী নিয়া গোলমাল করেন নাই, এ বিষয়ে তাহারা সদা উদাসীন। আমাদের পুরাণে কালকে নিত্য বলিয়া মানে, কাল অনাদি, অখণ্ড, অব্যক্ত, অসীম, নিত্য এবং শাশ্বত বলিয়া থাকে। সেইজন্য আমাদের ঐ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যদ্বারা ভগবানের প্রীতি হয়, এবং ঐ কথা শ্রেষ্ঠ যদ্বারা ভগবানের গুণগান করা হয়। সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রাপ্তি। প্রভু প্রেম। যেই কার্য্যদ্বারা সাংসারিক কর্ম্ম হয়, তাহা অকার্য্য মনে করিতে হয়। যে বিদ্যা দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি না হয়—তাহা অবিদ্যা, আমাদের যত কিছু বিশ্বের মধ্যে দেখা যায়, তাহা সমস্তই প্রভুর লীলা খেলা। ভগবান যখন

অনাদি, অনন্ত, অসীম, তখন তাঁহার নামরূপ, লীলাধামাদিও অনাদি, এরূপভাবে বদরীনাথজীও অনাদি। নর-নারায়ণের লীলাও যেই বদরীনাথের বিগ্রহ আমরা বড় শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত পূজা অর্চ্চনা ও দর্শন করিয়া 'পরম তৃপ্তি তথা আনন্দ অনুভব করি, তাহাও অনাদি। কখনও পূজা অর্চ্চনায় আচার ব্যবহারে সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া অবিশ্বাস কারবাব কোন কারণ নাই। এই প্রকারের কত যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, জগৎ স্বয়ং পরিবর্ত্তনশীল, এই সবই তাঁহার লীলা সদা সর্ব্বদা চলিয়া আসিতেছে।

পুরাণে যেরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, প্রথমতঃ বদ্রীবনে ভগবানের কোনও মূর্ত্তি আদি কিছুই ছিল না, প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীহরি আপন স্বরূপে থাকিয়া তপস্যা কবিতেন। তাঁহার এরূপভাবে কঠোর তপস্যা করিতে দেখিয়া নারদমুনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন! আপনি স্বয়ং ত্রিলোকের ঈশ্বর, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় একপলের মধ্যে করিতে পারেন, অতএব আপনি জগৎপতিপরমেশ্বর হইয়া আপনি কাহার তপস্যা করিতেছেন? নারদ মুনির কথা শুনিয়া ভগবান শ্রীহরি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হে নারদ এই জগৎ উৎপত্তি প্রকৃতির কারণভূত আমিই, আত্মাই পরতত্ত্ব, আমি সেই আত্মাস্বরূপেরই ধ্যান করিতেছি। (কেননা আবার ইন্দ্রিয় দমনের জন্য একান্ত নির্জ্জনে থাকা কর্ত্তব্য) চিত্ত নিরোধই যোগ চিত্ত নিরোধের জন্য ইন্দ্রিয় দমন প্রয়োজন। আর চিত্ত নিরোধ

হইতে কামনা বাসনার নাশ হয়, বাসনার নাশ হইলে যোগী, তপস্বীদের ব্রহ্মানন্দ আত্মানন্দ রসের অবিচলভাবে অনুভব হইয়া থাকে। সেইজন্য যোগীঋষিদের সদা যত্নপূর্ব্বক নির্জ্জনে থাকিয়া, চিত্তের নিরোধ করা নিতান্ত আবশ্যক, চিত্ত নিরোধই যোগীর পরম পুরুষত্ব। সেইজন্য আমাকে দেখিয়া অজ্ঞানী জীব সদা নির্জ্জনে থাকিয়া যোগ সাধনাদি তপস্যা করে, তজ্জন্য আমিও তপস্যা করিতেছি। "যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবে তর জনঃ,—একথা শুনিয়া নারদজী মহারাজ খুব আনন্দিত হইয়া সেইখানেই শ্রীবদ্রী-নাথজীর সেবা পূজাদি করিতে থাকেন। এইজন্য এখনও লোকে বলিয়া থাকেন, শ্রীবদ্রীনারায়ণের পূজা ছয়মাস দেবতারা করে, অবশিষ্ট ছয় মাস মনুষ্যেরা করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীবদ্রীনারায়ণের পূজারী বা অর্চ্চক নারদ মুনিজী। এই ক্ষেত্রের অন্য নাম নারদ ক্ষেত্র, শ্রীমৎ ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে প্রত্যেক দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, ভিন্ন ভিন্ন অর্চ্চক, যেমন হরিবর্ষে নৃসিংহ উপাস্য, প্রহ্লাদ অর্চ্চক, শ্রীচণ্ডীর অর্চ্চক মার্কণ্ড মুনি, কিং পুরুষ খণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের উপাস্য হনুমান, এই প্রকারের জম্বুদ্বীপে ভগবান্ নর-নারায়ণ উপাস্য নারদজী তাঁহার প্রধান উপাসক বা অর্চ্চক।

এইপ্রকারের ভারতীয়ের প্রজার সঙ্গে নর-নারায়ণরূপী ভগবানের পঞ্চরাত্র বিধিতে উপাসনা করিতেন। পঞ্চরাত্র পূজা পদ্ধতির বিষয় নারদের কি রকমে প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহার বিষদভাবে নারদ পুরাণে, বরাহ পুরাণে, বিষ্ণু ধর্ম্মত্তর পুরাণে

তথা অন্যান্য' পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ নারদ মুনি পাঁচ রাত্র এইখানে ছিলেন বলিয়া পঞ্চরাত্র বলা হয়। এই পঞ্চরাত্রির হাজার শাখা আছে, তবে কোথায়ও দশ বার শাখা পাওয়া যায়, অবশিষ্ট অপ্রাপ্য। অধিক বিস্তার ভয়ে এ পঞ্চরাত্রির বিষয় বর্ণন করা হইল না।

সপ্তম খণ্ড।

শ্রীবদ্রীনাথের বর্ত্তমান বিগ্রহ।

পুরাকৃত যুগস্যাদৌ সর্ব্বভূত হিতায় চ।
মূর্ত্তিমান্ ভগবাং স্তত্রতপো যোগ সমাশ্রিতঃ॥
ত্রেতাযুগে হি ঋষি গণৈ যোগাভ্যাসৈক তৎপরঃ।
দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে জ্ঞান নিষ্ঠোহি দুর্ল্লভঃ॥

সত্যযুগে ভগবান্ মূর্ত্তিমান হইয়া তপস্যা করিতেন, ত্রেতায় যোগভ্যাসী ঋষিগণের সাক্ষাত দর্শন লাভ হইত। দ্বাপরে জ্ঞাননিষ্ঠ মুনিদের ভগবান্ দর্শন দুর্ল্লভ প্রায় হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহাদেরও দর্শন কদাচিত হইত।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, শ্রীবদ্রীনাথ ভগবান সাক্ষাৎরূপে এ পবিত্রক্ষেত্রে নিবাস করিতেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অবতার গ্রহণ করিবার জন্য যাইতেছেন, তখন ঋষিগণ এবং দেবগণ হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'হে প্রভু জগদীশ্বর আপনিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, আপনি যদি এই ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তবে মনুষ্যের যেমন প্রাণহীন হইলে পড়িয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদেরও সেই দশা হইবে। অতএব একরূপে এই ক্ষেত্রে নিবাস করুন, এবং অন্যরূপে জীবের মুক্তির জন্য অবতার গ্রহণ করুন।

ভগবান্ বলিলেন—হে দেবতা এবং ঋষিগণ, তোমরা সকলে আমার একটি কথা শুন, কিছুদিন পরে ভয়ানক কলিযুগ আসিতেছে। কলিযুগের প্রাণীগণ ভয়ঙ্কর পাপী, ধর্ম্ম কর্ম্মহীন, অত্যন্ত কলহপ্রিয়, মিথ্যাবাদী, মহান্ কামী ও অহঙ্কারী হইবে, সেইজন্য আমি তাহাদের সম্মুখে সাক্ষাৎরূপে থাকিতে পারি না। অতএব তোমরা সকলে এক কর্ম্ম কর, এইস্থানে নারদশীলার নিম্নে অলকানন্দায় আমার এক অতি সুন্দর মনোরম দিব্যমুর্ত্তি আছে, তোমরা ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া স্থাপিত কর। ইহাকে যে কেহই দর্শন পূজন করিবে, সেই আমারই সাক্ষাৎ দর্শনের ফললাভ করিবে।

তখন দেবতা এবং ঋষিগণ সকলে মিলিয়া নারদ কুণ্ড হইতে সেই দিব্য মুর্ত্তি বাহির করিয়া স্থাপনা করিলেন। এই মুর্ত্তি শালগ্রাম শীলার উপরে খুব সুন্দর দিব্য মনোরম ধ্যানমগ্ন চতুর্ভুজ মুর্ত্তি। তখন দেবতা ও ঋষিগণ মিলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে মন্দির তৈয়ার করিয়া দিতে বলিলেন, তখন হইতে দেবর্ষি নারদ হইলেন প্রধান অর্চ্চক; তদবধি দেবতারা ছয় মাস পূজা করেন, অবশিষ্ট ছয় মাস মনুষ্যেরা পূজা করিয়া আপন আপন অভিষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন, পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—

যদিবো দর্শনে শ্রদ্ধামণ্ডপস্থ সুরেশ্বরাঃ।
গৃহীধ্বং মামকী মুর্ত্তি শৈলী নারদ কুণ্ডগাম্॥

ততস্তা গিরিমার্কগু ব্রহ্মাদ্যা হৃষ্টমানসাঃ।
নিষ্কাস্য শৈলীতাং দিব্যং মূর্ত্তি নারদ কুণ্ডগাম্॥
স্থাপয়ামাসু বর্জ্যাচ্য স্বংস্ব ধাময়যুস্ততঃ।
বৈশাখে মাসীন্তে দেবা গচ্ছন্তি নিজ মন্দিরম্॥
কার্ত্তিকেতু সমাগত্য পুনর্চ্চাং চরন্তি চ।
ভো বৈশাখ মারভ্য মানবা হিম সংক্ষপাৎ॥
লভন্তে দর্শনং পুণ্যা পাপকর্ম্ম বিবর্জ্জিতাঃ।
ষন্মাসং দৈবতৈঃ পূজ্যা ষণ্মাসং মানবৈস্তথা॥

অন্য এক পুরাণেও লিখিত আছে ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রথমে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, পরে রাজা পুরুখা মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেন। ইহাতে প্রমাণ হয় এই মূর্ত্তির পূজা দ্বাপরের অন্তে আরম্ভ হইয়াছে। অনন্তর স্বয়ং শঙ্কর ভগবান্ নিজ পুত্র স্কন্ধ মুনিকে বলিয়াছিলেন—হে পুত্র! কলিযুগ আসিলে আমি নারদ কুণ্ড হইতে নারায়ণের মূর্ত্তিকে সন্ন্যাসী (শ্রীশঙ্করাচার্য্য) রূপে ইহাকে স্থাপনা করিব। যাহার দর্শন মাত্রই কলির জীবের, পাপ তাপ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। যেমন জঙ্গলে পশুরাজকে দেখিলে অন্যান্য ছোট ছোট জন্তু পলাইয়া যায়। ইহাতে স্পষ্ট সিদ্ধ হয়, শ্রীবদ্রীনারায়ণের মূর্ত্তি জগৎ গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য দ্বারা নারদ কুণ্ড হইতে উঠাইয়া স্থাপনা করা হইয়াছে, ভবিষ্যপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, ভগবান শঙ্করাচার্য্য শঙ্করের অবতার, এই মূর্ত্তি তাঁহার দ্বারা স্থাপনা করা হইয়াছে। অন্য যায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে,

যখন দেখিলেন অসুরেরাও যজ্ঞ, পূজাদি করিতেছে, তাঁহাদের যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু বৌদ্ধের অবতার ধারণ করেন। কারণ বিষ্ণুই একমাত্র যজ্ঞ-স্বরূপ, এইজন্য বিষ্ণু পূজার খণ্ডন করা হয়, বৌদ্ধেরা বিষ্ণু পূজাদি সব বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু বদ্রীনাথের ধ্যান মুর্ত্তিকে সকলে অনুমান করিয়া বলিল—এই মূর্ত্তি বুদ্ধ ভগবানের, সেইজন্য সকলে বুদ্ধমূর্ত্তি মনে করিয়া পূজা করিতে থাকে। যখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদের পরাস্ত করেন, তখন সক্, হুন, বৌদ্ধ অর্থাৎ যাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সকলে তিব্বতের দিকে পলাইয়া যায়, যাইবার সময় এই মূর্ত্তিকে অলকানন্দায় নারদ কুণ্ডে ফেলিয়া দিয়া যায়, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আসিয়া দেখিলেন, মন্দিরে কোন মূর্ত্তি আদি কিছুই নাই। তখন তিনি অন্তর দৃষ্টিতে দেখিলেন, মূর্ত্তি নারদ কুণ্ডে পড়িয়া রহিয়াছে। তৎপশ্চাৎ তিনি নারদকুণ্ড হইতে সেই মূর্ত্তি মন্দিরে স্থাপনা করিলেন। বৌদ্ধেরা অলকানন্দায় ফেলিয়া দিবার সময়ে মূর্ত্তিখানির কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়াছিল, অদ্যাবধি বদ্রীনারায়ণের মূর্ত্তি খণ্ডিত অবস্থায়ই আছেন।

আবার কোন কোন লোকে বলিয়া থাকেন, প্রথমে শ্রীবদ্রী-নারায়ণের মূর্ত্তি তপ্ত কুণ্ডের নিকট গরুড় শীলার নিম্নে ছিল, ভগবান্ পূজ্য রামানুজাচার্য্য এই মূর্ত্তি সেই স্থান হইতে উঠাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে এই মন্দিরের পূজারী রামানুজ সম্প্রদায়ের লোকে করিত, বর্ত্তমান যে মন্দির তাহা স্বামী বরদ রাজাচার্য্য গড়বাল

নরেশকে উপদেশ দিয়া চৌদ্দ বিংশতাব্দীতে নির্ম্মাণ করান, এই পক্ষেরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায় এবং রামানুজ সম্প্রদায়েব বৈষ্ণবেরা সেবা পূজাদি করিত, বর্ত্তমানে তাহারা সকলে গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে। দেব প্রয়াগে যে রঘুনাথেব মন্দির আছে তাহাতে অতি প্রাচীন শীলা লেখা দেখা যায়, মন্দির স্বামী বরদ রাজাচার্য্যের প্রেরণায় নিম্মাণ করা হয়, এরূপভাবে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক্ আমি পৌরাণিক, পুরাণে যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিব। ভগবান্ রামানুজাচার্য্য লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া থাকেন। শঙ্করাবতার পূজ্যপাদ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের বিষয় পুরাণে স্পষ্টভাবে লিখিত রহিয়াছে, যতিরূপে শঙ্কর শ্রীবদ্রী-নারায়ণের মূর্ত্তি নারদ কুণ্ড হইতে উঠাইয়া স্থাপনা করিয়াছেন। গড়বালের প্রতি ঘরে ঘরে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তিকে অতি শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া থাকেন। বদ্রীনাথের এই কথা নির্ব্বিবাদ প্রমাণ এই, যেখানে আদি কেদারের মন্দির তাহারই সম্মুখে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অতি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। এখনও শঙ্করাচার্য্যের গদির ভেট ভিন্নভাবে নিয়া থাকে। মন্দিরের মধ্যেও শঙ্করাচার্য্যের গদি আছে। এই সব কারণে প্রমাণ হয়, মূর্ত্তির স্থাপনা তথা মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা হইয়া অদ্যাবধি পূজিত হইতেছে।

নারায়ণের উপাসনা হিন্দু মাত্রই করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণ প্রান্তের ব্রাহ্মণ মাত্রই নামের পূর্ব্বে স্বামী লিখিয়া থাকে। ইহা মাদ্রাজের প্রথা, কন্যা কুমারীর নিকট কেরল প্রান্তে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের বিশেষ

করিয়া স্বামী বলিয়া থাকে। আমাদের হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময়ে মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তোমার অন্তিম সংস্কার আমি স্বয়ং আসিয়া করিব। মাতার যখন অন্তিম সময় উপস্থিত হয়, তখন শঙ্কর স্বয়ং উপস্থিত হইয়াও সংস্কার করিতে কোন লোকের সাহায্য লাভ করেন নাই। অর্থলোভী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করিয়া, সকলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। শঙ্কর তখন কোন উপায় না দেখিয়া, মাতার অন্তিম সংস্কার ঘরের মধ্যে সমাধা করিলেন। তখন হইতে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের মৃত শরীর শ্মশানে দাহকার্য্য হয় না। ঘরের এক কামরা পৃথক রাখা হয়, ইহাকে পিতৃমন্দির বলিয়া থাকে। শ্রাদ্ধ আদি যাবতীয় কর্ম্ম সেই ঘরের মধ্যে করা হয়। তৎপর শঙ্কর স্বামী আকাশ মার্গে বদ্রীনাথে আসিয়া ভগবানের সেবা, পূজাদি কার্য্যের জন্য এই নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের হাতে অর্পণ করেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, শ্রীবদ্রীনারায়ণের প্রতিষ্ঠা জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের দ্বারা হয়, বর্ত্তমান সভ্য জগতে আমাদের প্রাচীন হিন্দুর মত যাবতীয় নিয়ম নিষ্ঠা, আচার, বিচার, ক্রিয়া কর্ম্ম অদ্যাবধি দক্ষিণার্থে দেখা যায়। কেরল জিলায় বহু নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের বাস, আমি স্বয়ং এই কেরল জিলায় একমাস বাস করিয়াছিলাম। অনেক নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছি, তাহাদের অনেক আত্মীয় আদি বদ্রীনাথে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। এইসব কারণে প্রমাণ হয়, শ্রীবদ্রীনারায়ণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ভগবান পূজ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের দ্বারাই হইয়া পূজিত হইতেছে।

অষ্টম খণ্ড।

পঞ্চ পাণ্ডব—তথা শ্রীবদ্রীনাথ।

ত্রৈলোক্য নিস্মাণকরং জনিত্রং,
দেবাসুরাণমথ নাগরক্ষসাম্।
নরাধিপানাং বিদুষাং প্রধান-
মিন্দ্রানুজং তং শরণপ্রপদ্যে।

(ভাগঃ)

আমাদের পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবৎ তথা মহাভারত হিন্দু মাত্রেই বড় শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ, মনন আদি করিয়া থাকেন। মহাভারতের কথা আমি শিশু অবস্থায় ঠাকুরমাতার নিকট শুনিয়াছিলাম। এই মহাভারতের তথা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রায় স্থানে স্থানে শ্রীবদ্রীনাথের বর্ণনা দেখা যায়। উত্তরাখণ্ডের ঘরে ঘরে পঞ্চপাণ্ডবদের উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা দেখা যায়। শ্রীবদ্রীনারায়ণের নিকটে পাণ্ডুকেশ্বর মহারাজ পাণ্ডুর রাজধানী ছিল। এইখানে পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল। দুষ্টমতি দুর্যোধন যখন পাণ্ডবদের মারিবার জন্য লাক্ষা গৃহে পাঠাইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহারা পলাইয়া এদিকে চলিয়া আসেন। পুনঃ যখন অজ্ঞাত বনবাস হয়, তখনও পলাইয়া

এই উত্তরাখণ্ডে চলিয়া আসেন। আবার যখন রাজা হইয়া হস্তিনার সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন, তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য ধনের আবশ্যকতা হয়, তখন ভগবানের আজ্ঞায় মরুত্তের যজ্ঞের অবশিষ্ট স্বর্ণ লইয়া যাইবার জন্য উত্তরাখণ্ডে আসেন। এবং বহু স্বর্ণ নিয়া গিয়া পরে যজ্ঞ করেন। অন্তে রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া, যখন মহা প্রস্থানের জন্য এই পুন্যভূমি উত্তরাখণ্ডের কোলে আশ্রয় নিয়া পরম শান্তিময় বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ বদ্রীনাথে যাইয়া পুনঃ ফিরিয়া আর আসেন নাই। বদ্রীনাথের পাণ্ডবদের জন্মভূমি ক্রীড়াভূমি, তথা তপোভূমি। এইখানেই অর্জ্জুন তপস্যা করিয়া, স্বশরীরে স্বর্গে যাইয়া অস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন। এইখানেই কিরাত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়, অন্ত সময়ে ও এই পর্ব্বতে আসিয়া আপন নশ্বর শরীরকে হিমালয়ের হিমের মধ্যে একীভূত করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে চলিয়া গেলেন। মহাভারতের প্রায় স্থানে স্থানে বদ্রীনাথের বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে। মহাভারতের বন পর্ব্বের অন্তর্গত তীর্থ যাত্রা পর্ব্বে শ্রীবদরীপুরীর মাহাত্ম্যের বর্ণন করিতে এইরূপভাবে বলা হইয়াছে—শ্রীমন্নারায়ণের পরম শান্তিময়ী আশ্রম যথায় উষ্ণগঙ্গা তথা হিমগঙ্গা এবং দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, মুনি আদি সদা এই পবিত্র আশ্রমে থাকিয়া অহরহঃ তপস্যা করেন। এই স্থানের ক্ষেত্র পরম পবিত্র; অতএব হে রাজন্! তুমি মনে কোন প্রকারের সংশয় না করিয়া সেই পবিত্র বদ্রীধামে গমন কর।

হরিবংশ মহাভারতের একভাগে ৭৬ অধ্যায় হইতে ৮৮ অধ্যায়

পর্য্যন্ত অতি বিস্তারভাবে ঘণ্টাকর্ণের কথা আমি পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছি। পাণ্ডবেরা এই প্রান্তে দেবতার মত পূজিত হইয়া থাকে। পাণ্ডবদের সম্বন্ধে লীলা রচনা করিয়া তথা গান গাহিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। ইহাদের নামে বড় সুন্দর নৃত্য হইয়া থাকে। এই নৃত্যের নাম পাণ্ডব নৃত্য বলে। গড়বালের জিলায় এই পাণ্ডব নৃত্য খুবই প্রসিদ্ধ। এই প্রকারের নৃত্য আমি তিব্বতে ও ভূটানে দেখিয়াছিলাম। তাহাদের ভাষা জ্ঞান না থাকাতে কিছুই বুঝিতাম না। স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া অতি মনোরম নৃত্য করিয়া থাকে। ইহাদের নৃত্য সত্যই দেখিবার মতন। অন্যদিকে নেশায় ভরপুর। এই পর্ব্বতের অঞ্চলে শীত অধিক হওয়াতে ইহারা মাংস এবং মদ বিশেষ করিয়া সেবন করে। পাণ্ডবদের স্মৃতির জন্য অনেক গ্রাম, শীলা, নদী, পর্ব্বত, ঝরণা আদি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনেক স্থান আছে। পাণ্ডবের মধ্যে ভীমেরই অধিক প্রসিদ্ধি দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহার কারণ, ভীমের সঙ্গে হিরম্বা নামক রাক্ষসীর এইখানেই বোধ হয় বিবাহ হইয়াছিল। রাক্ষসদের এইখানেই একমাত্র বিহার ভূমি ছিল। ঘটোৎকচের বংশের লোকে আজও বলিয়া থাকে, আমরা ভীমকে পরম পিতা মনে করিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। এইজন্য এইখানে তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন। গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরে স্বর্গারোহণের সময়ে দ্রৌপদী শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, তখন ভীম আপন পুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করাতে ঘটোৎকচ অনেক রাক্ষসাদি সঙ্গে লইয়া আসেন, ভীম তখন আজ্ঞা দিলেন, দ্রৌপদীকে পীঠের উপরে করিয়া লইয়া চলিতে। অদ্যাবধিও এই অঞ্চলের অধিকাংশ

লোককে দেখিলে মনে হয় সত্য সত্যই ইহারা ঘটোৎকচের বংশধর। বদ্রীনাথের যাত্রীদের যখন পীঠের উপর করিয়া নিয়া যায় ও আসে, তখন মনে হয় ইহারা সাক্ষাৎ রাক্ষসের দল বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রকারের মহাভারতের নানাস্থানে বদ্রীনারায়ণের তথা গন্ধমাদন পর্ব্বতের বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। জগৎগুরু পূজ্য শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে এই প্রদেশে একমাত্র অসুরেরাই বাস করিত, সমস্ত গড়বালের মধ্যে ইহাদের আধিপত্য ছিল। ইহারা অত্যন্ত মদ মাংসাদি সেবন করিত, সেইজন্য পূজ্য শঙ্করাচার্য্য শ্রীবদ্রীনারায়ণের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা পূজার জন্য বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণকে দাক্ষিণাত্য হইতে আনাইয়া পূজাদি করাইতে থাকেন।

হিন্দুমাত্রেই আসুন আমরাও সেই মহাপুরুষের পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহারাজকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভগবানের নর নারায়ণের উৎপত্তির কথা নবম খণ্ডে আরম্ভ করি।

শঙ্করং শঙ্করাচার্য্য কেশবং বদরায়ণম্।
সূত্রভাষ্যকৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ॥

নবম খণ্ড।

ভগবান্ নর-নারায়ণ।

ধর্ম্মস্য দক্ষ দুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যা,
নারায়ণো নর ঋষি প্রবরঃ প্রশান্তঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণ মুবাচ চ চার কর্ম্ম,
যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্য্য নিষেবিতাংঘ্রিঃ॥

এই হিমালয় ভারতের শিরোমুকুট, এবং সমস্ত পর্ব্বতের পতি বলিয়া তাহার গিরিরাজ নাম ধারণ করিয়া উচ্চ শিরে অনাদিকাল হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহারই উত্তর শিখরের প্রাঙ্গনে বদরীকাশ্রম বা বদরী বন, যাহা অজ্ঞানরূপী চর্ম্ম চক্ষুতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে এইখানে একটী বদরী বৃক্ষ ছিল, যেমন প্রয়াগে অক্ষয় বটের বৃক্ষ আছে, সেরূপ এই বদরীবৃক্ষে শ্রীলক্ষ্মীমাতার নিবাস স্থান, এইজন্য লক্ষ্মীপতি ভগবানের অতি প্রিয়, তাহারই অতি সুখপ্রদ ছায়ায় ভগবান্ ঋষিদেবতার সঙ্গে সদা তপস্যায় রত থাকেন। এই বদরী বৃক্ষ হওয়াতে ইহার নাম বদরী ক্ষেত্র বলা হয়। ভগবান নর-নারায়ণাশ্রম ও এই পবিত্র স্থানকে বলা হয়।

সৃষ্টির আদিতে ভগবান ব্রহ্মার দশজন মানস পুত্র উৎপন্ন করেন, তাঁহাদের নাম—মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ট, দক্ষ এবং নারদ ইহাদের দ্বারাই সমস্ত সৃষ্টি উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত ব্রহ্মার অন্য পুত্রও হইয়াছিল। যেমন দক্ষিণ স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠ ভাগ হইতে অধর্ম্মের, এই অধর্ম্মের বংশ অনেক বড়, তাহার স্ত্রীর নাম মৃষা (মিথ্যা) তাহার দুই পুত্র দম্ভ ও মায়া। ইহাদের পুত্র লোভ এবং নিকৃতি (শঠতা) পুনঃ তাহাদের দুই পুত্র ক্রোধ ও হিংসা। ক্রোধ, হিংসার পুত্র কলিও দুরুক্তি, আবার তাহাদের পুত্র ভয় ও মৃত্যু। ভয়, মৃত্যু হইতে যাতনার (দুঃখ) উৎপত্তি হয়, যাতনা হইতে নরক হইয়াছে। এই সব অধর্ম্মের বংশাবলী। "দুর্জ্জনং প্রথমং বন্দে সর্জ্জনং তদনন্তরম্। এখন ধর্ম্মের বংশাবলী শুনুন—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতির বিবাহ মনু পুত্রী প্রসূতির সঙ্গে হইয়াছিল। প্রসূতির গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির ১৬ কন্যার উৎপত্তি হয়। ১৩ কন্যা ধর্ম্মের সঙ্গে বিবাহ হয়। এক কন্যা অগ্নিকে দেওয়া হয়। এক পিতৃগণকে দেওয়া হয়, অবশিষ্ট এক কন্যা ভগবান শিবকে দিয়াছিলেন, যাহার নাম সতী দেবী। এখন ধর্ম্মের সঙ্গে যাহাদের বিবাহ হয়, তাহাদের নাম—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, ত্রী এবং মূর্ত্তি। ধর্ম্মের যত পত্নি সকলে পুত্রবতী ছিলেন। সকলের এক এক পুত্র রত্ন হইয়াছে। যেমন শ্রদ্ধা হইতে সুখ, তুষ্টি হইতে মোদ, পুষ্টি হইতে অহঙ্কার, ক্রিয়া হইতে যোগ, উন্নাত হইতে দর্প, বুদ্ধি হইতে অর্থ, মেধা হইতে স্মৃতি, তিতিক্ষা

হইতে ক্ষেম, হ্রী (লজ্জা) হইতে প্রশ্রয় (বিনয়) এবং সকলের ছোট মূর্ত্তি দেবী হইতে ভগবান্ নর-নারায়ণের উৎপত্তি হয়। নর-নারায়ণ খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার সেবাদি অতি যত্নের সহিত করিতেন। মাতা একদিন সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রদের বর নিতে বলিলেন। তখন পুত্র বলিল, মাতা, যদি আপনি আমাদের উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এই বর দান করুন, আমাদের মন যেন সদা সর্ব্বদা তপস্যায় রত থাকে। আমাদের সংসার ধর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই। এমন কোন মাতা আপন প্রাণ সম ছেলেদের বনবাসী হইতে বলিবে। কিন্তু মূর্ত্তি মাতা পূর্ব্বে বচন দিয়াছেন, তোমাদের যাহা অভিরুচি বর প্রার্থনা করিয়া নিতে, এখন কি করিয়া মিথ্যা বলেন। অতঃ তিনি আপন চক্ষের তারা, তথা পরম আজ্ঞাকারী অতি প্রিয় দুই পুত্রকে আজ্ঞা দিয়া দিলেন। তখন দুই ভাই মিলিয়া পরম পবিত্র বদরীকাশ্রমে যাইয়া ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

প্রথম নর পরে নারায়ণ।

ভগবান নর-নারায়ণ বহুদিন যাবৎ পবিত্র বদরীকাশ্রমে তপস্যা করিতে থাকেন, পরে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ভক্তবর প্রহ্লাদের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ ঘোর যুদ্ধ করিতে থাকেন, ভক্ত প্রহ্লাদ অনেক

যুদ্ধের পরও যখন নর-নারায়ণের সঙ্গে কিছুতেই যুদ্ধ জয় করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি নৃসিংহ ভগবানের ধ্যান করিলেন। নৃসিংহ ভগবান তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন– হে বৎস, আমি ও এই দুই মূর্ত্তি অভিন্ন। এই সব কথা বড় সুন্দর এবং রোচকভাবে পরে বর্ণিত হইয়াছে। হে বৎস আমিই নর-নারায়ণ রূপে অবতার ধারণ করিয়াছি। অতএব তুমি এই দুই মূর্ত্তিকে পরাজিত করিতে পারিবে না। কারণ ভগবান্ নৃসিংহ প্রহ্লাদকে পূর্ব্বে বর দিয়াছিলেন, তুমি অজেয় ও অমর হইবে। ইহার পর দুই ভাই অবন্তিকায় (উজ্জয়ন) তপস্যা করিতে দেখিয়া ভগবান নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া তাহাদের বর লইবার জন্য বলিলেন। নর বলিলেন আপনি যদি আমাদের উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাদের এই মহান বর।

তখন ভগবান বৈকুণ্ঠপতি শ্রীমন্নারায়ণ বলিলেন—আমি তোমাদের উপরে এত অধিক প্রসন্ন হইয়াছি, আজ হইতে আমার নামের পূর্ব্বে তোমার নাম প্রসিদ্ধ হইবে। সেইজন্য যেইখানে দুই ভাইয়ের নাম নিয়া থাকে, পূবে নর, পরে নারায়ণ, কেহই নারায়ণ নর বলে না। এইটা নারায়ণের বর। পুনঃ নর অন্য এক বর প্রার্থনা করিলেন। যদি আপনি আমার উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমার সারথী হইয়া আমার সঙ্গে থাকেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্নারায়ণ হাঁসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—তুমি ভাবের বশীভূত হইয়া এই প্রকারের বর প্রার্থনা করিতেছ, আচ্ছা এই জন্মে

তোমার সেই আশা পূর্ণ হইবে না। ইহার পরে, অর্থাৎ দ্বাপর যুগে তোমার এই আশা পূর্ণ করিব। সেইজন্য দ্বাপরে নর অর্জ্জুন হইলেন, নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার ধারণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য মহাভারতের যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথের সারথিত্ব করিয়া ভক্তের মহিমা প্রচার করেন এবং নরের বর দানের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে নর-নারায়ণের বর দান।

পদ্মাকরং দিনং করোবিকচী করোতি।
চন্দ্রো বিকাসয়তি কৈরব চক্রবালম্॥
নাভ্যর্থিতো জলধরোঽপি জলং দদাতি।
সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু কৃতাভি যোগা॥

(ভর্তৃহরি)

দীর্ঘজীবি মহামুনি মার্কণ্ডেয়জীর প্রথমে বিধাতায় কেবল মাত্র ১৪ বৎসর পরমায়ু লিখিয়াছিলেন। কিন্তু মহা তপস্বী, মার্কণ্ডেয় মুনি মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবকে আরাধনা করিয়া ১৪ বৎসর হইতে ১৪ কল্প পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয়জী মহারাজ আবার ভগবান নর-নারায়ণেরও প্রধান ভক্ত ছিলেন। তাঁহার আশ্রম গঙ্গোত্রীর রাস্তায় পাওয়া যায়। পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে পরম রমণীয় স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবান নর-নারায়ণের বহুদিন যাবৎ তপস্যা করেন। মহামুনির এইরূপভাবে ঘোর তপস্যা করিতে দেখিয়া ভগবান নর-নারায়ণ তাহার সেই পবিত্র ও পরম রমণীয় আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মহামুনি ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যেন আর ইহ জগতে নাই, একেবারেই নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় বসিয়া আছেন। ভগবান নর-নারায়ণ তখন মুনির মস্তকে হস্ত দিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিবার পর চক্ষু খুলিয়া

দেখিলেন, তাঁহার চীর আরাধ্য দেবতা ভগবান নর-নারায়ণ সাক্ষাৎ রূপে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তৎপর মহর্ষি আপন বিভুরূপী ভগবান নর-নারায়ণের শ্রীপাদ যুগলে ভক্তি নম্রচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন—

সাষ্টাঙ্গ প্রণতি কুর্য্যাদ্ দৃষ্টা নারায়ণং বিভুম্
উত্থায়োত্থায় হর্ষেন দণ্ডবৎ প্রণমেন্মুহুঃ ॥

বিভু নারায়ণকে মুক্তিদাতা সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরকে দর্শন করতঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিবে। সহর্ষে পুনঃ পুনঃ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। কেননা প্রণিপাত উত্তম যজ্ঞ স্বরূপ। বন্দনা পরম পাবন, প্রেমান্বিত নমস্কারই সর্ব্বদা শ্রীহরি প্রীতিপ্রদ। পরে গন্ধ, পুষ্প, পাদ্য, অর্ঘাদি দিয়া মহর্ষি বিধিবৎ অর্চ্চনা করিলেন। ভগবান নর-নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া যে কোন বর নিতে বলিলেন।

মুনি বলিলেন—"হে প্রভু, যদি আপনারা আমার উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার ইচ্ছা আপন নিজ মায়া দর্শন করান। ভগবান নর-নারায়ণ তখন মুনিকে অনন্ত কল্পের অনন্ত সৃষ্টির মায়া দর্শন করাইলেন, জগৎ রচনা তাঁহার এক পলের মধ্যে হইয়া গেল। মুনি যেন অনন্ত আকাশে অনন্ত তারাবলীরূপে পরিভ্রমণ করিতেছেন। মার্কণ্ডেয় মুনি বিভুর এরূপ আশ্চর্য্যজনক সৃষ্টি রচনা দেখিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন। তৎপর ভগবানের স্তুতি আদি করিবার পর নর নারায়ণ মুনিকে অন্য কোন বর নিতে বলিলেন।

মুনি বলিলেন হে প্রভু, অন্য কোন বরের বাসনা আমার নাই। কেবল মাত্র আপনার শ্রীচরণ যুগলে অচল অটল ভক্তি বিশ্বাস হয়। তথাস্তু, বলিয়া ভগবান্ নর-নারায়ণ সেইখান হইতে অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন। আসুন, আমাদের মত হীনবীর্য্য কলির জীবেও এই প্রার্থনা ভগবান নর-নারায়ণাধিপতির শ্রীচরণ কমলে যুগলে অচল অটল ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করি, এবং যেইরূপ মহামুনি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে দর্শন দিয়া ভক্ত বাসনা পূর্ণ করেন। অন্তে তাঁহার সেই রূপের ধ্যান করিতে করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরোহণ করি।

তৌ-শুক্ল কৃষ্ণৌ নব কঞ্জ লোচনৌ,
চতুর্ভুজো রৌখ বল্কলাম্বরৌ।
পবিত্র পাণী উপবীতকং ত্রিবৃৎ
কমণ্ডলুং দণ্ডমৃজং চ বৈনবম্॥
পদ্মাক্ষ মালা মৃত জন্তুমার্জ্জনং।
বেদং চ সাক্ষাৎ তপ এব রূপিণৌ॥
তপৎ তড়িদ্ বর্ণ পিশঙ্গ রোচিষা।
প্রাংশূ দধানৌ বিবুধর্ষ মাচ্চি তৌ॥

নৈমিষারন্যে প্রহ্লাদের সঙ্গে যুদ্ধ

হরিকৃষ্ণং নরং চৈবং তথা নারায়ণং নৃপ।
যোগাভ্যাস রতো নিত্যং হরিঃ কৃষ্ণো বভূবহ॥
নরনারায়নৌ চৈব চ রেতুস্তপউত্তমম্।
প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরীকাশ্রমে॥
(দেবী ভাঃ ৪স্ক ১২।১৩)

পাঠক! পুণ্যভূমি নৈমিষারণ্যের কথা বোধ হয় শুনিয়াছেন, এই ক্ষেত্রকে বড়ই পুনীত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অনেক বড় বড় ঋষি, মুনি ঐ পরম পাবন তীর্থে থাকিয়া তপশ্চর্য্যা করিয়া থাকেন। ভগবান নর-নারায়ণও এই অরণ্যকে মনোনীত করিলেন, তাঁহরা পুণ্যবতী সরস্বতীর তটে এক বৃহৎ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া তপস্যা করিতে থাকেন। ইহারা দুইজনেই ভগবান বিষ্ণুর অংশাবতার, সেইজন্য স্বাভাবিকেই তাঁহারা ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া থাকেন। তপস্যায় বসিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রাদি একস্থানে রাখিয়া এবং আপন লম্বা লম্বা জটা মাথায় বাঁধিয়া ঘোর তপস্যায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

একদিন মহামুনি চ্যবণ মহর্ষি নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় পাতাল লোকের এক মহাকাল নাগ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে পাতাল লোকে ধরিয়া নিয়া গেল, সর্ব্বজ্ঞ ঋষি মনে করিলেন, ইহা তাঁহার কোন পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল বুঝিয়া মনে মনে এই দুর্দ্দান্ত মহাপাপ হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিলেন।

এবং বলিতে লাগিলেন—"য স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যংতরঃ শুচিঃ। ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণে জন্ম জন্মান্তরের পাপও ভস্মীভূত হইয়া যায়। অতঃ ঋষি মনে মনে ভক্তির সহিত হৃদয়ে ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের মহাকাল নাগ তাঁহাকে সেইখানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, এবং তখনই সমস্ত কাল নাগের বিষও নষ্ট হইয়া গেল।

মহর্ষি চ্যবণ পাতাল লোকে বড় বড় রাজ মহল অট্টালিকা তথা বাগান ও অনেক আমোদ প্রমোদের বস্তু দেখিয়া, তিনি মনের আনন্দে মত্ত হইয়া এদিক সেদিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে কবিতে একদিন হঠাৎ সুতল লোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে ভক্তবর প্রহ্লাদ আপন পৌত্র মহাদানী রাজা বলির সঙ্গে বসিয়া সানন্দে বিরাজমান ছিলেন। প্রহ্লাদজী মহারাজ একজন ঋষীকে এরূপভাবে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই ঋষি কেন বৃথা অকারণে এদিক সেদিক করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ইহার কারণ কি? ইনি বোধ হয় আমাদের চির শত্রু ইন্দ্রেব কোন গুপ্তচর হইবে। আমাদের কোন গুপ্ত খবর লইবার জন্য আসিয়াছে। আচ্ছা, বিষয়টা কি জিজ্ঞাসা করা যাক্। তাহার এইখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি, ভক্তাগ্রগণ্য মহাত্মা প্রহ্লাদ মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আপনি এইখানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? এবং আপনার এইখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি? আপনাকে কি দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের কোন গুপ্ত সমাচার নিতে পাঠাইয়াছেন? যাহা সত্য

কথা তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুণ ; কোন কথা গুপ্ত রাখিবেন না।

মহর্ষি বলিলেন—রাজন ! আমার সঙ্গে ইন্দ্রের কি সম্পর্ক ? এবং আমি ইন্দ্রের দুত কেন হইতে যাইব ? আপনি ভগবৎ ভক্তের মধ্যে অগ্রগণ্য, আপনার কোন শত্রু কোন্ মিত্র বাসুদেব সর্ব্বমিতি দেখিয়া থাকেন। আপনার কেহ কোন ভেদ লইয়া কে কি করিতে পারে ? আর আমার কোন প্রকারের ভোগ্য বস্তুরও পিপাসা নাই। আমার নিকট যেমনি আপনি—তেমনি ইন্দ্রদেব। আমার কেহ শত্রু মিত্র নাই। আমি সদা সর্ব্বদা তপস্যায় রত থাকি। আমার নাম চ্যবণ ঋষি। তীর্থ যাত্রা করিতে করিতে পরম পাবন মহা নদী নর্ম্মদায় আসিয়াছিলাম। নর্ম্মদা দেবীকে দর্শনে মহাপুণ্য, গঙ্গায় স্নানে পুণ্য। ঐ নর্ম্মদায় স্নান করিবার সময় এক নাগ আমাকে ধরিয়া এইখানে লইয়া আসে। ভগবন্নামের প্রভাপে সেই কালনাগ আমাকে ছাড়িয়া দেওয়াতে আমি এখন এদিক সেদিক ভ্রমণ করিয়া দেখিতেছি। যাহা সত্য কথা আমি সব আপনাকে বলিলাম। বর্ত্তমানে আপনার অন্য কোন জিজ্ঞাস্য থাকিলে বলিতে পারেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদজী মহারাজ মহর্ষি কথায় বিশ্বাস করিয়া খুবই আদর যত্নের সহিত ঘরে নিয়া গেলেন, এবং বিবিধ প্রকারে সেবা পূজাদি করিয়া, তথা নানা কথা বার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহর্ষি ! আপনি কোন কোন তীর্থকে পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন।

মহর্ষি বলিলেন—যদি মনে শ্রদ্ধা থাকে, বিশ্বাস থাকে, ধর্ম্মে রুচি হয়, বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য হয়, তবে সব তীর্থই শ্রেষ্ঠ। যেই লোক শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন বিষয়ী ও ভোগাসক্ত তাহাদের জন্য কোন তীর্থে পূর্ণ ফলোদয় হয় না। কেবল বৃথা ভ্রমণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানই সার হয়। নিষ্কামভাবে তীর্থ ভ্রমণে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। যদি তীর্থে সামান্য পুণ্য ও শ্রদ্ধা, ভক্তির সহিত করে, তাহার ফল অক্ষয় হয়, তাহা কিছুতেই নষ্ট হয় না। অতঃ প্রথমে মনের শুদ্ধি সৎ ভাবনা, সৎ চিন্তা ও সাধু সেবাদি করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেই লোক তীর্থে থাকিয়াও শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন অন্যের ধন হরণ করিবার আশায় তীর্থে বাস করে (বর্ত্তমান যুগেই অধিক) তাহাদের কদাপি শত জন্মেও পাপ নষ্ট হয় না। কারণ তীর্থের পাপের ক্ষয় নাই।

প্রহ্লাদজী জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে প্রথমে মন শুদ্ধি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, মন শুদ্ধি করিতে হইলে নিষ্কাম কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

মহর্ষি বলিলেন—শরীর পাপ পুণ্য রহিত। সবের কারণ একমাত্র মন, যাবতীয় কর্ম্ম মনের প্রেরণাতে হয়, শাস্ত্রে আছে—'মন এব মনুষ্যাণাং কারণ বন্ধন মোক্ষয়োঃ—শুভ কর্ম্মের ফল শুভ হয়, তীর্থযাত্রা মহা পুণ্যদায়ক, তীর্থক্ষেত্র দর্শন, স্নান, দান, পূজা, পাঠাদি সবই পুণ্য কর্ম্ম, এই ভারত ভূমিতে বহু তীর্থ একটীর থেকে একটী বড বড তীর্থ বিদ্যমান আছে।

প্রহ্লাদ বলিলেন—ভগবান্! কয়েকটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থের নাম বর্ণনা করুন।

মহর্ষি বলিলেন—পূর্ব্বে বলিয়াছি তীর্থের কোন সংখ্যাই নাই, তাহার মধ্যে যেমন নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, গয়া কাশী, প্রয়াগরাজ, পুষ্কররাজ, অযোধ্যা, মাল্লা, কাঞ্চি আদি সবই শ্রেষ্ঠ পুন্যবতী তীর্থ।

ভক্ত প্রহ্লাদজী বলিলেন—তবে প্রথমে নৈমিষারণ্যে তীর্থ যাত্রা করা যাক্। দেখি সেইখানের পরিস্থিতি কি প্রকারের। এই কথা বলিয়া তিনি অসুরদের তৈয়ার হইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন, আজ্ঞা পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আয়োজন হইয়া গেল, প্রহ্লাদজী আপন দলবল সহিত নৈমিষারণ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে যাইয়া তীর্থ স্নান, দেবতা দর্শন, দান কর্ম্মাদি সমাপন করিলেন। এবং সৎসঙ্গ করিবার আশায় কিছুদিন নিবাস করিলেন।

একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি নর-নারায়ণের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে যাইয়া দেখিলেন বড় বড় জটাধারী দুইজন তপস্বী চক্ষু মুদিয়া বসিয়াছেন। এবং সম্মুখে ধনুর্বাণ রহিয়াছে। প্রহ্লাদজী ইহাদের এই প্রকারের ভাব দেখিয়া খুব হাসিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, এই তপস্বী কেমন দেখ। ভেক্ তপস্বী সাজিয়াছেন। আর সম্মুখে ধনুর্বাণ রাখিয়াছে। তপস্বী লোক সর্ব্বদা অহিংসক হইয়া থাকে। তাহারা সব প্রাণীকে আপন প্রাণ সম দেখেন,

সর্ব্বভূতে বাসুদেব তাহাদেরই লক্ষ্য। তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন কি? মনে হয় ইহারা এক মহান্ ঠক্, ইহারা লোক ঠকাইবার ইচ্ছায় তপস্বীর ভেক ধারণ করিয়াছে।

এই দুই ঋষি ইহার কথায় কোন কর্ণপাত না করিয়া আপন তপস্যায় মন লাগাইয়া রহিলেন। তখন প্রহ্লাদজী তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ওহে! ভণ্ড তপস্বীগণ, তোমরা হা কি রকমের ভঙ্গ রচনা করিয়া বসিয়া আছ, এবং তপস্যার বিরোধী অস্ত্র শস্ত্র বা কেন রাখিয়াছ?

ভগবান্ নারায়ণ চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু নর বলিয়া বলিয়া উঠিলেন—আমরা যাহা কিছু করি না কেন, তাহাতে তোমাদের জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? তোমার কর্ম্ম তুমি কর, এবং শাঘ্রই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। আমরা কাহারও নিকট কোন বস্তুর জন্য যাচ্ঞা করি না।

প্রহ্লাদজী অতি ক্রোধের সহিত বলিলেন—কেন বৃথা বাক্য ব্যয় করিতেছিস্, মনুষ্যকে ঠকাইবার জন্য বেশ ভণ্ডামীর ভেক্ ধারণ করিয়া বসিয়াছিস্। শাঘ্রই বল তোরা কে, নতুবা বৃথা প্রাণ হারাইবি।

নর বলিলেন—অরে দুষ্ট! তুই এইখান হইতে যাইবি কিনা, না বৃথা ঝগড়া বিবাদ করিবি। আমরা যে কেহই হই না কেন তাহাতে তোর দরকার কি? তুই বল্ আগে পূর্ব্বে কে হইস্।

প্রহ্লাদজী খুবই দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—আমি রাজা

তোদের মত দুষ্ট কাপালিককে এই পরম পূণ্য ক্ষেত্র হইতে দূর করিয়া তবে যাইব। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন;

নরেরও ক্রোধ আসিয়া গেল, তিনিও ধনুর্ব্বাণ হাতে পাইয়া তীর চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। দুইজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, এরূপ ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে নর একটু শ্রান্ত হইলে, ভগবান্ নারায়ণ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। এরূপভাবে ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গে শতবর্ষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। ভক্তবর প্রহ্লাদজীকে নৃসিংহ ভগবানের বরদান ছিল তোমাকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না, তুমি অজেয় অমর হইবে। যখন শতবর্ষ পর্য্যন্ত এই দুই ভাইকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি ভগবান্ নৃসিংহের ধ্যান করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তখনই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ রূপে প্রকাশিত হইয়া প্রহ্লাদকে বলিলেন—"হে বৎস! এই দুই ভাই আমারই স্বরূপ, আমাতে এবং এই দুইয়ে কোন প্রকারের প্রভেদ নাই। ইহারা আমারই অংশাবতার। তুমি ইহাদের কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ইহাদের শ্রীচরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাও। আমি ও এই দুই মূর্ত্তি অভিন্ন।

ভক্তবর প্রহ্লাদজী মহারাজের তখন চক্ষু খুলিল, তখনই ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া দুই ভ্রাতার শ্রীচরণযুগলে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। এবং আপন অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করিয়া আপন রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। ভগবান্ নর-নারায়ণ ও এই স্থান নিরাপদ নয় মনে করিয়া, তখনই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনী (অবন্তিকায়) প্রস্থান করিলেন। শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে—সুরাজ্যে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে, ইত্যাদি—

দ্বিতীয় অধ্যায়

দশম খণ্ড।

শ্রীবদরীনাথের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য তীর্থ।

সা গন্ধমাদন লতা কুসুমৌঘলক্ষ্মীর
সা দিব্য তুঙ্গ হিমবপ্রগশ্রেঙ্গপংক্তি ॥
গঙ্গা চ পুণ্যা সপিলা কিমুয়ন্নরভ্যং ॥
ত্বমাগতো হস্মি শরণ বদরীবনেঽস্মিন্ ॥

হিমালয়ের শোভা এবং সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা এক অসাধ্য ব্যাপার, যদি কোন ভাগ্যবান লোক হয়, তবে তাহারা শ্রীবদরীনাথ দর্শন করিয়া থাকেন। কত প্রকারের পর্ব্বতশ্রেণী উচ্চ উচ্চ শির করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন মনে হয় ইহারা

কত কাল পর্য্যন্ত কাহার ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। আবার কত রম্য, পবিত্র ভূমি, কত আনন্দ দায়ক রমণীয় পর্ব্বত শ্রেণী, সেই দিকে দৃষ্টি পড়ে সবই সুন্দর, সবই শান্তিময়ী, সবই সুখময়ী। এইখানে কল কল নাদিনী ভগবতী "মা, অলকানন্দা চপলাবালার মত কেমন কমনীয় ক্রীড়া করিতেছেন। এইখানের প্রত্যেক পত্র পুষ্পে কেমন দিব্য গন্ধ, এই খানের জল বায়ু কেমন মধুময়ী ও শান্তিময়ী এইসব প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে বুঝা যায় না। আমি যখন এইখানের জঙ্গলী নানা রকমের ফুল, ফলের ঘ্রাণ লইতাম, ও খাইতাম, তখন সত্যই যেন স্বর্গে আসিয়া ইন্দ্রের নন্দন কাননে ভ্রমণ করিতেছি মনে হইত।

বদ্রীনারায়ণে অনেক গুপ্ত ও প্রকাশ্য তীর্থবাস আছে। তাহাতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থের বর্ণন আমি এইখানে সংক্ষেপে করিব। ভগবতী গঙ্গার জল এত অধিক শীতল অঙ্গুলী দিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন খসিয়া পড়িয়া যায় মনে হয়। ডুব দিলে কি হয় তাহা জানি না, কোথায় মস্তক এবং কোথায় চরণ। একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন "মাতঃ গঙ্গে! তোমার দর্শন মাত্রেই মুক্তি হয়, তবে স্নানে না জানি কি ফল। "হে মাতঃ গঙ্গে যখন তোমার দর্শন মাত্রেই মুক্তি হয়, তবে স্নান করিলে কি গতি লাভ হইবে, তৎজন্য আমি স্নান করিব না। কেন না মুক্তি আগে আমার অন্য কোন কামনা নাই। সত্য সত্যই বদ্রীনাথে অলকানন্দা গঙ্গার দৃশ্য এক দর্শনের বস্তু, স্নান

ক্বচিৎ কেহ করিয়া থাকে, আমি অনেকদিন থাকা সত্ত্বেও বোধ হয় ৩।৪ দিন করিয়াছি কি না মনে নাই। যাত্রীরা প্রেক্ষণ মাত্র করে ?

আমি কয়েকবার গঙ্গার জল কমণ্ডলু ভরিয়া শৌচ কর্ম্ম করিতে গিয়া দেখি তাহা বরফে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ভগবান্ যখন উদ্ধবকে বদরীকাশ্রমে পাঠান্ তখন যাইবার সময়ে সাবধানের সহিত স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিলেন, দেখনা উদ্ধব ! তুমি বদরীকাশ্রমে চলিয়া যাও, কিন্তু সাবধান, দেখিবে ঐখানে ভগবতী অলকানন্দা প্রবাহিত হইতেছে, যাহা দর্শন মাত্রেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন।

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্।
তত্র মত পদাম্ভোজতোয়ে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ॥
ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধুতা শেষ কল্মষঃ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিঃস্পৃহঃ॥

অর্থাৎ—ভগবান বলিলেন—“হে উদ্ধব ! তুমি আমার আজ্ঞায় আমার পরম পবিত্র বদরীকাশ্রমে চলিয়া যাও, সেইখানে আমার চরণ কমল হইতে পরম পবিত্র পতিত পাবণা গঙ্গার জলে স্নান মার্জ্জন তথা পান করিলে তুমিও পবিত্র হইয়া যাইবে। ভগবতী অলকানন্দার দর্শন মাত্রেই কলির জীবের পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে। সেইখানে তুমি বল্কল বস্ত্রাদি ধারণ করিবে এবং কন্দ মূলাদি আহার করিয়া নিঃস্পৃহ হইয়া আনন্দের সহিত তপস্যা করিবে। অর্থাৎ—অলকানন্দায় অধিক স্নান করিও না

কেননা "ঈক্ষয়ালনন্দায়" বলিয়া ভগবান পরিষ্কার করিয়া বলিযাছেন। "হে উদ্ধব! নিত্য প্রাতঃ স্নান কখনও করিবেনা। স্নান করিবার জন্য বড সুন্দর অগ্নিতীর্থ আছে। উহাতে ইচ্ছা করিলে তুমি স্নান করিতে পার। পুরাণের মধ্যে বর্ণন করিয়াছে, অগ্নিদেব এইখানে তপস্যা করিতে আসিয়াছিলেন। অগ্নিদেব কেন এইখানে কেন এই হিমের মধ্যে তপস্যা করিতে আসিয়াছিলেন, অগ্নি পূরাণে বিস্তার পূর্ব্বক তাহা বর্ণন করিয়াছে। এখন আমি শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে প্রবাহিত কল্‌কল্‌নাদিনী পাপমোচনী ত্রিপথগামিনী শ্রীগঙ্গা-মায়ের চরণকমলে করযোড়ে প্রার্থনা করিয়া এই প্রকরণ সমাপ্ত করিতেছি।

বিষ্ণু পাদাব্জসম্ভূতে! গঙ্গে ত্রিপথগামিনী।

অগ্নিতীর্থ

বহ্নিতীর্থ পরিভ্রাজদ ভগবচ্চরণান্তিকে।
কেদারাখ্যং মহালিঙ্গং দৃষ্টানো জন্মভাগ্‌ভবেৎ॥

আদি কেদারনাথ দর্শন করিযা ৩।৪ সিড়ির নিম্নে নামিয়া আসিলে দেখিতে পাইবেন, যাত্রীদের কোলাহলপূর্ণ এক স্থান ইহাই তপ্তজলপূর্ণ অগ্নিতীর্থ বা তপ্তকুণ্ড বলে। এই কুণ্ড পরম পবিত্র কলি কলুষ নাশিনী পাবন তীর্থ, পুরাণে ইহার মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন—যেমন সোণা কতই ময়লাযুক্ত হউক না কেন,

অগ্নিতে পড়িলে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। তদ্রূপ যদি কোন মহান্ পাপাও হয়, তবে এই পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে স্নান করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া পরম পবিত্র হইয়া যায়, অগ্নিদেবের কেন এই হিমরাজ্যে কত নদ নদী পর্ব্বত অতিক্রমণ করিয়া আসিবার কি আবশ্যক ছিল, তাহার বিষয়ে পুরাণে বড় সুন্দর সুললিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

ভৃগু মহর্ষির পত্নীর উপরে কোন অসুর বড়ই প্রেমাসক্ত হইয়াছিল, কোন সময়ে ভৃগুপত্নীর সঙ্গে সেই অসুরের বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল। সেই অবধি অসুর সর্ব্বদা ভৃগুপত্নীকে হরণ করিবার জন্য সুযোগ সুবিধা খুঁজিতেছিল, একদিন ভৃগুমুনি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রের অগ্নিদেবই ছিল। অসুর মনে করিল এই উপযুক্ত সময়, জানিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল, তখন অগ্নিদেব খুব প্রবল জোরে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল, অসুর অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে এই স্ত্রীর বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল তাহা সত্য কি না? অগ্নিদেব সরলভাবে উত্তর দিলেন, হাঁ হইয়াছিল বটে, এইবার আর যায় কোথায়, অগ্নিদেবকে সাক্ষী করিয়া গর্ভবতী ভৃগুপত্নীকে উঠাইয়া নিয়া চলিয়া গেল, মুনিপত্নী দুঃখে ও ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন মুনিপত্নির ভয়ে ও দুঃখে রাস্তায় প্রসব হইয়া গেল, এবং চ্যবণ মহর্ষির জন্ম হইয়া গেল। মহর্ষির দৃষ্টি পড়িতে ব্রহ্মতেজে সেই দুষ্ট অসুর ভস্ম হইয়া গেল, এইদিকে কিছুক্ষণ পরে ভৃগুমুনি আশ্রমে আসিয়া আপন

প্রাণসম প্রিয় পত্নীকে দেখিতে না পাইয়া অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, " হে অগ্নিদেব আমার পত্নী কোথায় ? ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাতকারী মহাক্রোধী ভৃগুমুনির ভয়ে অগ্নি উত্তর দিলেন, মহারাজ জী এক অসুর আসিয়াছিল, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যাহা সত্য কথা ছিল তাহা বলিয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া ঋষির ক্রোধের সীমা রহিল না। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্নিদেবকে বলিলেন, তুমি কেন সেই প্রাচীন কথা বলিলে, আমার অবর্ত্তমানে কেন এই সব গোলমাল হইতে দিলে ? আমি তোমাকে শাপ দিতেছি তুমি সর্ব্বভক্ষ্য হইয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া অগ্নির প্রাণ উড়িয়া গেল। এই সব ঋষিদের হঠাৎ ক্রোধ আবার হঠাৎ শান্তি, গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছিলেন রাজা, যোগী, অগ্নি, জল, ইনকি উল্‌টীরিত। তুলসী ইনসে ডরতে রহ থোরা রাম পিরিতা) অগ্নিদেব ভয়ে নত মস্তক হইয়া চুপ হইয়া রহিলেন, এক সময়ে তীর্থের রাজা প্রয়াগরাজে সমস্ত ঋষিমুনিদের এক মহান্ সম্মেলন হইয়াছিল। আজকাল সেইখানে দারাগঞ্জ বলিয়া থাকে, ঐখানে এক দশাশ্বমেধ ঘাট ও দশাশ্বরের একশিব মন্দির বিদ্যমান আছে, সেখানে সমস্ত ঋষি মুনি একত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সম্মেলন সভাপতি ছিলেন 'ভগবান নারায়ণের অবতার স্বয়ং ব্যাসদেব, অগ্নিদেব সেইখানে আসিয়া সমস্ত ঋষি মুনিদের নিকট প্রার্থনা করিল, "হে সমস্ত ঋষি-দেবতা ভৃগু মহর্ষি আমার সর্ব্বভক্ষ্য হইতে শাপ দিয়াছেন,

এবং যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছিল যথাযথ তাহা বর্ণন করিল এবং ইহার কোন প্রতিকার করিয়া দিতে নিবেদন করিল। ভগবান ব্যাসদেব তখন উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে অন্যত্র ছিলেন, পরে তিনি আসিয়া অগ্নিদেবের সব কথা শুনিয়া ভগবান ব্যাসদেব তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই, তুমি এক কর্ম্ম কর, বর্ত্তমান আমি—বদ্রীনাথের থাকি ; বদরী বিশালের প্রভাব আমি ভাল প্রকারে জানি। অতএব তুমি শীঘ্রই বদ্রীকাশ্রমে চলিয়া যাও ; সেইখানে তোমায় সেই শাপ যাহা ভৃগু ঋষি দিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। যেরূপ তুলার গুদামে সামান্য একটু অগ্নি দিলেও তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ যে কোন মনুষ্যেরও সেইভাবে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। "হে অগ্নিদেব ! এই বদ্রীধামের মাহাত্ম্য তোমায় কি বলিব।" তখন অগ্নিদেব ভগবান্ ব্যাসদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সোজা বদ্রীনাথে যাইয়া ঘোর তপস্যা করিতে থাকেন, তপস্যায় শ্রীমন্নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া অগিদেবকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "হে অগিদেব, তোমার এইরূপ কঠোর তপস্যা দেখিয়া আমি অতি প্রসন্ন হইলাম, অতএব তোমার যাহা অভিরুচি বর প্রার্থনা করিতে পার।

তখন অগ্নিদেব ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া ভক্তিতে গদ্ গদ্ ভাবে স্তুতি আদি করিবার পর হাত জোড় করিয়া বিনম্র ভাবে বলিলেন, "হে প্রভু, "হে জগদীশ্বর

যদি আপনি আমার উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর দিন্ ভৃগুঋষি আমাকে সর্ব্বভক্ষী হইতে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা মোচন হইয়া যাক্ এবং আমি পূর্ব্ববৎ পরম পবিত্র হইয়া যাই।

ভগবান্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওহে অগ্নিদেব, তুমি ইহা কি বর প্রার্থনা করিতেছ? অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, তোমার যেই দোষের জন্য ভৃগুঋষি শাপ দিয়াছেন, তাহা এই পবিত্র ক্ষেত্র দর্শন মাত্রেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তুমি এখন হইতে এই পবিত্র ক্ষেত্রে থাকিয়া কলির মহাপাপীকে উদ্ধার কর।

তখন হইতে অগ্নি একরূপে এইখানে জলধারা রূপে প্রবাহিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে পাপ নষ্ট করেন কি না অগ্নিদেব জানেন অথবা ভগবান্ জানেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি ইহা দেখিয়াছি, যেই কোন শ্রান্তলোক হউক্ না কেন, তপ্ত কুণ্ডে স্নান করিলে শরীর একেবারেই হাল্‌কা হইয়া যায়, শরীর হইতে যেন এক মহান্ ভারী বোঝা নামাইয়া রাখিলাম মনে হইবে। এই হিমের উপরে গরম জলে স্নান বড়ই আরাম প্রদ মনে হয়, "অমৃতং শিশিরে বহ্নিঃ—গরম জলের যেই স্রোত খুব বড় ত্রিধারা হইয়া অতি জোরে বাহির হইতেছে। একধারা অলকা-নন্দায় মিলিত হইতেছে, অন্যধারা ছোট ছোট হইয়া দুই ধারে কুণ্ডে ভরিয়া তাহাও অলকানন্দায় পড়িতেছে, এই ছোট ধারা যখন ইচ্ছা বন্ধ করা যায়। তপ্তকুণ্ডে আসিয়া কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া স্নানের যোগ্য হইয়া যায়, প্রথমে জলে নামিতে

গরম বোধ হয়, যখন কুণ্ডে ডুব দিবে, তখন ইচ্ছা হয় ঘন্টা পর্য্যন্ত স্নান করি. বদ্রীনাথে অত্যাধিক হিম হওয়াতে তপ্ত কুণ্ডের জল বড়ই সুখপ্রদ প্রতীত হয়. এই খানের জীবন এক অমৃতময় বলিলে হয়, কেহই এই জল পান করে না। যাহাদের পিত্ত প্রধান প্রকৃতি তাহাদের এই জলের গন্ধে মাথা ঘুরাইতে আরম্ভ করে। কারণ ইহাতে কিছু কিছু গন্ধকের অংশ আছে। অনেকের মাথাধরা রোগও হইয়া যায়। ইহাদের জন্য এই জল একেবারেই উপযুক্ত নয়। তপ্তকুণ্ডের বিষয় পুরাণে সুন্দর মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন। এইখানে দান করিলে অক্ষয় পূণ্য সঞ্চয় হয়, পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পনাদি যেমন গয়ায় শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া থাকে পিতৃলোককে প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার করে, তদ্রূপ এই অগ্নিকুণ্ডেও যাত্রীরা পিণ্ড দান আদি করিয়া থাকেন।

কিং তেষাং বহুভির্যজ্ঞৈঃ কিং দানৈর্নিয়মৈর্যমৈঃ।
যেষাং পাঠতীর্থে হস্মিন্ স্নানদশদিনে ভবেৎ॥

একাদশ খণ্ড।

পঞ্চম শীলা।

নারদী নারসিংহী চ বারাহো গারুড়ী তথা।
মার্কণ্ডেতি বিখ্যাতাr শিলা সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাঃ॥

(স্কন্দ পুঃ)

তপ্তকুণ্ডের নিকট পরম পাবন পৌরাণিক পঞ্চশিলা বিদ্যমান আছে। যেমন নারদ শিলা, নৃসিংহ শিলা, বারাহী শীলা, গরুড় শিলা, এবং মার্কণ্ডেয়া শিলা, ইহাকে পিণ্ড শিলা বলে, ইহার দর্শনে পূজনে বড় মাহাত্ম্য বলিয়াছেন। প্রথম গরুড় শিলা আদি কেদারনাথের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী অলকানন্দার তীরে যেই এক বৃহৎ শিলা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার নাম গরুড় শিলা বলে। অর্থাৎ আজ কাল প্রায় সময়ে নারায়নের সেবক তথায় বসিয়া বসিয়া কেশরচন্দন ঘসিয়া থাকেন। স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ করিয়াছেন—

বধ্যাঃ দক্ষিণে ভাগে গন্ধ মাদন শৃঙ্গকে।
গরুড় স্তপ তাস্তেপে হরিবাহন কাম্যয়া॥

অর্থাৎ বদরীকাশ্রমের দক্ষিণ দিকের ভাগ গন্ধমাদন পর্ব্বত বলিয়া থাকে, তাহার উপরে বিনতা মাতার দাসত্বের মোচন করিবার জন্য ও ভগবানের বাহন হইবার জন্য অনন্তকাল পর্য্যন্ত গরুড় মহারাজ তপস্যা কবিয়াছিলেন, তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট

হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাঃমত বর দিয়া ভগবান অন্তর্ধান হইলেন। এই শিলার উপরে বসিয়া গরুড় শ্রীকমলাপতির আরাধনা করিয়া অনন্ত কালের জন্য ভগবানের বাহন হইয়াছেন, আসুন আমার সঙ্গে আমরাও সেই পরম পবিত্র গরুড় শিলায় বসিয়া সেই বদরীকেশ্বরের অনন্তকাল ধরিয়া দর্শন করি।

বদরীকাশ্রমে যাইবার সময় পীপলচট্টি নামক এক সুন্দর পর্ব্বতের উপরে এক ছোট বাজার, তাহারই চারি মাইল উপরে গরুড়, গঙ্গা উৎপত্তির স্থানে একটী মন্দির আছে এমন সুন্দর মুর্ত্তি দেখিলে নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, একটু দূরে পাতাল গঙ্গা, তাহার একটু দূরে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের যোশীমঠ। গরুড় গঙ্গা হইতে বদরীনাথ ২৪।২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। গরুড় গঙ্গা হইতে বদরীনাথ সোজা উত্তরে। গরুড় গঙ্গা ভগবতী অলকানন্দায় যাইয়া মিলিত হইয়াছে। ইহার নাম গরুড়প্রয়াগও বলিয়া থাকে। এই স্থান হইতে গরুড়গঙ্গার উৎপত্তি প্রায় ৫।৬ মাইল দূরে। সেইখান হইতে গরুড়গঙ্গা উৎপত্তি হয় ; তাহা গন্ধমাদনের এক পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে। এইখানে হিমালয়ের প্রায় ৬।৭ মাইল লম্বা সমতলভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে এই মাঠে তুষার আচ্ছাদিত হইয়া এক বিচিত্র রূপ ধারণ করে, দূর হইতে যেন রৌপ্যময় একটা বিস্তৃতি প্রকাণ্ড ভূমি কিন্তু গরমের দিনে যখন বরফ গলিয়া যায়, তখন পাহাড়ী লোকে এই মাঠে ছাগল

ভেড়াদি চরাইয়া থাকে। স্থান এত অধিক মনোরম, ফিরিবার ইচ্ছা হয় না। আবার গরুড় গঙ্গার জল এত সুস্বাদ আমার জীবনে এই প্রকারের মিষ্ট জল পান করি নাই। জলের এমন গুণ দেখিলাম, পান করিবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়। আর ক্ষুধায় অস্থির করিয়া তুলে, একদিনের মধ্যে আমি /১৸৹ আটা আহার করিয়াও রাত্রে ক্ষুধা অনুভব করিয়াছিলাম।

নারদ শিলা

নারদো ভগবাংস্তেপে তপঃ পরম দারুণম্।
দর্শনাথং মহাবিষ্ণোঃ শিলায়াং বায়ু ভোজনঃ॥

ভগবান্ নারদ মুনি জগৎপতি মহাবিষ্ণুর দর্শনের নিমিত্ত কেবলমাত্র বায়ু আহার করিযা যেই পবিত্র শিলায় বসিয়া কঠোর ও দারুণ তপ করিয়াছিলেন, তাহার নাম নারদ শিলা বলিরা প্রসিদ্ধ হয়। তপ্তকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী অলকানন্দায় যে খুব ভারি এক শিলা আছে, ইহাকে নারদ শীলা বলিয়া থাকে। তাহার নিম্নে গঙ্গার মধ্যে নারদকুণ্ড, নারদকুণ্ড হইয়া অলকানন্দা অতি বেগবতী ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে কোন লোক যাইতে পারে না। যখন আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অলকানন্দার জল একটু কমিয়া যায়, তখন লোক উহাতে প্রবেশ করে এবং স্নান করিয়া আনন্দ অনুভব করে। আমি নিজেই সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া একবার স্নান করিয়াছিলাম।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার দর্শন করাও দুর্লভ হইয়া থাকে। সেই সময় এত অধিক বরফ থাকে তাহা বলা যায় না, এই নারদ শিলায় বসিয়া নারদ মুনি ৬০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা করিয়া নারায়ণের দর্শনলাভ করেন। ভগবান্ নারায়ণ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া নারদ মুণিকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। নারদ মুনি ভগবানের দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? এবং কিজন্য এই হিমালয়ের পর্ব্বতে আগমন করিয়াছেন? তখন ভগবান প্রসন্ন হইয়া আপন চতুর্ভূজরূপে দর্শন দিয়া বলিলেন, "হে নারদ, আমি তোমার এই কঠোর তপস্যায় অতি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তুমি যেই কোন বর প্রার্থনা করিতে পার। দেবর্ষি নারদ অতি দীনভাবে ভগবানের নিকট তিন বর প্রার্থনা করিলেন, (১) আপনার শ্রীচরণ কমলে আমার অচলা শ্রদ্ধা, ভক্তি লাভ হয় এবং ত্রিভুবনের মধ্যে আপনার পবিত্র নাম বীণার তানে গান করিতে করিতে প্রচার করি। (২) আমার শীলার নিকট আপনার সদা স্থিতি থাকে। (৩) যেই কোন লোক আমার এই পবিত্র তীর্থশীলা দর্শন করে, কুণ্ডে স্নান, পূজন করে, এবং এই শীলায় বসিয়া তপস্যা করে, তাহার যেই কোন প্রকারের পাপ হউক না কেন, সব নষ্ট হইয়া অন্তিমে তোমার পরম আনন্দের বৈকুণ্ঠধামে নিবাস হয়, ভগবান্ "তথাস্তু" বলিয়া তিন বর দিয়া অন্তর্ধান হইলেন, তখন হইতে এই শীলার নাম নারদ শীলা নামে পরিচিত হইল, এবং এই কুণ্ডের নাম নারদ

কুণ্ড হইল। ভগবানের বর্ত্তমান সেই মুর্ত্তি তাহা এই নারদ কুণ্ড হইতে বাহির করিয়া পূজ্য শঙ্করাবতার শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যই স্থাপনা করিয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় শীলা।

কিমিতি ক্লিশ্যতে সাধো তীর্থাটন পরিশ্রমৈঃ।
বদর্য্যাখ্যং মহাক্ষেত্রং সান্নিধ্যং নিত্যতোহহরে॥

অর্থাৎ—"হে সাধো! তুমি এদিক সেদিক করিয়া কেবল তীর্থযাত্রার নিমিত্ত কেন বৃথা পরিশ্রম করিয়া দুঃখী হইতেছ? "ওহে, তুমি কেন পরম পবিত্র বদরীকাশ্রমে যাইতেছ না, যেইখানে ভগবান্ বদরীশ্বর সান্নিধ্যভাবে বিরাজ করিতেছেন।

এই মার্কণ্ডেয় শীলা নারদ কুণ্ডের নিকট অলকানন্দার ধারায় এক বৃহৎ পাথর পড়িয়াছে ইহাকে মার্কণ্ডেয় শিলা বলিয়া থাকে, ইনি মহামৃত্যুঞ্জয়কে তপস্যাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ১৪ বৎসর হইতে ১৪ কল্প পর্য্যন্ত পরমায়ু করিয়া নিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি একপ্রকার অমর, ইঁহার নামে ভিন্ন পুরাণ আছে। ইনি মহাপ্রলয়েও জীবিত ছিলেন, ইনি নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান অমর কণ্টক নামক তীর্থেও আশ্রম করিয়া অনেক দিন তপস্যা করিয়াছিলেন।

নরসিংহ শিলা।

নৃসিংহোঽপি শিলারূপী জলক্রীড়াপরোঽভবেৎ॥

(স্কন্দ পুঃ)

অলকানন্দার জলের মধ্যে নারদ কুণ্ডের জলের কিছু উপরে

সিংহাকৃতি এক শিলা দৃষ্টিগোচর হইবে, ইহারই নাম নরসিংহ শিলা বলিয়া থাকে। পুরাণে ইহার মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে। যদি কোন লোক এই পবিত্র শিলার দর্শন ও পূজন করে, তাহা হইলে সেই সাক্ষাৎ নরসিংহের দর্শনের ফল লাভ করিবে।

বারাহী শিলা।

রসাতলাৎ সমুদ্ধৃত্তো মহীদৈবতবৈরিণম্।
হিরণ্যাক্ষং রণে হত্বা বদরী সমুপ্যাগত ॥

(স্কন্দ পুঃ)

ভগবান্ বরাহঅবতারে দেবতাদের মহান্ শত্রু হিরণ্যাক্ষ অসুরকে মারিয়া রসাতল হইতে পৃথিবীকে উঠাইয়া দিবার পরে তিনি বদরীবনে চলিয়া যান।

ভগবতী অলকানন্দার জলের উপরে এক উচ্চ শিলা দেখা যায়, তাহাকেই বরাহশিলা বলিয়া থাকে। যদি কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দেখা হয়, তবে দূর হইতে ঠিক্ শূকরের মতন মনে হয়, এই শিলার নামই বরাহ শিলা। ভগবান যখন হিরণ্যাক্ষকে পাতালের মধ্যে বধ করেন, তখন তিনি বদরীকাশ্রমে চলিয়া যান। এবং অলকানন্দার জলে ক্রোধ শান্তির জন্য শিলারূপী হইয়া অবস্থিত হন। এই পরম পবিত্র শিলায় যদি কেহ ভূমিদান, অন্নদান, বস্ত্রাদি দান করে, তাহার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করে। যদি কেহ উপবাস করিয়া ভক্তিভাবে পরম পাবন এই বরাহশিলায় পূজা, পাঠ, স্বাধ্যায়াদি করে তাহার সকল মনবাসনা পূর্ণ হয়।

যদি কোন পুণ্যবান্ লোক যাত্রা করেন, তবে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই খণ্ড সমাপ্ত করি, এবং তাহারা যেন এই পরম পাবন পঞ্চশিলা দর্শন করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেন।

ব্রহ্ম কপাল-মোচন তীর্থ।

অতিগুহ্যমিদং তীর্থ সুরাসুর নমস্কৃতম্।
ব্রহ্মহাঽপি নরোযত্র স্নানমাত্রেণ শুদ্ধতি ॥

তপ্ত কুণ্ডের উপরে সিড়ি চড়িয়া সোজা রাস্তায় প্রায় ৩০০।৪০০ শত গজ যাইবার পর ভগবতী অলকানন্দায় নামিলে এক শিলা দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহাকে ব্রহ্মকপাল মোচন তীর্থ বলা হয়। এই পরম গুহ্য ও সুরাসুরের পুজ্য, ইহাতে স্নান করিলে কলির জীব পরম শুদ্ধমতি হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবে। এই কপাল মোচন তীর্থ কাশীতেও দেখা যায়, এবং পাঞ্জাব অন্তর্গত জগাধরী নগর হইতে ৭।৮ মাইল দূরে কপাল মোচন তীর্থ, কার্ত্তিক মাসে খুব বড় মেলা বসিয়া থাকে।

ব্রহ্মকুণ্ড হইতে মাতামূর্ত্তি পর্য্যন্ত তীর্থ।

এই ব্রহ্মকপালীর নিম্নে ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ। যখন মধু কৈটভ দৈত্য ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ লইয়া পলাইয়া যায়, তখন ব্রহ্মা বেদহীন হইয়া মহা চিন্তায় পড়িলেন, সেই সময়ে আকাশবাণী হইল তপ কর। তখন তিনি বেদ উদ্ধারের নিমিত্ত অনন্তশায়ী মহা বিষ্ণুর তপস্যা করিতে বদ্রীকাশ্রমে আসিয়া ঘোর তপস্যা করেন। এই জন্য এইখানে ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ হয়।

অত্রিঅনুসূয়া তীর্থ।

দ্বিতীয়াস্য পতদ্‌ভূমৌ তাং জগ্রাহ তপোধনঃ।
অত্রিস্তস্মাৎ সমুদ্‌ভূতো দুর্ব্বসাঃ শক্ররাশতঃ॥

(বাম পুঃ)

ব্রহ্মকুণ্ড হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া কিছু উপরে উঠিলে দেখা যাইবে, একটী নদী কল্ কল্ রবে ধারা প্রবাহিত হইতেছে, ইহাকে ইন্দ্রধারা তীর্থ বলে, এই ধারার নিকটে, অর্থাৎ গঙ্গা তীরে অত্রি অনুসূয়া তীর্থ। এইখানে ভগবান্ অত্রি ঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন। বামণ পুরাণে বড় সুন্দর কথা লিখিত হইয়াছে, যখন কপালী শঙ্কর, নারায়ণের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ ভূজে ত্রিশূল দ্বারায় তাড়ন করেন, তাহা হইতে তিন ধারা রক্ত বাহির হয়, একধারা তারার সঙ্গে ব্যপ্ত হইয়া আকাশে মিলিত হইয়া যায়, যাহার নাম আকাশ গঙ্গা হয়। অন্য ধারা তপোধন অত্রি ঋষি ধারণ করেন, যদ্বারা শঙ্করের অবতার দুর্ব্বাসা মুনি উৎপন্ন হয়। তৃতীয় ধারা কপালে পড়ে, যদ্বারা নারায়ণের পরম ভক্ত ও সখা নরের উৎপত্তি হয়, কোন সময়ে অত্রি ঋষি এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বোধ হয়। অতি মনোরম ও শান্তিময় স্থান।

ইন্দ্রধারা তীর্থ।

ততোঽবাগ্দিক্ষিণেভাগে ত্রিবধারেতিথিশ্রুতম্।
তীর্থমিন্দ্রপদং যত্রতপশ্চক্রে পুরন্দরঃ॥

(স্কন্দ পুঃ)

ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণভাগে দ্রবধারারূপে ইন্দ্রপদ নামক পরম পবিত্রতীর্থ বিখ্যাত, পুরাণে এই তীর্থের মাহাত্ম্য অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। কোন সময়ে ইন্দ্রদেব এইখানে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

মহামুনি অত্রি ঋষির আশ্রম হইতে মানাগ্রামের রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দূর হইতে পর্ব্বতের উপর শ্বেতবর্ণ পারার ন্যায় বরফ পড়িতে দেখা যাইবে, ইহার ধারা অতি তীব্র। অর্থাৎ--যেন রৌপ্যময় জল গড়াইয়া পড়িতেছে। ইহাকে ইন্দ্রধারা বলিয়া থাকে। এইখানে মারচাদের বাড়ী-ঘর আছে। অতি বিস্তীর্ণ এক সমতল ভূমি, হিমালয়ের উপরে এত বৃহৎ সমতলভূমি খুবই কম দেখা যায়। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে যখন বরফ গলিয়া যায়, সেই সময়ে এই ভূমিতে আলু, উলা (একপ্রকারের অন্ন) গেহুঁ (গম) আদি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে চারিদিকের শোভা ও সৌন্দর্য্য এত মনোরম হয়, যেন সত্যই প্রকৃতি দেবী প্রত্যক্ষভাবে লীলাখেলা করিতেছেন। আবার অসংখ্য অসংখ্য ফুলের কথা কি বর্ণনা করিব। এত অধিক বনফুল ফুটে যে ইহার গন্ধে মন মাতোয়ারা হইয়া যায়, সত্যই যেন মনে হয় স্বর্গে ভ্রমণ করিতেছি। ভাদ্র, আশ্বিন মাসে খেতী কাটায়া লোক নিম্নে চলিয়া যায়। এই ইন্দ্রধারা পরম পবিত্র তীর্থ, এইখানে ভজন, পূজন করিলে তাহার অনন্ত পুণ্যলাভ হয়।

মাতামূর্ত্তি তীর্থ।

সঙ্গমাৎ দক্ষিণেভাগে ধর্ম্মক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
যত্রমূর্ত্ত্যাংশ্রুতৌজাতৌ নর নারায়ণৌ ঋষী॥

(স্কন্দ পুঃ)

অলকানন্দা এবং সরস্বতীর সঙ্গমের দক্ষিণে ধর্ম্মক্ষেত্র বা মাতামূর্ত্তি তীর্থ বলিয়া থাকে। এরূপ বর্ণিত হইয়াছে, নর-নারায়ণের উৎপত্তি মাতা মূর্ত্তি হইতে হইয়াছে।

এই পরম পবিত্র তীর্থ ইন্দ্রধারার রাস্তায় কিছুদূর নদীর পরপারে মণিভদ্রাপুর বা মনাগ্রাম দেখা যাইবে। মনাগ্রাম যাইতে দড়ির ঝোলার মত পুল পার হইয়া অন্য পারে হইয়াও যাওয়া যায়, কিন্তু পরপারে না যাইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে শ্বেতবর্ণ এক ছোট মন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে, ইহাকে নর-নারায়ণের মাতার মন্দির কহে; ইহার পর ভয়ানক জঙ্গল পাওয়া যাইবে। মাতামূর্ত্তি কেন এই ঘোর জঙ্গলে আসিয়াছিলেন, ইহার বিষয়ে স্কন্দ পুরাণে বড় সুন্দর কথা লিখিত হইয়াছে। অধিক বিস্তারের ভয়ে এখানে লিখিলাম না। এই জঙ্গলের অন্য নাম লক্ষ্মীবনও বলিয়া থাকে। কিছু দূরে লক্ষ্মীদেবীর এক সুন্দর মন্দির আছে। ভয়ানক জঙ্গলের মধ্যে এত শান্তিপূর্ণ স্থান খুব কম দেখা যায়। প্রকৃতিদেবী যেন এইখানে শান্তিরসে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। কোন প্রকারের চঞ্চলতা নাই।

দ্বাদশ খণ্ড।

মাতামূর্ত্তি হইতে সৎপথ বা স্বর্গারোহণে যাত্রা

ততঃ সত্যপদং নাম তীর্থ সর্ব্বমনোহরম্।
ত্রিকোনাকারমেবৈতৎ কুণ্ডংকল্মষনাশনম্।
একাদশ্যাং হরিস্তত্র স্বয়মায়াতি পাবনে॥

(স্কন্দ পুঃ ৪৭ শ্লোক)

এইবার প্রথমে অলকানন্দার পুল পার করিয়া মাতার মন্দির দর্শন করিয়া পরে লক্ষ্মীবনে যাওয়া ভাল, এইখান হইতে দুইটি রাস্তাই ভাল, তবে প্রথমে লক্ষ্মীবন হইতে স্বর্গারোহণে যাওয়াই বেশ সুবিধা হইবে। এইবার নারায়ণ পর্ব্বতের ধারে ধারে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বিষ্ণুকুণ্ড, তথা হইতে নবপর্ব্বতের ধারে ধারে বসুধারা ও মাতা মুর্ত্তি হইয়া বদরীকাশ্রমের সম্মুখে ঋষিগঙ্গা পার হইয়া সোজা বদরীক্ষেত্রে চলিয়া আসুন। ইহাতে সোজা পরিক্রমাও হইয়া যায় এবং শ্রেণীবদ্ধমত সব তীর্থের বর্ণন ও দর্শন হইবে। এইখান হইতে বদ্রীনাথ প্রায় ৫।৬ মাইলের উপরে। মুর্ত্তি-মাতার মন্দিরের সম্মুখে পরপারে সরস্বতী এবং অলকানন্দার সঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরপারে এক অতি সংকীর্ণ সাধারণ রাস্তা তৈয়ার করাইয়াছে। কিন্তু এইদিক হইয়া সাধারণ পাযদণ্ডী হইয়া যাওয়া অনেক ভাল। এত কঠিন মার্গ এক এক পদ গুনিয়া গুনিয়া ফেলিতে হয়, সব সময় মৃত্যু যেন মস্তকের উপর নৃত্য করিতে থাকে। যদি একটু পা

বিপথে যায় তবে নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ না হইয়া একেবারে পাতালারোহণ ঘটিবে।

পর্ব্বতবাসী লোকেরা নীচের লোককে দেশী লোক বলিয়া থাকে। আর পর্ব্বতবাসী লোককে পাহাডী বলা প্রচলিত। বদ্রী কেদারকে যেরূপ আমরা দুর্গম মার্গ মনে করিয়া থাকি। তদরূপ এই পাহাড়ীরা কৈলাস ও সত্যপথ যাত্রাকে মহান্ ও কঠিন মনে করে। কিন্তু সত্য সত্যই কৈলাস যাত্রা এবং সৎপথ যাত্রা এক মহান্ কঠিনতার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বলিলে হয়, মৃত্যু সর্ব্বদা হাতের উপরে নৃত্য করিতেছে মনে হয়। হাজারের মধ্যে ২।৪ জন এই মহান কঠিন পথে যাত্রা করিয়া থাকে। আর যে কেহ যাবেন তাহার মধ্যে প্রায় এই রকমের লোক সব যাইয়া থাকেন যাহারা জীবনে আমার মত সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ সাধু সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যলোক বড় একটা যায় না। গৃহস্থের সংখ্যা আঙ্গুলের করের মধ্যে গণনা করা যায়। কেননা সমস্ত মার্গ এত দুর্গম, যত প্রকারের আবশ্যকীয় বস্তু সব সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। এই সব পর্ব্বতের উপরে তিনটী বস্তুর কোনও অভাব নাই, প্রথম পাথর, ২য় বরফ ও জল হিমের কথা না বলিলেও হয়। আমি আবশ্যকীয় দ্রব্যের মধ্যে একটী আল্‌খল্লা, যাহা দ্বারা শরীর হইতে চরণ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত থাকে, এক কম্বল, একটি কমণ্ডলু একটা নীচে লোহা লাগানো লাঠি, একজোড়া জুতা; আহারের জন্য ঘৃতের মধ্যে আটা ও চিনি মিলিত করিয়া ।৶৹

আধপোয়া মত একটী একটী লাড্ডু, প্রত্যেকদিন একটী করিয়া আহার করিয়া অতিকষ্টে মার্গ চলিতে থাকি, সঙ্গে অন্য একটী সাধুবন্ধুও ছিলেন তাঁহার নাম ব্রহ্মানন্দগিরি, জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায় বর্ত্তমানে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের সঙ্গে নৈনিতাল জিলার আরও দুইজন ভদ্রলোক গিয়াছিলেন। উহাদের একজনের নাম রামদত্ত যোশী, অন্যের নাম জয়রাম সিং। দুইজন বেশ সাহসী লোক। এইখান হইতে নারায়ণ পর্ব্বতের ধারে ধারে কিছুদূর যাইবার পর নরপর্ব্বত, ইহারই ধারে ধারে তিনদিনের মধ্যে বদ্রীনাথ ফিরিয়া আসা যায়। বদ্রীনাথ হইতে সৎপথ ২০।২২ মাইলের মধ্যে হইবে। ২।৩ মাইলের উপরে স্বর্গারোহন পর্ব্বত। পঞ্চ পাণ্ডব এই পর্ব্বতের উপরে গলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। নর নারায়ণ পর্ব্বত ও স্বর্গারোহণ পর্ব্বত মিলিয়া যেন একটী প্রকাণ্ড দেবালয়ের আকৃতিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার আগে আর কোন রাস্তা নাই। চির তুষারাবৃত হিম সাম্রাজ্যে শুধু এই দুই পর্ব্বতের শিখরে একটুখানি সামান্য জায়গা দেখা যায়, আরও বহু ঊর্দ্ধে বরফের উপর দিয়া কোন সাহসী লোক হয়তো অপর পার কেদার নাথ যাইতে পারে। একটী কুলীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে কোন একজন ইংরাজ কুলি সঙ্গে করিয়া পার হইয়া কেদারে চলিয়া গিয়াছিল। এখান হইতে বরফের পর্ব্বত পার হইয়া এক দিনের মধ্যেই কেদার নাথ যাইতে পারে। আমার সঙ্গে যে দুইজন ভদ্রলোক

গিয়াছিলেন তাঁহারা স্বর্গারোহণে যাওয়ার সাহস করিলেন না, এখান হইতে ফিরিয়া পুনঃ বদ্রীনাথ চলিয়া যান। শুধু আমরা দুইজন সাধু যাত্রা করিতে মনস্থ করিলাম। বদরীশ্বরই সঙ্গি হইবেন। কিন্তু উহারা সত্যপথ হইতে ফিরিয়া আসিল, সৌভাগ্যবশতঃ এই সত্যপথ হইতে আরও দুইজন নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইল, জাতি ভাই বলিয়া অতি আনন্দ অনুভব করিলাম, ইঁহারাও স্বর্গারোহণে যাইবেন, চারিজন সন্ন্যাসী ভাই মিলিয়া পরদিন যাত্রা করিব নিশ্চয় হইল। সত্যপথ যাত্রা এবং স্বর্গারোহণ যাত্রা বৎসরের মধ্যে দুই সময় আসে।

বৈশাখের অন্তে জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগে, নতুবা আশ্বিনের অন্তে কার্ত্তিকের প্রথম ভাগে, কিন্তু তবুও সময় দেখিয়া যাওয়া ভাল, অন্যথা এক মিনিটের মধ্যে জীবনলীলা শেষ হইবার আশঙ্কা। কার্ত্তিকের শেষ ভাগ হইতে তুষারপাত আরম্ভ হয়, এবং বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে থাকে। স্বর্গারোহণ ও নারায়ণ পর্ব্বতের বরফ কখনও গলে না, বার মাস বরফ পড়িতে থাকে।

পরদিন ৺ভগবানের নাম করিয়া স্বর্গারোহণ যাত্রার জন্য সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম। সন ১৯৩২ মঙ্গলবার ১৭ই সেপ্টেম্বর। মাতা মূর্ত্তি হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর স্বর্গারোহণ পর্ব্বতের ধারে ধারে, কত নদী ঝরণাদি পার করিয়া আবার কখনও চড়াই কখনও উতরাই করিতে করিতে

অতি মনোরম হিমরাজ্যের বিশাল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং করুণাময়ী মা অলকানন্দার হর হর শব্দ শুনিতে শুনিতে একেবারেই হিমাদ্রি শিখরে আরোহণ করিতে থাকি, সম্মুখে বসুধারার অতি মনোরম জলের ধারা পড়িতে দেখা যাইবে, দূর হইতে যেন মনে হয়, রৌপ্যের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। আমরা যেন কোন এক নূতন রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এরূপভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর লক্ষ্মীবন দৃষ্টিগোচর হইবে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ভুলিয়া যেন এক ইন্দ্রজালিকের কুহকিনীর রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই লক্ষ্মীবনে প্রকৃতি দেবী যেন নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া ও নূতন রূপ ধারণ করিয়া নিবাস করিতেছেন, এই বনের মধ্যে একমাত্র ভোজ পত্রের বৃক্ষ ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষ নাই। ইহারা সুউচ্চ শিরে খাড়া হইয়া আছে। [illegible] সত্যপথের যাত্রী একমাত্র এই বনের মধ্যে নিবাস [illegible] এই কারণ ইহার পর আর তেমন কোন জায়গা নাই। [illegible] ও ক[illegible]র প্রধান কারণ এইখানে প্রচুর পরিমাণে জ্বালাইবার [illegible] উচ্চ পাওয়া যায়। "অমৃতং শিশিরে বহ্নিঃ"— সামান্য একটুখানি ময়দানও আছে। "মা অলকানন্দা এইখানে যেন একটু শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন। নিকটে একটী জলের ঝরণাও আছে। এই ঝরণাকে লক্ষ্মীধারা বলিয়া থাকে। লক্ষ্মীধারা হইতে খুব ধীর গতিতে চড়াই করিতে হয়, এইরূপ ভাবে আরও কিছুদূর যাইবার পর আবার একটুখানি বরফের ধারা আসিবে। অতি সাবধানের সহিত চলিতে

হয়। যদি একটু পা ফসকাইয়া যায় তবে একেবারেই স্বর্গারোহণ। আমরা আশ্বিন মাসে গিয়াছিলাম, সেইজন্য বরফ একটু শক্ত হইয়াছিল নারায়ণ পর্ব্বতের অন্য পার হইতে নির্ম্মল স্বচ্ছ শত শত ধারা বহিতেছে। ইহাদের সহস্র ধারা বলিয়া থাকে, নয়নে কত মনোরম দৃশ্য, এই সব ধারা শীতকালে জমিয়া যায়।

চতুঃস্রোত তীর্থ।

চতুঃস্রোতময়ং তীর্থং বিলোচন মনোহরম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাস্তে তিষ্ঠন্তি দ্রবরূপিণঃ॥

এই যে চারিস্থিতি চারিদিকে বলিয়াছেন। যেইস্থান হইতে নরনারায়ণ পর্ব্বত মিলিত হইয়াছে, যাহার নাম স্বর্গারোহণ পর্ব্বত বলিয়া থাকে, এই স্বর্গারোহণ পর্ব্বত হইতে অসংখ্য স্রোত, বরফের নিম্নে ও উপরে প্রবাহিত হইতেছে, এখন ইহার নির্ণয় করা অসম্ভব কোনটীকে চতুঃস্রোত বলে, তাহা ভগবান জানেন। স্নান করিবার জন্য কাহারও সাহস হয় না। কেবলমাত্র সম্মুখে, পিছনে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, নমস্কার ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, "হে দ্রবরূপী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তোমায় নমস্কার ভিন্ন এই ক্ষুদ্র হীনবীর্য্য কলির জীব আর কি দ্রব্য দিয়া পরিচর্য্যা করিতে পারে? এই সব ধারা পার হইবার পর চক্রতীর্থ আসিবে। এইচক্র তীর্থের বর্ণনা কেদার খণ্ডে ও মহাভারতে সুন্দর কথা লিখিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন এইখানে স্নান করিবার পর মহান্ অস্ত্র বিদ্যা লাভ করেন এবং আপন শত্রু দুর্য্যোধনাদিকে কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে পরাজিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। আসুন! আমরাও সকলে এই পরম পবিত্র চক্রতীর্থ স্নান করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় অস্ত্রবিদ্যালাভ করিয়া আমাদের আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্ম ও জাতির রক্ষাকল্পে স্নান করি। চক্রতীর্থে অনেক সুন্দর সুন্দর ও পরম রমণীয় স্থান আছে। এই চক্রতীর্থ ঠিক একটা পুষ্করণীর মত দেখিতে। বর্ষার সময়ে জল জমিয়া যাইয়া সম্পূর্ণ পুকুর বরফে পরিণত হয়। ইহাতে এক ধারা আসিয়া পড়িয়াছে। পার্শ্বে একটুখানি সমতলভূমিও আছে। এইস্থানের দৃশ্য অতি রম্য ও শান্তিময়ী গরমের দিনে পাহাড়ী লোকেরা ছাগল ভেড়াদি চরাইয়া থাকে, যাত্রীরা এইখানে বিশ্রাম করিয়া থাকে। ইহার প্রায় তিন চারি মাইল দূরে সত্যপথ তীর্থ। এই তিন চারি মাইল চড়াই অতি কষ্টকর। শ্বাস লইতেও কষ্ট বোধ হয়। প্রায় সমুদ্র হইতে সতের হাজার ফীট্ উচ্চ। রাস্তা এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। একটী যায়গা হইতে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম, যদি সঙ্গের সেই নাগা সন্ন্যাসী না ধরিত তবে আমার একেবারেই সত্যপথ না হইয়া মৃত্যুপথে যাইতে হইত। একটী পাহাড়ের চড়াই করিবার পর নীচে নামিতে হয়। নিম্নের দিকের জল গড়াইয়া পড়িতেছে দেখা যাইবে, আর উপরে অসংখ্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাহাড়। বলা যায় না এই সমস্ত পাহাড় কখন ভাঙ্গিয়া

এই দশা হইয়াছে। ছোট বড় অসংখ্য অসংখ্য পাথর সব পড়িয়া রহিয়াছে। শীতকালে বরফ পড়িয়া সব পাথর ঢাকিয়া যায়। কোথাও বরফ জমিয়া এক প্রকাণ্ড পাথরের মত হইয়া রহিয়াছে। নিম্নদিকে এত জোরে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যেন প্রতিক্ষণে বজ্রপাতের শব্দ হইতেছে। পাথরের উপরে লাফাইয়া চলিতে হয়। এই ভীষণ রাস্তা পার হইবার পর সম্মুখে ত্রিকোণাকৃতি সত্য পথের নয়নাভিরাম সুন্দর পুকুরের আকৃতি দেখা যায়। আমাদের মনপ্রাণ সত্যপথ তীর্থ দর্শন করিবার জন্য অতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। শীঘ্র শীঘ্রই মার্গ অতিক্রম করিতেছিলাম। যে তীর্থ দর্শন করিবার জন্য এত কষ্ট এত কঠিন ও দুর্গম মার্গ যাত্রা করিয়া আসিয়াছি, তাহা চক্ষুর নিকটবর্ত্তী হইল। যেন কাঙ্গালের বাঞ্ছিত নিধি পাওয়া গেল। মনে হইল তপস্বীদের সম্মুখে যেন মূর্ত্তিমতী যোগসিদ্ধি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই রকম বরফে আচ্ছাদিত প্রদেশে এমন স্বচ্ছ নির্ম্মল কাঁচের মতন জলপূর্ণ সরোবর দেখা গেল। মন স্বতঃই প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল, বিশ্ব প্রভু বিশ্বকর্ম্মা-রূপী কারীগরকে করযোড়ে নমস্কার ও ধন্যবাদ দিয়া, এইবার আমরা চলুন সত্যপথে গিয়া বিশ্রাম করি।

সত্যং স্বর্গস্য সোপানং সত্যং ব্রহ্মপ্রদপ্রদম্।
সত্যেন লভ্যতে মোক্ষং সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ (বহ্নি পুঃ)

ত্রয়োদশ খণ্ড।

সত্যপথ তীর্থ

ত্রিকোণ-মণ্ডিতং তীর্থং নাম্না সত্যপদপ্রদম্।
দর্শনীয়ং প্রযত্নেন সর্ব্বৈঃ পাপ-মুমুক্ষুভিঃ॥ (স্কন্দ পুঃ)

এই ত্রিকোণ-মণ্ডিত তীর্থ, যাহার নাম সত্যপথ তীর্থ, যিনি সত্যপথে কলির মহান্ পাপীকে তথায় নিয়া যাইতে পারেন, ও সেই পরম পাবন তীর্থ প্রত্যক্ষ দর্শন ও তথায় স্নান করিয়া জীবন পুণ্যময় করেন তিনি ধন্য। সত্য সত্যই এই সত্যপথ তীর্থ অতি দুর্গম কঠিন মার্গ অতিক্রম করিয়া ও অতি সাহসের সহিত খুব ভাগ্যবান্ পুরুষ না হইলে দর্শন হওয়া অসম্ভব। প্রায় এক মাইল পরিধি অতি মনোরম সরোবর এখানে দর্শনীয় বস্তু। অতি নির্ম্মল কাকচক্ষুজল, পার্শ্বে কয়েকটী গুহাও আছে। যাত্রীরা এই সব গুহায় আশ্রয় নিয়া রাত্রি অতিবাহিত করেন। আমরাও একটী গুহায় আশ্রয় নিয়াছিলাম। এক সন্ন্যাসী অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এইখানে একটী গুহায় বারমাস বাস করেন। অবশ্য গুহাটী অনেক ভাল, যেন একটী ঘরের মতন, শীতকালে বরফ অধিক পড়িলেও তেমন কষ্ট হয় না। তিনি কাঁচা আটা এবং কাঁচা আলু আদি আহার করিয়া এই বিশাল হিমাদ্রি শিখরে বসিয়া কঠোর তপস্যা করেন।

স্কন্ধ পুরাণে লিখিত হইয়াছে একাদশীতে সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণ নিয়া এই সরোবরে স্নান করিতে আসেন, তৎপশ্চাতে সব দেবতা ও সিদ্ধ মুনি ঋষিগণ স্নান করেন। তিন কোণায় তিন দেবতা তপস্যা করেন। ইহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পুরাণ লিখিয়াছেন--যে কেহ এই পবিত্র সত্যপথ তীর্থে জপ, তপ, পূজাদি করেন, তাহার ফলের বিষয়ে ব্রহ্মা আদি ও সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারেন না। আমরা চারিজন সন্ন্যাসী দশ দিন এই পরম পবিত্র তীর্থের গুহায় কাটাইয়াছিলাম। এত আনন্দ পাইয়াছিলাম যদি খাদ্যের অভাব না হইত তবে আমার ইচ্ছা ছিল, এইখানে আরও কিছুদিন বাস করিয়া তপস্যার আনন্দ অনুভব করি। আবার দ্বিতীয় কারণ আমরা যে চারিজন সন্ন্যাসী যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একজন নাগা সন্ন্যাসীর রাত্রে তিন চারি বার ভেদ বমি হওয়াতে সকাল বেলায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার শরীর আমরা তিনজনে টানিয়া সেই পরম সত্যপথের সরোবরে জল সমাধি দিয়া সেই দিনই সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

সোমকুণ্ড তীর্থ।

ততস্তু বিমলংতীর্থং সোমকুণ্ডাভিধং পরম্।
তপশ্চকার ভগবান্ সোমো যত্র কলানিধিঃ॥ (স্কঃ পুঃ)

সত্যপথ তীর্থকে পর দিন দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্বর্গারোহণ

যাত্রায় বাহির হইলাম, যাত্রীরা যদি খুবই সাহসী হয় তবেই বীরত্বের সহিত সত্যপথ তীর্থ পর্য্যন্ত যাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসে। কারণ লোকে বলিয়া থাকে, যে যায় বদ্রী, সে না হয় উদ্রী, সেই রকম যে কেহই স্বর্গারোহণে যায়, সে পুনঃ ফিরিয়া আসে না। বদ্রীনাথের পোষ্ট মাষ্টার রামদত্ত সাহা আরও দুইজন ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে আসিবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আসিতে পারেন নাই। পরে তাঁহারা আসিয়াও আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। এইবার আমরা ছয় জন একত্রিত হইয়া স্বর্গারোহণ আরম্ভ করিলাম। আমাদের পরম সৌভাগ্যক্রমে এই কয়েকদিন যাবৎ আকাশ বেশ নির্ম্মল ছিল। কোন প্রকারের বর্ষা অথবা তুষারপাত হয় নাই। যাহা তুষারপাত হইয়াছিল এক রকম সহ্য হইয়া গিয়াছিল। যখন আমরা স্বর্গারোহণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছিলাম তখন মনে হইতে লাগিল যে, কোন এক অদ্ভুত দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। যেন সবই স্বপ্নবৎ মনে হইতে লাগিল। অপূর্ব্ব দৃশ্য বিস্তার করিয়া শান্তিময়ী প্রকৃতিদেবী যেন মৌনী হইয়া রহিয়াছেন। অনেক বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম পঞ্চ পাণ্ডব এই পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিবার সময় বরফে গলিয়া যান। কিন্তু মহাভারতে পাণ্ডবদের অন্তর্দ্ধান সুমেরু পর্ব্বতে হইয়াছিল ইহা পাওয়া যায়। গিরিরাজ হিমালয়ের উপরে যখন উঠিলাম তাহা এমন সুন্দর ও দিব্যস্থান সব দেখিলাম, মনে হইল সত্যই এই ভূমি দেবতাদের জন্য বিধাতা

রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ইহা অগম্য ভূমি। পঞ্চপাণ্ডব হিমালয় পার হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে যাইয়া মিলিত হইয়া যান, এইরূপ উল্লেখ আছে। খুব সম্ভব তাঁহারা বদ্রীনারায়ণ হইতে গিয়াছিলেন। আবার কেদারনাথ হইয়াও এক রাস্তা সুমেরু পর্ব্বতে গিয়াছে। কেদারনাথে অনেকবার শুনিয়াছি পঞ্চপাণ্ডব কেদারনাথ হইয়া সুমেরু আরোহণ করিয়াছিলেন। পুনঃ গঙ্গোত্রী হইতেও এক রাস্তা আছে কিন্তু সকলের অগম্য মার্গ। যাহা হউক সুমেরু পর্ব্বত কোনটী তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। সুমেরু এক দিব্য পর্ব্বত, সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। সুমেরু পর্ব্বত দেবতাদের ও সিদ্ধ যোগী ঋষিদেরই দর্শন হইয়া থাকে। সত্যপথ তীর্থ হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব্বত দেখা যায়, কিছুদূর যাইবার পর স্বর্গারোহণে উঠিবার যেন সিঁড়ি তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে। বরফ ফাটিয়া গিয়া ঐরূপ হইয়াছে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আরও পরিষ্কার ভাবেই দেখা যায়। আমরা যখন সত্যপথের ধারে ধারে উপরে চড়িতেছিলাম তখন এমন এক জায়গায় আসিয়া পড়িলাম সে স্থানটী একটী তলোয়ারের মতনই দেখিতে। অতি সাবধানের সহিত এই পথ অতিক্রম করিতে হয়, যদি পা ফস্‌কায় তবে একেবারেই স্বর্গারোহণ হইয়া যাইবে। একেবারেই বরফের উপর দিয়া চলিতে হইবে। নিঃশব্দ ও নির্ব্বাক হইয়া চলিতে হইবে। শব্দ করিলে বরফ পড়িতে থাকে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে শুনিয়াছি, প্রতিক্ষণ ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, যেন এক একটী

কামানের গোলার মতন শব্দ হয়। যদি মহাসমরের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে স্বর্গারোহণ আসিলে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে। মনে হয় দেবতারা সত্যপথ কুণ্ডে স্নান করিতে আসিতেছে, আর অসুরেরা তাহাদের উপরে পাথর ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিতেছে। এইরূপ দৃশ্য অহঃরহ হইতেছে, সূর্য্যদেব যত প্রখর কিরণ বিস্তার করিতেছেন, ততই আরও ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এই সব দৃশ্য হিমালয়ের প্রত্যক্ষ দেখিবার বস্তু। অতি সতর্কতার সহিত আস্তে আস্তে চড়াই করিবার পর পুনঃ একটুখানি উতরাই করিলে নিম্নে একটী গোলাকৃতি কুণ্ড দেখা যাইবে। ইহাকে সোমকুণ্ড বলে। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন কুণ্ডে জল একেবারেই নাই। এইরূপ শুনিয়াছি, অমাবস্যায় এই কুণ্ডে জল একেবারেই থাকে না। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে একটু একটু করিয়া জল জমা হইয়া পূর্ণিমায় পূর্ণ হইয়া যায়। আমরা অমাবস্যার দুই দিন পূর্ব্বে গিয়াছিলাম। এই জনমানব শূন্য হিম গিরির উপরে চন্দ্রদেব কেন এইখানে আসিয়াছিলেন, ইহার এক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে। তাহা আমি এইখানে বিবৃত করিলাম।

ভগবান অত্রি ঋষীর পুত্র চন্দ্রমা, কোন সময়ে আপন পিতার নিকট বসিয়া দেবতাদের স্বর্গ বিষয়ক কথা শুনিতেছিলেন। স্বর্গের প্রশংসা শুনিয়া চন্দ্রদেবের বাসনা হইল, তিনিও স্বর্গসুখ উপভোগ করেন, তিনি তখন পিতার নিকট

হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করিলেন 'হে পিতাজী, আমারও প্রবল ইচ্ছা হইতেছে কি আমিও স্বর্গের দিব্য সুখ ও আনন্দ উপভোগ করি, এবং সাধারণ দেবতার মতন গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ঔষধি তথা ব্রাহ্মণদের রাজা হইয়া অমৃত বর্ষণ করিতে করিতে আনন্দময় স্বর্গধামে নিবাস করি ; এরূপ কোন প্রকারের উপায় থাকিলে আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। যদ্দারা আমার মনো-বাসনা পূর্ণ হয়।

অত্রি মহর্ষি বলিলেন—"হে পুত্র ! তপস্যা দ্বারা সব বাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তপস্যা দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়, সেইজন্য তুমি কোথায়ও যাইয়া তপস্যা কর।

চন্দ্রদেব মহা চিন্তায় পড়িলেন, কোথায় যাইয়া তপস্যা করেন ; এবং আপন মনোবাসনা পূর্ণ হয়। এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ ভ্রমণ করিতে করিতে এবং বীণা বাজাইতে বাজাইতে তথা ভজ মন নারায়ণ বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রদেব নারদ মুনিকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে স্বাগত বলিয়া আসন দিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হে মুনি শ্রেষ্ঠ নারদজী মহারাজ কোথায় হইতে আগমন করিলেন।

"নারদ মুনি বলিলেন—ভাই, আমি বর্ত্তমান বদ্রীকাশ্রম হইতে আসিতেছি, তুমি এত চিন্তান্বিত হইয়াছ দেখিতেছি, কারণ কি ?

চন্দ্রদেব বলিলেন—"হে নারদজী মহারাজ, তোমায় কি বলিব আমার স্বর্গসুখ ভোগ করিবার বড়ই বাসনা হইয়াছে, সেইজন্য পিতার নিকট সব কথা বলিতে তিনি বলিলেন, কোথায়ও যাইয়া তপস্যা করিতে, এখন ভাবিতেছি, কোথায় যাইয়া তপস্যা করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করি।

"নারদ মুনি এই কথা শুনিযা বড়ই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, ইহার জন্য তুমি কোন চিন্তা না করিয়া শীঘ্রই আমার সঙ্গে বদ্রীকাশ্রমে চল। সেইখানে তপস্যা করিলে কোটী কোটী গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে।

এই কথা শুনিয়া চন্দ্রদেব আনন্দের সহিত নারদ মুনির সঙ্গে বদ্রীকাশ্রমের উপরে সত্যপথের কিছু আগে স্বর্গারোহণের নিম্নে বসিয়া ঘোর তপস্যা করিতে থাকেন। ৮৮ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত "ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়, মন্ত্রের জপ করিতে থাকেন, তাহার পর ভগবান্ বাসুদেব প্রসন্ন হইয়া বর নিবার জন্য বলিলেন,—

চন্দ্রদেব বলিলেন—আমি পরমানন্দরূপী স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে বাসনা করি, "হে আত্মরূপী নারায়ণ, যদি আপনি আমার উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার কাম্য বর প্রদান করুন।

ভগবান্ বলিলেন—গ্রহ, নক্ষত্র, তারা তথা সমস্ত ঔষধি এবং ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য অত্যন্ত দুর্লভ, সেইজন্য তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা করিতে পার।

চন্দ্রদেব বলিলেন—আমার অন্য কোন বর নিবার বাসনা নাই, ভগবান্ তখন অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন। চন্দ্রদেব আবার ৩০ হাজার বৎসর তপস্যা করিতে থাকেন। পুনঃ নারায়ণ চতুর্ভুজরূপে তাঁহার নিকট আসিয়া দর্শন দিলেন। চন্দ্রদেবও তাহার সেই অভীষ্ট বর পূর্ব্বমত প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ পুনঃ অন্তর্ধ্যান হইলেন। তৃতীয় বার পুনঃ ৫০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা করিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন, তখন হইতে চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র, তারাদি তথা ঔষধি এবং ব্রাহ্মণের রাজা হইয়া অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে থাকেন, এবং সেই দিন হইতে এই কুণ্ড সোমকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়, ইহার মাহাত্ম্যের বর্ণনা করা হইয়াছে, যেই কোন ভাগ্যবান্ লোক যদি এই সোমকুণ্ডে স্নান, জপ, তপ করেন, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া চন্দ্রদেবের মত অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ সুখ ভোগ করেন।

ইহার পর সূর্য্যকুণ্ড ও বিষ্ণুকুণ্ড নামক অতি পবিত্র দুই তীর্থ দর্শন করিবার পর সোমকুণ্ড। এই সোমকুণ্ড তীর্থ হইতে প্রায় এক মাইল রাস্তা একটু সরল, কিন্তু একেবারেই বরফের উপর দিয়া চলিতে হয়। উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিলে বরফ ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই বরফ নানা রঙ্গের দেখা যায়, কোথায়ও লাল, কোথায়ও নীল, কোথায়ও শ্বেতবর্ণ, আবার কোথায়ও পাথরের মত শক্ত, কোথায়ও মাখনের মত

নরম, কখন কখনও এই বরফ নীচে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে, জীবনে সত্য সত্যই প্রকৃতি দেবীর বিচিত্র লীলা দেখিবার মতন। এই স্বর্গারোহণ পর্ব্বতে কোন প্রকারের বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি কিছুই নাই, কোন প্রকারের পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি বিহীন। এখানে থাকার মধ্যে কেবলমাত্র জল, বায়ু, বরফ ও পাথর।

সূর্য্যকুণ্ডটী খুবই ছোট একটী ঝরণার জল যাইয়া পড়িতেছে, শীতলতার বিষয় লিখিয়া ব্যক্ত করা অসম্ভব। বরফ পড়িতেছে ও তাহা গলিয়া যাইতেছে, এই দিকে শরীর শীতের কারণ অবশ করিয়া ফেলিতেছে। চক্ষের পলক্ নিতেও কষ্ট বোধ হইতেছে, কর্ণকুহর যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, শ্বাস নিতেও মহান্ কষ্ট বোধ হইতেছে। বুদ্ধি কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাইতেছে, এমন অসীম বলশালী পঞ্চ পাণ্ডব যখন এই স্বর্গারোহণে গলিয়া গিয়াছিল, তখন আমাদের মতন ক্ষুদ্রজীব তথায় কি করিবে? এই তীর্থ কেবলমাত্র দর্শনেই মুক্তি এখানে স্নান করা দুঃসাধ্য, নর-নারায়ণ পর্ব্বত ও স্বর্গারোহণ পর্ব্বত দুইটী এইখানে মিলিত হইয়া যেন মধুর হাস্যরসে তুষার বর্ষণ করিতেছে। দুই পর্ব্বতের মধ্যভাগে একটুখানি সমতল ভূমি, ইহার কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পরম পবিত্র শ্রীরাম গুহা পাওয়া যাইবে। চলুন আমাদের রাত্রিবাস সেই গুহায় হইবে।

শ্রীরাম গুহা

গত্বা দেন প্রয়াগঞ্চালকনন্দাতটেন বৈ।
নর-নারায়ণৌ গত্বা দর্শনান্মুক্তি দৌ নৃনাম্॥
বদরীকাশ্রমে রামঃ কেদারেশ ত্রিলোক্য সঃ।
মহাপথং ততো গত্বা যথৌ ভগ্নমনসংসরঃ॥

(আনন্দ রাঃ)

এইবার আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া পর, পর্ব্বতের ধারে ধারে গমন করিলাম। গত রাত্রে খুবই ভয়ানক বরফ পড়িয়াছিল। গত দিন যে গুহায় রাত্র বাস করিয়াছিলাম, পরে জানিতে পারিলাম, তাহা রাম গুহা নয়। রাম গুহা আরও প্রায় এক মাইলের মত দূরে অবস্থিত। বেলা প্রায় দশটার মত হইবে, তখন সকলে মিলিয়া বরফের পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। বরফের নিম্ন দিয়া অলকানন্দার জল প্রবাহিত হইতেছে। অতি কষ্টের সহিত কিছুদূর যাইবার পর একটী গুহা দৃষ্টিগোচর হইল, এই গুহা দেখিবার জন্য আমরা আরও পর্ব্বতের শিখরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু এইবার শরীর একেবারেই অবশ করিয়া ফেলিতেছিল। চরণ যেন আর একটুও অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। সঙ্গী স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন। আমি যদি না ধরিতাম, তবে বহু দিনের মত এই পর্ব্বতের বরফের উপরে তাঁহার প্রাণশূণ্য-দেহ বহু বৎসর পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিত।

এইবার আমরা রামগুহায় পৌঁছিলাম। গুহার আকৃতি ঠিক একটী পর্ব্বতের ছাদের মতন। বর্ষার জল থেকে বাঁচিবার ও বরফ হইতে বাঁচিবার একমাত্র এই গুহা এত অধিক লম্বা ও দীর্ঘ বিশাল গুহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। কাশ্মীর ও নাসিকে গুহা দেখিয়াছি কিন্তু এই গুহা, এক বিচিত্র প্রকারের বিধাতা তৈয়ার করিয়াছেন। ইহা কোন মনুষ্যের তৈয়ারী গুহা নয়, প্রকৃতিক গুহা। কোন সাধু এই গুহার অর্দ্ধ ভাগ দেওয়ালের মতন তৈয়ারী করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। ইহার ভিতরে বেশ সুন্দর সুন্দর কামরার মতন তৈয়ার করিয়াছেন। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে একজন আমাদের পরিচিত প্রেমগিরি নামক একটী সাধু থাকেন। পূর্ব্বে তিনি ঋষিকেশে থাকিতেন। ছয়মাস পাণ্ডুকেশ্বরের কোন জায়গায় শীতের সময় আসিয়া থাকেন। আর ছয়মাস শ্রীরামগুহায় থাকেন। তাঁহাকে সকলে মৌনীবাবা বলিয়া থাকেন। কারণ তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি সবই কাঁচাই আহার করেন। মনে হয়, কাঠের অভাবের জন্যই এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিন রাত্রি এই পুরান পরিচিত গুরু-ভাইয়ের নিকট রামগুহায় কাটাইয়াছিলাম। অতি সুন্দর হিমালয়ের দৃশ্য দেখা যায়। তাহা ব্যক্ত করা যায় না। এখনও আমার মনে সেই কথা উদয় হইলে মন নৃত্য

করিতে থাকে। গুহার ভিতরে জলের বেশ সুন্দর ধারাও আছে। প্রাতঃকালে সমস্ত গুহাই বরফে আচ্ছাদিত থাকে। বেলা বারটার পর হইতে একটু একটু গলিতে থাকে। গুহার উপরে বরফ কখনও গলে না। বারমাস জমা থাকে। যেন তাহাদেরই সাম্রাজ্য। গুহার ভিতরে কোন প্রকারের ভয় নাই। যদি খাদ্যের অভাব না থাকিত তবে বার মাস এই গুহায় আনন্দের সহিত বসিয়া তপস্যা করা যাইত। দিনের বেলায় নিজেরা সব কাঠ যোগাড় করিয়া রাখিতাম, রাত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আরাম করিতাম। এই কাঠ কাঁচাও জলে। সমস্ত রাত্রে ধুনির চারিদিকে বসিয়া রাম নামের ধ্বনি করিতে করিতে রাত্র অতিবাহিত করিয়াছিলাম। শ্রীরামগুহা কেন নাম হইল এ সম্বন্ধে শুনিয়াছি শ্রীরামচন্দ্র দুষ্টমতি রাবণকে সংহার করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য এবং লোকশিক্ষার্থে তপস্যা করিবার জন্য বাণ দিয়া এই গুহা তৈয়ার করিয়াছেন। ভগবান জানেন তিনি বাণদ্বারা ইহা করিয়াছিলেন; না ইহা স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান ছিল। তিন রাত্র বাস করিবার পর, এইবার আমরা সকালে বসুধার দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। কত নদী পার হইলাম, আবার কত বরফের উপর দিয়া চলিতেছিলাম। কিছুদূর উপরে চড়াই করিবার পর মা ভাগীরথী ও অলকানন্দার স্রোত দেখা গেল। সুন্দর সুন্দর দৃশ্যাদি দৃষ্ট হইল। দেখিলাম, বরফের নিম্নদেশ হইতে অতি প্রখর ধারে জলের ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

যেমন গোমুখ হইতে গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হইতেছে; ঠিক তদ্রুপভাবেই এই ভাগীরথীমাতা অলকানন্দার স্রোত বহিতেছে। এইখান হইতে অলকানন্দার উৎপত্তির স্থান—অর্থাৎ তিনি নদীর রূপ ধারণ করিয়াছেন। এত প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম পর্ব্বতগুলি যেন সমুদ্রের তরঙ্গের মণ্ডন হইযা রহিয়াছে। পবনদেব যেন শান্তরসে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ইহার কিছুদূরে অলকাপুরী সত্যই যেন আমরা স্বর্গেই আসিয়া পৌঁছিয়াছি। যেখানে অলকাপুরী তাহা পর্ব্বতের এক সর্ব্বোচ্চ শিখরে। এইখান হইতে চড়াই আরম্ভ হয।

অলকাপুরী।

এক পর্ব্বতের উচ্চ শিখরের নাম অলকাপুরী। শুনা যায়, এইখানে অদৃশ্যরূপে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর আদির বাসস্থান, কিন্তু কুবেরের অলকাপুরী যাহার কথা পুরাণে লিখিত আছে তাহা সুমেরু পর্ব্বতের উপরে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে অতি প্রখরভাবে ধারা পড়িতেছে, অনেকে ইহাকে অলকানন্দার প্রধান স্রোত বলিয়া থাকে। কিন্তু আমার ইহাতে সংশয় উপস্থিত হয়, কারণ—অলকানন্দার প্রধান স্রোত বিষ্ণুকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড হইয়া নারায়ণ পর্ব্বতের পাদতল হইতে যে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই প্রধান স্রোত বলিয়া আমার মনে

হয়। শাস্ত্রেও দেখা যায়। গঙ্গা বিষ্ণুপদী, বিষ্ণুপদাৎ পতিতা মেয়ো,—নারায়ণের পদতল হইতে ইহার উৎপত্তি। এবং যুক্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

বসুধারা হইতে বদরী পুরী।

মানশোদ্ভেদনাৎ প্রত্যগ দিশি সর্ব্বমনোহরম্।
বসুধারেতি বিখ্যাতং তীর্থং ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভম্॥
(স্কন্দ পুঃ)

মানসোদভেদ্ তীর্থ হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে পরম রমণীয় ত্রৈলোক্যেরও দুর্ল্লভ বসুধারা নামক তীর্থ বিদ্যমান।

অলকাপুরীর সেই প্রখর স্রোত অতি কষ্টের সহিত পার হইবার পর প্রায় এক মাইল দূর যাইতে হয়, তাহার পর পরম পাবন বসুধারা তীর্থ আসিবে। দূর হইতে যেন হর হর শব্দ করিতেছে শুনা যাইবে। এত সুন্দর মনোহর ঝরণা আমি জীবনে দ্বিতীয় আর দেখি নাই। এই বসুধারা দর্শনের নিমিত্ত প্রতি বর্ষে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকেন। বদ্রীনারায়ণ হইতে বসুধারা পাঁচ মাইল হইবে। অতি মনোরম দৃশ্য, এক অতি উচ্চ পর্ব্বতের শিখর হইতে জলের ধারা পড়িতেছে। মধ্যে বায়ু লাগিয়া ছিটাইয়া পড়িতেছে। নর্ম্মদায়ও ঐরূপ ঝরণা দুই তিন জায়গায় দেখিয়াছি। কিন্তু তাহা এত উচ্চ হইতে নয়। জব্বলপুর হইতে ভেরাঘাট নামক স্থানে নর্ম্মদার

ঝরণা অতি সুন্দর দেখা যায়, কিন্তু এই বসুধারার দৃশ্য অন্য রকমের। একটু জলের ছিটা লাগিলে শরীর কাঁপিতে থাকে। একটু উপরে বাবা কালী কমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। একজন সাধু এই ধর্ম্মশালায় থাকেন। পুরাণে লেখা আছে, যে পাপী তাহার শরীরে জলের ছিটা পড়ে না।

যেহ শুদ্দ পিতৃজাঃ পাপাঃ পাষণ্ড মহিবৃত্তয়ঃ।
ন তেষাং শিরসি প্রায়ঃ পতন্ত্যপঃ কদাচন॥

এইবার আমাদের তাড়াতাড়ি মানাগ্রামের রাস্তা ধরিয়া যাইতে হইবে। মানা গ্রাম এইখান হইতে তিন মাইল দূর। পুরাণে লিখিত আছে, অষ্টবসুকে সঙ্গে করিয়া নারদমুনি এইখানে আসেন। তাঁহারা নারদের নিকট বদ্রীনারায়ণের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া ত্রিশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে থাকেন। তৎপর ভগবান নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের দর্শন দিয়া পরাভক্তির বরদান দিয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন; তাহার পর হইতে এইস্থান পরম পবিত্র ত্রিলোক খ্যাত এই বসুধারা তীর্থে পরিণত হয়। আমি অনুরোধ করি, যদি কোন ভাগ্যবান লোক শ্রীবদ্রীনারায়ণে যান, তবে অবশ্যই বসুধারা তীর্থের দর্শন করিবেন। ইহার পর আরও অনেক তীর্থ আসিবে। প্রথম মানসোধভেদ তীর্থ। তৎপর কেশব প্রয়াগের দর্শন হইবে। মানস্যোদ্‌ফেন তীর্থ ভীম শিলার সম্মুখে। বসুধারা এবং সরস্বতীর ধারে ধারে চলিলে, ভগবতী অলকনন্দা ও সরস্বতীর সুন্দর মিলন দর্শন হইবে। কেদার

খণ্ডে ইহাকে কেশব প্রয়াগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ইহার কিছু দূরে সম্যপ্রাস 'তীর্থ দর্শন হইবে। বসুধারার পশ্চিম তটে সম্যপ্রাস তীর্থ, এইখানে ভগবান শ্রীবেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ পারায়ণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস এই আশ্রম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাস বদরীখণ্ড মণ্ডিতে।"

এইখান হইতে ব্যাস গুহা এবং গণেশ গুহার দর্শন হইবে। ভীম শীলার উপর হইতে মানাগ্রামের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে এক গুহা দেখা যাইবে; ইহাকে ব্যাস গুহা বলিয়া থাকে। শুনা যায় ভগবান বেদব্যাস এই পবিত্র গুহায় বসিয়া সমস্ত পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন।

মুচুকুন্দ গুহা।

যেই দিকে ব্যাস গুহা ঐ পর্ব্বতের শিখরভাগে এক গুহা দেখা যাইবে, উহাকে মুচুকুন্দ গুহা বলিয়া থাকে। যে সময়ে কালিয় যবন নামক মহাদুষ্টকে ভগবান্ বিষ্ণু দৃষ্টি দ্বারা ভস্ম করিয়াছিলেন তাহা এই গুহা মুচুকুন্দর উপর ব্রহ্মার বর ছিল অসময়ে যদি কেহ তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করে এবং তোমার দৃষ্টি যাহার উপরে পড়িবে, সে যে কেহ হউক না কেন, তখনই ভস্ম হইয়া যাইবে। মুচুকুন্দ মহারাজ ব্রহ্মার নিকট হইতে নিদ্রা যাইবার জন্য বর নিয়া এই গুহায় নিদ্রা যাইতেছিলেন,

শ্রীকৃষ্ণ ছলনা করিয়া এই গুহায় সেই দুষ্ট কালিয় যবনকে পাঠাইয়াছিলেন ও তথায় মুচুকুন্দ মহারাজের অকাল নিদ্রাভঙ্গ করিতে গিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছিল বলিয়া এই গুহার নাম মুচুকুন্দ গুহা হইয়াছে। গুহা খুব বড় নয়, অনেক নিম্নে নামিলে দেখা যাইবে বড় বড় পাথরখণ্ড সব পড়িয়া গুহাটী ভিজা ভিজা বর্ষার জল বোধ হয় ভিতরে পড়ে। ভিতরে ৮।১০ জন লোক অনায়াসে থাকিতে পারে। গুহাব ভিতর বহু যজ্ঞ হবণাদি হইয়াছে এরূপ চিহ্ন সব দেখা যায়। পরে জানা গেল, মানা গ্রামের মারচারা এই গুহায় প্রায় কোন বড় উৎসবের সময় আসিয়া যজ্ঞ হবণাদি করিয়া থাকে। শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে বহু লোক দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। অতি সুন্দর এই গুহাটী।

কলাম গ্রাম।

মুচুকুন্দ গুহা হইতে পশ্চাৎভাগে এক মাঠ দেখা যাইবে, ইহাও হিমালয়ের একটী সমতল ভূমি, নিম্নদিকে ভগবতী মা সরস্বতীর নির্ম্মল ধারা অতি সুন্দর। অন্য পার দিয়া তিব্বতের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, আমি এই রাস্তা ধরিয়া তিব্বতে গিয়াছিলাম, শুনা যায়, এই কলাম গ্রামে গুপ্তরূপে অনেক যোগী, ঋষি আদি থাকিয়া তপস্যা করেন। কোনও পুণ্যশালী লোকের দর্শনও হইয়া থাকে। স্থান অতি রমণীয়, চতুর্দ্দিকে

চির-তুষার মণ্ডিত শ্বেতবর্ণ বরফের পর্ব্বত উচ্চ শিরে দাড়াইয়া রহিয়াছে, সংসার ত্যাগী মহাপুরুষের তপস্যা করিবার এত সুন্দর স্থান খুবই কম দেখা যায়।

চতুর্ব্বেদ ধারা।

অনুক্রমেণ তিষ্ঠন্তি বেদাশ্চত্বার এব চ।
ঋগ্যজুঃ সামাথর্ব্বখ্যা ভগবৎ পার্শ্ববর্ত্তিনঃ॥

(স্কঃ পুঃ)

অর্থাৎ—চারবেদ,—ঋগ, যজু, সাম, অথর্ব্ব। এইক্রমে ভগবান্ এই চারি ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি অতি নিকটেই থাকেন। অজ্ঞানাবরণের জন্য সাধারণের দর্শন সহজে হয় না।

কলাম গ্রাম হইতে সীধা মানা গ্রামে আসিবার পর আর কোন গ্রাম নাই। এই ভারতের অন্তিম গ্রাম, ইহার প্রাচীন নাম মণিভদ্রপুর। এইগ্রামে হুণিরা ও মারচা লোকের বসবাস। ইহাদের যাবতীয় ব্যবসাবাণিজ্য সব তিব্বতের বৌদ্ধদের সঙ্গে করিয়া থাকে। এইখান হইতে গেঁহু, জেধ, ফাফর আদি লইয়া যায়, সেইখান হইতে উন, লবণ, চামর ও কম্বলাদি নিয়া আসে। ইহারা হিন্দুধর্ম্মকে মানিয়া থাকে। আল্‌মোরার আগেও অনেক মারচা থাকে। এই মানাগ্রাম হইতে সীধা বদরীপুরী যাইবার রাস্তা।

অলকানন্দার পুল পার করিয়া ইন্দ্র ধারা হইয়া বদরীপুরি চলিয়া যান। কিন্তু আমরা তীর্থ যাত্রী এত তাড়াতাড়ি যাইবার দরকার কি? একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়াই ভাল, সেই জন্য আমরা অলকানন্দার পুল পার করিয়া নর পর্ব্বতের ধারে ধারে সুন্দর রাস্তা, তেমন কোন প্রকারের কষ্টকর নয়। দুই মাইল মাত্র এইখান হইতে বদ্রীপুরি; দূর হইতে নর পর্ব্বতের সর্পাকৃতির মত চারিধারা দেখা যাইবে। এই ধারাকে চতুঃ স্রোতঃ ধারা বলিয়া থাকে। এইসব ধারা পার করিয়া আরও কিছুদূর যাইবার পর শেষ নেত্র, এই শেষ নেত্রের চিহ্ন এক শিলার উপরে তৈয়ার করা হইয়াছে। এইখান হইতে বদরীপুরির শোভা অতি চমৎকার। বদরীপুরির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং অলকানন্দার পুল পার করিয়া উচ্চস্বরে সবে মিলিয়া বলেন,—বদরী বিশাল লাল কী জয়; এবং স্বর্গারোহণ সত্য পথ কী জয়, এখন সকলে যার যাহা নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আরামের সহিত গল্প করিতে থাকেন।

ত্রয়োদশ খণ্ড

পঞ্চ বদরী

বিরঞ্চি শঙ্করাদিভিস্তপস্ সমৃদ্ধি পূর্ব্বকম্।
নিবাতবমনষ্টয়ে বিশিষ্টয়ে চ শর্ম্মনাম্॥
সমর্থিতো বভুব যঃ স ধর্ম্মমূর্ত্তি মন্দিরে।
বদরীশ্বরঃ প্রভু করোতু মঙ্গলং সদা॥

যেই রকম পঞ্চ কেদার ও পঞ্চ প্রয়াগ আছে, তদ্রূপ পঞ্চ বদরী ও প্রসিদ্ধ আছে (১ম) বিশাল বদরী (বদরীনাথধামকে বলে) (২য়) যোগ ধ্যান বদরী (পাণ্ডুকেশ্বর) (৩য়) ভবিষ্য বদরী (সুভাইয়ে) (৪র্থ) বৃদ্ধ বদরী (আণীমঠে) (৫ম) ধ্যান বদরী (উর্গমে) কিন্তু পুরাণে পঞ্চ বদরীর বিষয় কোথাও লেখা নাই; তবুও ইহার অনেক প্রসিদ্ধি দেখা যায়।

পঞ্চ বদরীর বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত, কেহ কেহ বলেন, পঞ্চ কেদারের মতন দেখা-দেখি পঞ্চ বদরীর কল্পনা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন গড়ের রাজা তথা নরেশেরা নিজে নিজের রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে বদরীনাথ ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসিদ্ধি করিয়াছেন। এই কথাই আমার বিশ্বাস হয়, কেননা আমি এই পঞ্চ বদরীর অতিরিক্ত আরও অনেক বদরীনাথের মন্দির দর্শন করিয়াছি। যেমন কর্ণপ্রয়াগ হইতে রাণী খেত, যাইবার রাস্তায় আদি বদরীর মন্দির অতি সুন্দর ও বিশাল মূর্ত্তি, টিহরী রাজ্যেও বদরীনাথের সুন্দর মন্দির বিদ্যমান, ঋষিকেশেও আদি বদরীর মন্দির, নৈমিষারণ্যে ও বৃন্দাবনে, কাশীতে আদি বদরীর মন্দির বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ বদরীর মধ্যে চারি বদরীর কোন নিজস্ব সম্পত্তি নাই। কেবল বদরী বিশালের রোজগারের দ্বারাই এই চারি মন্দিরের খরচাদি চলিয়া থাকে। যেমন ঘরের একজন রোজগার করে অন্য সব লোক মজা করিয়া

খায়, তদ্রূপ এই চারি বদরীনাথ ও তাহাই। এখন কোন্ কোন্ জায়গায় কোন্ মন্দির তাহা বর্ণন করিব। (১ম) বিশাল বদরী, যাহার দর্শনের নিমিত্ত হাজার হাজার যাত্রী প্রতি বর্ষ যাইয়া থাকে। (২য়) যোগ ধ্যান বদরী—পাণ্ডুকেশ্বরে, এই ধ্যান বদরী বা পাণ্ডুকেশ্বর অতি সুন্দর ও ভব্য মূর্ত্তি। এই মন্দির অতি প্র্যাচীন, এই মন্দির বদরীনাথের অধীনে; বদরীনাথের পূজারী ছয় মাস এইখানেই থাকেন, অবশিষ্ট ছয়মাস পূজা এইখানে হইয়া থাকে। বদ্রীনাথ এইখান হইতে ১১ মাইল দূর। যাত্রীরা একরাত্র এইখানে বাস করেন। (৩য়) ভবিষ্য বদরী যোশী মঠ হইতে এক রাস্তা নীতি ঘাটীর দিকে চলিয়া গিয়াছে, নীতি ঘাটী হইতে সিধা কৈলাসের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এইখান হইতে কৈলাস ১৩০ মাইল দূর, ৪০ মাইল পর্য্যন্ত ভারতের সীমারেখা, তাহার পর তিব্বতের সীমা। যোশী-মঠ হইতে ছয় মাইল দূরে "তপোবন", নামক স্থান অতি রমণীয়, এইখানে একটি তপ্তকুণ্ড আছে। জল বেশী গরম নয়, এই তপোবনেই ভবিষ্য বদরীর মন্দির, এই স্থান আমার খুবই ভাল মনে হইয়াছিল, ভবিষ্য বদরীর নিকটে লতা দেবীর মন্দির, শুনিয়াছি দেবীর মন্দিরে ২৪ বৎসর অন্তর খুব ভারী মেলা বসিয়া থাকে ও এই মন্দিরে অনেক পশু বলি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে নাকি নরবলিও হইত, এই মন্দিরের বিষয়ে আরও অনেক অলৌকিক কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি নাকি সময়

সময় অদৃশ্য হইয়া যান। মূর্ত্তি বেশী বড নয়, উচ্চতা ১ হাত পরিমাণ হইবে। (৪র্থ) বৃদ্ধ বদবী—এই মন্দিবেব বাস্তা তুই মাইল নিম্নে, তেমন কোন যাত্রী আদি যায় না। হেলঙ্গ চট্টি হইতে এক মাইল নিম্নে আনি মঠ নামক সুন্দব স্থান। ইহাব নিকট লক্ষ্মী নাবায়ণের অতি মনোমুগ্ধকব মূর্ত্তি বিবাজিত। (৫ম) ধ্যান বদবী হেলঙ্গ চট্টি হইতে বাম দিকে অলকানন্দাব পুল পাব হইয়া যাইবাব পবে ছোট একটি বাস্তা পাওয়া যাইবে। তিন মাইল কঠিন চড়াই ও উৎবাই কবিলে কল্পশ্বেবে মন্দির, ইহাই পঞ্চ কেদারেব এক কেদাব, এই খানেই ধ্যান বদবীর মন্দিব, আমি কয়েক দিন এইখানে ছিলাম, এই ধ্যান বদরীতে ঠিক্ যেন জল, বায়ু, বৃক্ষ লতাদি সমস্তই ধ্যানে মগ্ন হইয়া বহিয়াছে। প্রকৃতি দেবী যেন এই স্থানে পবম শান্তিতেই নিবাস করিতেছেন। মন কল্পকাবী দেবাদিদেব মহাদেব জীবগণকে কল্প কল্প হইতে তাঁহার অভয় হস্তে সব কামনা পূর্ণ করিতেছেন। তুরু হইতে হিমাদ্রি শিখরের চির তুবারাবৃত ধবল শিখরগুলি কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার কবিয়া বহু কল্প কল্প ধরিয়া উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটী বার দর্শনের নিমিত্ত পৃথিবীর কতলোক কত টাকা খরচ করিয়া ও শারিরীক প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া এই হিমরাজের শিখর দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন, তাহার কোন ইয়ত্তাই নাই। কত যুগ যুগান্তর হইতে এই হিমালয়ের উচ্চ শিখর যেন আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কত বৃষ্টি, কত তুষার পাত, কত বজ্রপাত

দিবা নিশি হইতেছে। তবুও নির্ভীক্ অবস্থায় স্থিরভাবে রহিয়াছে, একটুও ক্ষয় নাই একটুও বিচলিত নয়, কেননা হিমরাজ যদি একটুও বিচলিত হয়, তবে সমস্ত সংসার ইহার উপরে নির্ভর করে বলিয়া কলির ক্ষুদ্র জীব তাঁহাকে কি দিয়া সেবা করিবে। কেবল মাত্র প্রণাম ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। সেইজন্য কলির ভক্তিহীন, শক্তিহীন জীব তোমার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করি।

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্দ্দশ খণ্ড

শ্রীবদ্রীকাশ্রম যাত্রা

হরিদ্বার হইতে ঋষিকেশ

ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ মুনিনাং ব্রহ্মবাদিনাং।
তেষাংঞ্চ মহতাং দেবো মহাদেবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
বিশ্বস্থানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মহাতামিশ্বর স্বয়ং।
মহেশ্বরঞ্চ তেনেমং প্রবদন্তি মণিষীণং॥
শিবমদ্বৈতং তুরীয়ং মন্যতে।
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

শ্রীবদ্রীনাথের যাত্রা হরিদ্বার হইতে আরম্ভ হয়, হরিদ্বারের নাম, হরদ্বার, হরিদ্বার, গঙ্গাদ্বার, স্বর্গদ্বার, কুশাবর্ত্ত তথা

মায়াপুরি ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ। হরি-বদরীনারায়ণের দ্বার, এইজন্য হরিদ্বার, হর-কেদারনাথের দ্বার, সেইজন্য হরদ্বার, আর গঙ্গাদ্বার প্রত্যক্ষ স্বর্গদ্বার, স্বর্গারোহণ করিবার দ্বার। এইখান হইতে পতিত পাবনী ভাগীরথী মা গঙ্গা সমতল ভূমিতে পড়িয়াছে। নৌকায় করিয়া গঙ্গাপার স্বর্গাশ্রম যাইবাব সময়ে যেন মনে হয় গঙ্গা পাহাড়ের দরজা তৈয়াব করিয়া বাহির হইতেছে। দত্তাত্রয় মুনির পূজার কুশা গঙ্গা ভাসাইয়া নিয়া যাইতেছিল, পরে মুনির শাপের ভয়ে তাহার আবর্ত্ত সহিত ফিরাইয়া কুশাদত্ত ভগবানের নিকট আসিয়াছিল বলিয় কুশাবর্ত্ত নাম হইয়াছে। অতি পুণ্যদায়ী পবিত্রসপ্ত পুরির কথা পুরাণে উল্লেখ করিয়াছেন—

অযোধ্যা-মথুরা-মায়া-কাশী-কাঞ্চি-হ্যবন্তিকা।
পুরী-দ্বারাবতী জ্ঞেয়া, সপ্তেতে মোক্ষ দায়িকা॥

এই সপ্ত পুরীর মধ্যে মায়াপুরির মাহাত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এইজন্য ইহার অন্য নাম স্বর্গদ্বার বলিয়া থাকেন। এইখানে বহু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বাস করেন, অনেক আশ্রম, আখাড়া ও মঠ মন্দিরাদি আছে। অনেক মহাপুরুষ সূক্ষ্ম দেহে ও বৃদ্ধ বেশে আসিয়া থাকেন। ভাগ্যবান্ পুরুষের সময় সময় দর্শনও হইয়া থাকে। যেই তীর্থে সাধু সমাগম হয় সেই স্থান তখনই পরম পবিত্র হয়, জল, স্থল, ও সাধু মাহাত্ম্য মিলিয়া তবে তীর্থ মাহাত্ম্য হয়। সেইজন্য এই মায়া

পুরীর মাহাত্ম্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেননা এইখানে বহু সাধু সন্ন্যাসী তপস্যা করিতে থাকেন। এইখানে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ করিয়াছিল, শিবহীন যজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া সতী পতিনিন্দা করাতে পিতার যজ্ঞ কুণ্ডে দেহ ত্যাগ করেন। কনখলে দক্ষশ্বরের মন্দির ও নীল ধারায় স্নান অতি পূণ্যদায়ী তীর্থ বিদ্যমান। মৈত্রয় মুনি এই খানেই বিদুরজীকে ভাগবৎ কথা শুনাইয়াছিল।

গঙ্গা দ্বারোত্তরং বিপ্র স্বর্গভূমিঃ স্মৃতা বুধৈঃ।
অন্যত্র পৃথিবী প্রোক্তা গঙ্গা দ্বারোত্তরং বিনা॥

হরিদ্বার হইতে উত্তরের ভূমিকে বিদ্বানেরা স্বর্গদ্বার বলেন।

ইদমেব মহাভাগ স্বর্গদ্বার স্মৃতা বুধেঃ।

এই স্থানকে বুদ্ধিমান জ্ঞানী মহাত্মারা স্বর্গদ্বার বলিয়া থাকেন।

গঙ্গাদ্বারে তথা কাশ্যাং গঙ্গা সাগরে সঙ্গমে।
ণ তেষাং পুণরাবৃত্তিঃ কল্প কোটি শতৈরপি॥

হরিদ্বার, গঙ্গাসাগর এবং কাশীধামে যেই ব্যক্তি নিবাস করেন, তাহার কোটি কোটি কল্পেও পুনরাবর্ত্তন হয় না।

দৃষ্টা মায়াপুরিং পুণ্যাং স্নাত্বা চ ব্রহ্ম মন্দিরে।
বারানসী লভে দত্তে সত্যং সত্যং হি নারদ॥

পরম পবিত্র মায়াপুরি দর্শন এবং ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে, "হে নারদজী! অন্ত সময়ে তাহার নিশ্চয় পরমাগতি লাভ

হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই"। স্টেশনের নিকটে বিল্বকেশ্বরের মন্দির। হরিদ্বারকে পঞ্চপুরিও বলা হয়, হরিদ্বার, মায়াপুর, কনখল, জ্বালাপুর এবং ভীমগোড়া এই পঞ্চ-পুরি বলে। সরকারী প্রবন্ধে পঞ্চ পুরীর একই নগর সমিতি। বার বৎসর অন্তর পূর্ণ কুম্ভের স্নান ব্রহ্ম কুণ্ডে হইয়া থাকে। বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে এবং সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করিলে তখন হরিদ্বারে কুম্ভ স্নান হয়।

মকর কর্কট সংক্রান্তিতে চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহণে ব্যতিপাত অমাবস্যা, সোমবতী অমাবস্যা ও পূর্ণিমা, কার্ত্তিক এবং বৈশাখে "হে মুনিশ্বর সাড়ে তিন কোটি তীর্থ পরম পুণিত হরিদ্বারে নিবাস করেন। উক্ত সময়ে হরিদ্বারে স্নান করিলে সম্পূর্ণ তীর্থ স্নানের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হরিদ্বারের শোভা সন্ধ্যার সময়ে দেখিবার যোগ্য। অনেক ধর্ম্মশালা আছে। ভোলাগিরির ধর্ম্মশালা বাঙ্গালীর একটি প্রতিষ্ঠান। কুশাবর্ত্ত ঘাট, সপ্ত সরোবর শ্রবণ নাথ মন্দির, মায়াদেবীর মন্দির, পাহাড়ের উপরে মনসাদেবীর মন্দির, গঙ্গাপার চণ্ডীদেবীর মন্দির, গুরুকুল বিশ্ব বিদ্যালয়, ঋষিকুল বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় সতী কুণ্ড আদি অনেক দর্শনীয় তীর্থ ও দৃশ্য সব দেখিবার মতই। এইখান হইতে বদ্রীনারায়ণ ১৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত। যাত্রার যত আবশ্যকীয় দ্রব্য এইখান হইতে খরিদ করিয়া লইতে হয়। এইবার চলেন ঋষিকেশ মোটরে, টাঙ্গায়, রেলে, সব রকমের

সুবিধা আছে। হাঁটিয়া যাইতেও পারেন, কেবল মাত্র ১৫ মাইল রাস্তা, এক মাইল আগে ভীম গোড়া দেখা যাইবে। ইচ্ছা হয় ভীমকুণ্ডে স্নান করিতে পারেন, নতুবা কেবল দর্শন করিয়া নিন্। ইহার পর সত্যনারায়ণের মন্দির সাত মাইল দূরে, নিকটে রায়ওলা স্টেসন্ ও জংসন। আট মাইল দূরে ঋষিকেশ।

ঋষিকেশ--হরিদ্বার হইতে ১৫ মাইল দূরে। ডেরাডুন্ জিলার অন্তর্গত। হরিদ্বার সাহারাণপুর জিলার অন্তর্গত। ঋষিকেশের জমিদার শ্রীভরত মন্দিরে মহন্তের অধীনে। ভরত মন্দির, বাঙ্গালীর শিবালয়, ত্রিবেণীর ঘাট, উপরে শ্রীরামের মন্দির, বাবা কালিকমলীর ধর্ম্মশালা, অন্নছত্র, পাঞ্জাধার ধর্ম্ম-শালা, ও অন্নছত্র, এবং আরও অনেক ধর্ম্মশালা আছে। জুতা, লাঠী, কম্বলাদি লইয়া শীঘ্রই যাত্রার আয়োজন করুন। যদি মোটরে যাইতে হয় তবে শীঘ্রই টিকিট করিয়া বসিয়া যান্। পরদিন শ্রীনগরের কীর্ত্তি নগর হইয়া পৌঁছিতে পারেন। নতুবা হাঁটিয়া যাইবার ইচ্ছা হয়, এবং যদি হিমালয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছা হয় তবে হাঁটিয়া চলুন।

ঋষিকেশ হইতে লক্ষণঝোলা তিন মাইল। যদি ইতি পূর্ব্বে পাহাড়ের যাত্রা না করিয়া থাকেন, তবে লক্ষণঝোলা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইবেন। লক্ষণঝোলা লোহার তারের দ্বারা গঙ্গার উপরে এপার হইতে ওপার ঝোলার মতন

পুল। ইহার উপর দিয়া চলিবার সময় একটু একটু দোলে। পূর্ব্বে দড়ির পুলই ছিল। লক্ষণের মন্দির পুলের নিকটে বলিয়া ইহাকে লক্ষণ ঝোলা বলা হয়। এক ধর্ম্মশালা ও একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। পূর্ব্বে ঘোর জঙ্গল ছিল বর্ত্তমানে এক ছোট হাট বাজারের আকারে পরিণত হইয়াছে। এখন যদি পরপারে স্বর্গাশ্রম দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে পূল পার হইয়া দেখিতে পারেন, বর্ত্তমানের অবস্থা শোচনীয়, তেমন কোন প্রবন্ধ না থাকাতে সাধু তেমন থাকেনা। এইবার আপনি নিশ্চিন্তরূপে বদরীনাথের রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছেন। পিছনে দেশ, সম্মুখে হিমালয়ের উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত। এইবার মনে মনে প্রণাম করিয়া লক্ষণ ঝোলার পুল পার হইয়া আগের মার্গে চলুন।

গরুড় চট্টি—লক্ষণঝোলা হইতে দুই মাইল, অতি সুন্দর অনুপম স্থান। বদ্রীনাথ যদি না যাইবার হয়, তবে ঋষিকেশ হইতে একবার ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার দৃশ্য অবশ্য দেখিয়া আসুন। প্রায় এক মাইলের উপরে আম বাগান, কলার বাগান। সুন্দর ঝরণা ও কুণ্ড, গরুড় ভগবানের দর্শন করিয়া লওয়া ভাল। ইনিই আমাদের বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত সঙ্গি হইবেন। তাঁহার পবিত্র পাখার হাওয়া করিতে করিতে আমাদের লইয়া যাইবেন। দেখিবেন সব যাত্রী এক সঙ্গে বলিবে শুনিতে পাইবেন, বোল গরুড় ভগবান কী জয়। এইবার আগের মার্গে চলুন, একটি কথা আমাদের সদা মনে রাখিবেন, নিত্য প্রাতঃ

৮৷১০ মাইলের অধিক চলা হইবে না। শ্রীবদ্রীনাথের যাত্রীর কখনও বিশ্বাস করিবেন না। কেননা দেশ ছারিবার পর হইতে তাহাদের মাথায় এক ধুন লাগিয়া যায়, নিজের আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব ইষ্ট, মিত্র সব লোকের মোহ মমতা পরিত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, কেবল এক কথা আগের চট্টি কত দূর। এমন কি নিজের শরীরের প্রতিও নিষ্ঠুর হইয়া যায়। সুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়া দেয়। তাহার জীবনের যেন এক লক্ষ্য হইয়া যায়, কোন প্রকারে শ্রীবদ্রীনাথ দর্শন, যদি কোন সঙ্গির রোগ হইয়া যায় কোন পরবাই নাই। কেহ যদি শ্রান্ত হইয়া যায় অথবা আঘাত লাগে তার জন্যও দাঁড়াইবেনা। ডাণ্ডী, কাণ্ডী, ঘোড়া ঔষধাদি সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারে কিন্তু যাত্রা বন্ধ হইবে না। শীঘ্র শীঘ্রই যাত্রা সমাপ্তি করিতে হইবে। আমার অপেক্ষা করা হইবে না। আমি স্বয়ং একাকী দশ দিনের মধ্যে বদ্রীনারায়ণ পৌঁছিয়াছিলাম। ঋষিকেশ হইতে বদ্রীনারায়ণ ১৬৯ মাইল দূর। এইবার আগের চট্টিতে চলুন।

নাই মোহন চট্টি—ঋষিকেশ হইতে সাড়ে বার মাইল। গরুর চট্টি হইতে ফুলবাড়ী দুই মাইল। এইখান হইতে হিমবতী ও গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। অতি মনোহর পর্ব্বতের দৃশ্য। লক্ষণঝোলা হইতে দক্ষিণ ধারে ধারে যাইতে হয়। প্রায় রাস্তা নদীর কিনারে হয়। মধ্যে মহাদেবসৈন চট্টি

আসিবে। এইখানে কালী কমলীর একটী ধর্ম্মশালা আছে। ইহার আধ মাইল দূরে নাই মোহন চট্টি। চারি পাঁচ খানি মুদির দোকান আছে, রমণীয় স্থান।

১৪ মাইল দূরে নাই মোহন হইতে মহাদেব চট্টি। হরিদ্বার ৪০॥ মাইল দূরে। এবার পাহাড়ের যাত্রার আনন্দ আসিবে। এখান হইতে চড়াই আরম্ভ হয়। এত কঠিন চড়াই ও উতরাই, যাত্রীরা পূর্ব্বদিনে দেখিয়া ভয় পাইয়া যায়। যেন চড়াইয়ের অন্ত নাই। ছোট বিজনী, ও বড় বিজনী, নৌড়াখান, কুণ্ডর বন্দর আদি ছোট ছোট চট্টি রাস্তায় আসিবে। এই সব চট্টিতে দুই চারিখানি দোকান আছে। যদি পথশ্রান্ত হন্ তবে গরম গরম দুগ্ধ খাইয়া নিতে পারেন। সন্ধ্যার সময়ে মহাদেব চট্টিতে রাত্রি যাপন করা যাইবে। এখানে বেশ ভাল ধর্ম্মশালা, শিবালয়, কয়েকখানি দোকান আছে। এক মাইল দূরে ডাক বাংলা আছে। গঙ্গা অতি নিকটে প্রবাহিত হইতেছে। ৯ মাইল চট্টি হইতে ব্যাস ঘাট, হরিদ্বার ৫০ মাইল রাস্তা, তাহার পর পুনঃ চড়াই আরম্ভ হয়। এক মাইল চড়াই করিবার পর, উখল ঘাট, সিমলাখণ্ড, কাঞ্জী চট্টি আসিবে। দিনের আহার এখানে তৈয়ার করিয়া নেওয়া ভাল। জলের খুব আরাম। একটী গোপালের মন্দির আছে। ছোট একটী ধর্ম্মশালাও আছে এবং একটী হাসপাতাল আছে। এখান হইতে ব্যাস ঘাট তিন মাইল দূর। রাস্তা বেশ ভাল। ব্যাস ঘাট পরম রমণীয় স্থান,

গঙ্গা একেবারে নিকটে। কালী কমলীর ধর্ম্মশালা, অনেক দোকানাদি আছে। বৃত্তাসুরের ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র এখানে আসিয়া শিবের আরাধনা করেন। শিব সন্তুষ্ট হইয়া বৃত্তাসুর কে মারিবাব পন্থা বলিয়া দিয়াছিলেন। নব কলিকা নদী গঙ্গার ধারে মিলিত হইয়াছে। এইজন্য ইহার এক নাম ইন্দ্র প্রয়াগও বলে। বেশ বড় জায়গা। বাধঘাট ও পৌড়ি হইতে দুই রাস্তা এইখানে মিলিত হইয়াছে। পরপারে ব্যাস দেবের এক ছোট মন্দির আছে। ৮॥ মাইল ব্যাস ঘাট হইতে দেব প্রয়াগ। হরিদ্বার ৫৯ মাইল। দেব প্রয়াগ পর্য্যন্ত সুন্দর বাস্তা। এক মাইল দূরে সাক্ষী গোপাল। যেমন শ্রীজগন্নাথ যাইবার সময় সাক্ষী গোপালের দর্শন না করিলে যাত্রা ব্যর্থ হয়। তদ্রুপ এইখানেও সাক্ষী গোপাল দর্শন করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে ছোট কয়েকখানি চট্টি আসিবে। ছালুড়ী, উমরাশু, সৌতু আদি চট্টি পার করিবার পর দেব প্রয়াগ আসিয়া বিশ্রাম করুন। পর্ব্বতের দুইধারের দৃশ্য অতি মনোরম। এই দেব প্রয়াগ অতি রমণীয় স্থান। বদ্রীনাথ যাইবার সময় দেব প্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ, নন্দ প্রয়াগ, ও বিষ্ণু প্রয়াগ নামক পরম পাবন এই সব প্রয়াগ আসিবে। এইখানে ভাগীরথী ও অলকানন্দার সুন্দর সঙ্গম। শোভা অনুপম দৃশ্য নয়নাভিরাম, সঙ্গমের দৃশ্য অকথনীয়, দেব প্রয়াগের দুইদিকে বস্তি আছে। অলকানন্দার এই পারে হিন্দ, গাড়বল, অন্যপারে টিহরী রাজ্য, মধ্যে কেবল মাত্র পুল, এইখানে

কালিকমলীর সুন্দর ধর্ম্মশালা, ডাকঘর, ডাকবাংলা ও একটি বাজার আছে। যাত্রার প্রথম তীর্থ এই দেব প্রয়াগ বদ্রীনাথের পাণ্ডারা প্রায় এইখানে থাকে। সাবধান! কখনও পাণ্ডাদের সঙ্গি হইবে না। কোন প্রকারের ভয়ের কারণ নাই। যাত্রার প্রথম তীর্থ বলিয়া অনেকে ২।৩ দিন বাস করে। পরপারে রঘুনাথজীর এক প্রাচীন মন্দির আছে। মূর্ত্তিখানি অতি সুন্দর ও বিশাল। দেব প্রয়াগে চারি দিকে চারি শিব মন্দির। ইহাকে ক্ষেত্রপাল বলা হয়। কেদার খণ্ডে দেব-প্রয়াগের অনেক মাহাত্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কোন দেব শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি ভগবান দর্শনের নিমিত্ত ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম দেব প্রয়াগ হইয়াছে। এইখান হইতে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। যমুনোত্রী এইখান হইতে ৯৯ মাইল। আর গঙ্গোত্রী ১৩৫ মাইল। টিহরী রাজধানী ৩০ মাইল। দুই নদীর উপরে সুন্দর পুল। প্রায় ৫০০।৬০০ পাণ্ডার বসবাস। প্রবাদ আছে এইখানে দশরথজী তপস্যা করিয়াছিলেন। এই জন্য এই পর্ব্বতের নাম দশরথ পর্ব্বতও বলিয়া থাকে। এইখানে প্রতি বৎসর বসন্ত পঞ্চমীতে খুব বড় মেলা বসিয়া থাকে। এইবার দেব প্রয়াগ তীর্থকে প্রণাম করিয়া আগের চট্টিতে চলুন।

(৯মাইল) দেবপ্রয়াগ হইতে রাণী বাগ, (হরি ৮৬ মাঃ)

দেবপ্রয়াগ হইতে অলকানন্দার কিনারে কিনারে চলিতে

হইবে। যেই যাত্রী এখান হইতে গঙ্গোত্রী যায়, তাহাদের ভাগীরথীর কিনারে কিনারে যাইতে হয়। ভাগীরথী গঙ্গা এইখান হইতে ছুটীয়া যায়, অলকানন্দার কিনারে কিনারে একেবারেই সীধা রাস্তা এমনকি সাইকেল্ চালাইয়াও যাওয়া যায়। দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যদি সঙ্গি থাকে তবে গল্প করিতে করিতে মার্গ অতিক্রম করেন। অলকানন্দা অনেক নিম্নে দেখা যাইবে, পরপারে টিহরী রাজ্যের কীর্ত্তি নগরের রাস্তা দেখা যাইবে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মার্গ চলিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে অনেক ছোট ছোট চটি আসিবে, বিদ্যাকুটী সীতকুটী পার করিবার পর রাণীবাগ চটী, সাধারণ চটী, খাদ্যাদি সব পাওয়া যায়। একটী ডাকবাঙ্গলা আছে, দিনের আহার করিয়া এইখান হইতে এইবার আগের চটিতে চলেন।

(১১ মাইল) রাণীবাগ হইতে শ্রীনগর (হরি ৭৯ মাঃ)

তিন মাইল দূরে রামপুর, ৪ মাইল দুরে দিগোল চটী, দুই মাইল দুরে ভিল্লকেদারের মন্দির। রাস্তা হইতে কিছু উপরে। পঞ্চ পাণ্ডবের বনবাসের সময় অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্রের জন্য শিবের ঘোর তপস্যা করেন। তখন শিব ভীলের (কিরাত) রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সম্মুখে আসেন। কিন্তু অর্জ্জুন সাধারণ ভীল মনে করিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তাঁহার সঙ্গে করিতে থাকেন, যখন অর্জ্জুন দেখিলেন তাঁহার অস্ত্রে কিরাতের এক লোমও বাঁকাইতে পারিতেছেনা, তখন শ্রান্ত হইয়া শিবের পূজা করিতে লাগিলেন। পূজার মত

উপচার সমস্তই সেই কিরাতরূপী লোকটীর শ্রীচরণ কমলে পতিত হইয়া রহিয়াছে। অর্জ্জুন তখন বুঝিল, ইনি কোন সামান্য ভীল নয়, ইনি নিশ্চয় আমার আরাধ্য দেবতা শিব, এই ভাবনা করিয়া তাঁহাকে স্তুতি আদি করিতে থাকেন, শিব তখন প্রসন্ন হইয়া নিজ স্বরূপে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। অর্জ্জুন তাঁহার শ্রীচরণে পড়িয়া পাশুপতাস্ত্র ও সমরে বিজয় হইবার বর প্রার্থনা করেন। শিব তখন "তথাস্তু, বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। কবিরা কিরাত অর্জ্জুনের বিষয় অতি সুন্দর ও ললিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। ভিল্ল কেদারের নিকটে খাণ্ডব নদী অলকানন্দায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে, ইহার নাম শিব প্রয়াগ বলিয়া থাকে, কিছুদূরে শ্রীনগর, রাস্তায় শঙ্কর মঠ দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাম ভাগে কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির ছুটীয়া যায়।

শ্রীনগর

এই নগর অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান, শুনা যায় জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীমন্ত্রের উপর এই নগর স্থাপন করিয়াছেন। অলকানন্দায় শ্রীচক্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। গরবালের রাজধানী পূর্ব্বে শ্রীনগরেই ছিল। সং বৎ ১৯৫১ যখন নদীতে বন্যা আসে, তখন পুরাণ শ্রীনগর ভাসাইয়া লইয়া যায়। তার পর এই নগর নির্ম্মান হইয়াছে। এই বন্যার বিচিত্র ইতিহাস, প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজমহল, গৈরোলা মঠ, শ্রীবদ্রীনাথ মঠ,

কেশোরায় মঠ, জৈনিদের মঠ, আরও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আদি সব ভাসাইয়া নিয়া যায়। কেবল মাত্র শঙ্কর মঠ ও কমলেশ্বরের মন্দির বাঁচিয়া গিয়াছিল, ইহার অন্য নাম শ্রীক্ষেত্রও বলিয়া থাকে। সত্যযুগে সত্য কন্ধ নামক কোন রাজা ছিলেন, কোলাস্থর নামক এক দৈত্য ভয়ানক উৎপাত করিতে থাকে, তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহারাজ শ্রীযন্ত্রের স্থাপনা করিয়া অলকানন্দার মধ্যে মহামায়া ৺দুর্গা দেবীর আরাধনা করেন। দুর্গা ভবানী প্রসন্ন হইয়া, তাহাকে বর দিয়াছিলেন। ভগবতীর বর পাইয়া মহাবলবান্ কোলাসুরকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন, তখন হইতে ইহার নাম শ্রীক্ষেত্র হইল। অলকানন্দা এইখানে ধনুর আকারে বাঁকাইয়া গিয়াছে। সেইজন্য ইহাকে ধনুষ তীর্থও বলিয়া থাকে। এইখানে একটী ভগবান্ বিষ্ণুর মন্দির আছে, ইহার নাম শঙ্কর মঠ নামে পরিচিত।

কমলেশ্বরের শিব মন্দির অতি প্রাচীন, একেবারেই অলকানন্দার তীরে অবস্থিত। ভগবান্ কমলেশ্বরের মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর, সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। শ্রীনাগেশ্বর এবং কসমর্দ্দিনী হনুমান, গৈরালা মঠ, ঠাকুরদ্বার, পাঠশালা, ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল ও কালিকমলীর ধর্ম্মশালা এবং কুলিজ এজেন্সীর প্রবন্ধ আছে। পূর্ব্বে এইখানে কাচারী আদিও ছিল, যখন হইতে পৌড়ি নামক স্থানে গরবালের রাজধানী স্থাপিত হয়,

তখন হইতে এই নগরের শোভা কিছু কম হইয়া গিয়াছে। শ্রীনগর একদিন তেজবীর্য্য সম্পন্ন নগর ছিল। এইখান হইতে অনেকটী রাস্তা, অনেক দিক দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোটদ্বার নামক রেল ষ্টেশন ৫৭ মাইল দূরে। গঙ্গোত্রী ১৩০ মাইল, যমুনোত্রী ১২০ মাইল, কেদারনাথ ৭৫ মাইল, বদ্রীনাথ ১০৮ মাইল, অন্ততঃ তিন রাত্র বাস এখানে করিয়া থাকে। প্রাতঃ কালে শ্রীনগরকে প্রণাম করিয়া আগের চট্টিতে চলেন। (৭॥০ মাইল) শ্রীনগর হ'তে ভট্টিসেরা, শ্রীনগর হ'তে একেবারে সীধা রাস্তা দু' ধারে আমের বাগান। এখান হ'তে অলকা-নন্দা একেবারে শান্ত, দুর হতে নগরের দৃশ্য অতি রমণীয় দেখায়, আগে শুকতারা নামক এক ছোট চট্টি আসিবে। কোন সময়ে ব্যাস নন্দন শুকদেব এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম শুকতারা হইয়াছে। ইহার কিছু আগে ফরাসু নামক এক গ্রাম আসিবে, এই গ্রামের প্রসিদ্ধি এখানে ভগবান পরশুরাম তপস্যা করিয়াছিলেন। গ্রামের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণ। এর পর ভট্টিসেরা চট্টি আসিবে, কালিকমলীর ধর্ম্মশালা, ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর এবং কয়েকখানী দোকান আছে, নিকটে জল, বড়ই আরামের স্থান।

(১১ মাইল) ভট্টিসেরা হইতে রূদ্রপ্রয়াগ।
এইখান হইতে বড় দুঃখদায়ক শক্ত চড়াই ও উতরাই আরম্ভ হয়,

এষ, নিষ্কণ্টকা পন্থা যত্র স পুজ্যতে হরিঃ।

হরিনাম করিতে করিতে চড়াই আরম্ভ করুন। কোন ভয় নাই। পুনঃ পুনঃ চড়াই উতরাই করিতে করিতে নরকোটা, পথ্যভয়া-খাল, গুলারায় আদি ছোট ছোট চট্টি সব আসিবে, ইচ্ছা হয় একটু বিশ্রাম করিয়া সামান্য জল পান করিয়া আস্তে আস্তে রুদ্র প্রয়াগে আসিয়া যান্।

রুদ্র প্রয়াগ

রুদ্র প্রয়াগের গ্রামের নাম পুনাড়। রাস্তার কিছু উপরে পুনাড় গ্রামের বস্তি। কিঞ্চিৎ আগে অলকনন্দার পুল। এইখান হইতে বদ্রী কেদারের রাস্তা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বদ্রীনাথের যাত্রী সীধা অলকানন্দার তীর ধরিয়া চলিয়া যাইতেছে। আর কেদারনাথের যাত্রী অলকানন্দার পুল পার হইয়া সঙ্গমের নিকটে আসিতেছে। এ সঙ্গমে বহু যাত্রী স্নান করিয়া থাকে। অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর অতি মনোরম সঙ্গম। দুই নদীর প্রখর ধারা। স্রোতের দিকে চাহিলে প্রাণে ভয় ধরিয়া যায়। দুই মাইল দূরে কোটীশ্বর মহাদেবের মন্দির, একেবারে অলকানন্দার তীরে বলিয়া দুর হ'তে অতি সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়, তিন মাইল দূরে শিবানন্দী চট্টি। প্রবাদ আছে—শিবানন্দ নামক কোন লোক গড়বালের মন্ত্রী ছিলেন, তাহার নামানুসারে এই গ্রামের নাম হইয়াছে। একটী বিষ্ণু মন্দির, ধর্ম্মশালা, ডাকঘর

দোকান ও জলের ভাল ব্যবস্থা আছে।

(১১ মাইল) শিবানন্দী হ'তে কর্ণ প্রয়াগ হরি ১১৬ মাঃ

শিবানন্দী হ'তে রাস্তা বেশ ভাল। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব মনোরম। ইহার দু' মাইল দূরে নগরাসু চট্টি। এক ডাকবাংলা আছে, ইহার পর কমৈরা চট্টি আসিবে। খুব দুগ্ধ পাওয়া যায়, ইচ্ছা মত দুধ খাইয়া নিন্। এক মাইল দূরে খুব বড় এক সমতল ভূমি আসিবে, এত বড় মাঠ আর এই পাহাড়ে দেখা যায় না। যখন বদ্রীনারায়ণে হাওয়াই জাহাজ চলিত তখন এখানে নামিত দু'খানী হাওয়াই জাহাজ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ব্যপারীর ক্ষতি হওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে মোটরের রাস্তা হইয়া গিয়াছে, এর দু' মাইল আগে পিপল চট্টি, কয়েকখানী দোকান আছে, বৈষ্ণবের এক মন্দির আছে। অতি মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কর্ণ প্রয়াগে আসিয়া যান্। অলকানন্দা একেবারে নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

কর্ণ প্রায়গ

পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে কর্ণপ্রয়াগ তৃতীয় প্রয়াগ, বেশ ছোট খাট পাহাড়ের মধ্যে একটী বাজার, ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল ডাকবাঙ্গলা স্কুলাদি আছে। এ স্থানের অনেক মাহাত্ম্য আছে, এখান হ'তে এক রাস্তা রাণীখেতের দিকে চলিয়া গিয়াছে

রাণীখেত এখান হ'তে ৬২ মাইল, ভিকিয়া সৈন ৫৫ মাইল, বামনগর ৩৮ মাইল। বর্ত্তমানে মটোর হওয়াতে খুবই সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন মটর ছিল না, তখন যাত্রীরা প্রায় এই পথে ফিরিত। বর্ত্তমান সময়ে কাঠ গোদম হ'তে রানীখেত হইয়া সিধা মটরে করিয়া কর্ণ প্রয়োগে আসে। পুরাণ কর্ণ প্রয়াগ ৫০ মাইল। ঐ নগর বন্যার সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নগর নতুন করিয়া বসান হইয়াছে।

কর্ণ প্রয়াগে পিত্তর নদী ও অলকানন্দার সুন্দর সঙ্গম দূর হইতে সঙ্গমের দৃশ্য বড়ই মনোরম। যেন ওঁকারের মত হইয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে। পিত্তর নদীর জল হইতে সঙ্গমের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। বাজারের মধ্যে কালিকমলীর ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। সঙ্গমের নিকটে উমাদেবীর মন্দির শিবালয়, মহাদাণী দাতা কর্ণের তপভূমি, উমাভবানীর আশ্রয় নিয়া কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে অজেয় হইবার নিমিত্ত সূর্য্যদেবের অরাধনা করিতে থাকেন, সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভেদ্য কবচ ও অক্ষয় তূণির দিয়াছিলেন। তখন হইতে এই স্থানের নাম কর্ণ প্রয়াগ হইয়াছে। সঙ্গমের যেই শব্দ শ্রুতঃ হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়, এইখানে স্নান দানের বড় মাহাত্ম্য। দৃশ্য ও অতি সুন্দর।

(১২মাইল) কর্ণ প্রয়াগ হইতে নন্দ প্রয়াগ। (হরিঃ ১২৮ মাইল)

কর্ণ প্রয়াগ হ'তে একেবারেই সীধা মার্গ। কোন প্রকারের

চড়াই উতরাই নাই। দুই মাইল দূরে উভট্টা চট্টি, পুনঃ নগাই চটি, দৃশ্য অতি সুন্দর। ১॥ মাইল দূরে সোননা চটি, এই সব ছোট ছোট চটি পার করিবার পর নন্দ প্রয়াগ আসিবে।

নন্দ প্রয়াগ

পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে নন্দ প্রয়াগ চতুর্থ, এখানে, ডাকঘর, তারঘর, ডাকবাংলা স্কুলাদি, ছোট ঘাট একটি বাজার আছে। কিছু দূরে স্থূল বদরী, বদরী ক্ষেত্র চারিরূপে বিরাজিত। স্থূল (নন্দ প্রয়াগ হইতে বিষ্ণু প্রয়াগ পর্য্যন্ত) নন্দ প্রয়াগে নন্দা ও অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে। এখানে কোন ধর্ম্মশালা নাই। এক রাস্তা গরূড় হইয়া আল্‌মোরা চলিয়া গিয়াছে। অতি ভয়ানক জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। আলমোরার যাত্রী প্রায় এই রাস্তা দিয়া আসে। গরূড় এখান হ'তে ৪৫ মাইল। গরূড় হ'তে মটরে করিয়া আলমোরা যাওয়া যায়।

আমি একবার এই রাস্তায় আলমোরা আসিয়াছিলাম। এখানে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন নাম মন্মথ নাথ পাল্‌ধি। এই নন্দ প্রয়াগে নন্দ নামক কোন রাজা যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। ইহার নামে নন্দ প্রয়াগ হইয়াছে। প্রাচীন নগর

বন্যায় ভাসাইয়া নিয়া গিয়াছে। বাজারের নিকটে লক্ষ্মী নারায়ণের একটী মন্দির আছে। নন্দ প্রয়াগের দৃশ্য একেবারেই শান্ত, দূর হ'তে নদীর কেবল কুল্ কুল্ শব্দ শুনা যাইবে। তাহার পর আগের চটি লাল সাঙ্গা বা চামৌলি চটি আসিবে।

(৭ মাইল) নন্দ প্রয়াগ হ'তে লাল সাঙ্গা চমৌলি।

সকাল বেলা অন্ধকার থাকিতে থাকিতে চলা ভাল, নতুবা রৌদ্র হ'লে চলিতে বড়ই কষ্ট বোধ হয়। সমস্ত রাস্তায় এই কথা মনে রাখিবেন। অলকানন্দার ধারে ধারে বেশ সুন্দর রাস্তা। দৃশ্য অতি সুন্দর। পরপারে খুবই উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের শিখর। তিন মাইল দূরে মৈটানা চটী আসিবে, তাহার পর লাল সাঙ্গা, একটী বাজার, ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, ধর্ম্ম-শালা পুরান বাজার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে যাহারা কেদারনাথ হইয়া বদ্রীনাথ যায় তাহারাও এইখানে আসিয়া মিলিত হয়। কেদারনাথ ৬৫ মাইল, বদ্রীনাথ ৪৭মাইল পুল পার হইবার পর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়।

(৯ মাইল) চমৌলি হইতে পিপল কোটী।

চমৌলি হইতে গঙ্গার ধারে ধারে সুন্দর রাস্তা, এক মাইল পর দোকান। ছিন্‌কা কেলা চট্টি পার হইবার পর মহান কীর্ত্তী-নাশা বিহরী গঙ্গা এই নদীতে বন্যা আসিয়াছিল। এইখানে

অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে, দৃশ্য অতি রমণীয়, ইহার পর সিয়াসৈন চট্টি। অলকানন্দার পুল পার হইবার পর সামান্য চড়াই করিতে হয়। রাস্তা বিশেষ ভাল নয়, একটু সাবধানের সহিত চলিতে হয়। এইবার পিপল চট্টি আসিবে, একটি ছোট খাট পাহাড়ের উপর বাজার, জিনিষপত্র সব পাওয়া যায়। ডাকঘর, তারঘরাদি সব আছে।

(১০ মাইল) পীপল কোটি হইতে গোলাপ কোটি।

পীপল কোটি হইতে সীধা রাস্তা, রাস্তার একদিকে পর্ব্বতশ্রেণী, কোন কোন যায়গায় দুইদিকে মাথা সমান পর্ব্বত, মধ্যে রাস্তা চারি মাইল দূরে গরুড় গঙ্গা, গই গঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কালীকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে, এই খানে জল এত অধিক হজমকারী ২০ ঘণ্টার মধ্যে আমি দুই সের আটা খাইয়াও সকাল বেলায় ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম। ইহার পর টাঙ্গনী চট্টি, তিন মাইল পরে পাতাল গঙ্গা, নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে ভয় ধরিয়া যায়। এই পাতাল গঙ্গাও অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়া চলা অসম্ভব, রাস্তা প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই রাস্তায় কত দোকান মানুষ মাটীর নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানাই নাই পাতাল গঙ্গা পার করিলে এক ছোট চট্টি পাওয়া যায়, ইচ্ছা হয় আহার করিয়া নিতে পারেন, জিনিষপত্র সব পাওয়া যায়। গরুড় গঙ্গা হ'তে দুই মাইল দূরে গোলাপ কোটী চট্টি। নিকটে ডাক

ঘর, ডাকবাংলা আছে।

(৮ মাইল) গোলাপ কোটী হ'তে যোশী মঠ।

গোলাপ কোটী হ'তে দুই মাইল দুরে, হেলঙ্গ বা কুমার চট্টি কালিকমলীর ধর্ম্মশালা, কয়েকখানি দোকান আছে। শীতল জায়গা, ডাকঘরও আছে। কুমার চটি হ'তে এক রাস্তা তুঙ্গনাথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর আরও ছোট ছোট চট্টি আসিবে। খনোটী, ঝড়চুলা, সিংহধার, এই যোশী মধ্যে প্রবেশ করিবার এক দ্বারের ভাগ, এখান হ'তে এক রাস্তা নিচের দিক দিয়া বিষ্ণু প্রয়াগে গিয়াছে। অন্য রাস্তা যোশী মঠের বাজার হইয়া নৃসিংহ মন্দিরের সম্মুখ দিয়া বিষ্ণু প্রয়াগ হইয়া বদরীনাথ চলিয়া গিয়াছে। দূর হ'তে হিমবাগ পর্ব্বত দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যায়।

যোশী মঠ

এ মঠের অন্য নাম জ্যোতেশ্বরও বলিয়া থাকে। ভগবান ভূতভাবন, বৎসল মহাদেবের বহু প্রাচীন জীর্ণশীর্ণ দশায় পড়িয়াছে। মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করা খুব দরকার, এখানের মধ্যে দর্শনীয়ের মধ্যে বহু প্রাচীন এক তুতের বৃক্ষ আছে এত বড় বৃক্ষ আমার জীবনে আর দ্বিতীয় দেখি নাই। এবৃক্ষের এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এবৃক্ষ সত্যযুগের, প্রত্যেক যুগে ইহার এক[illegible]

শাখা খসিয়া পরে। এ বৃক্ষের অনেক গাট আছে। শ্রীজ্যোতেশ্বর সমস্ত মন্দির প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই পবিত্র মঠের প্রতিষ্ঠা জগৎ গুরু ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য করিয়াছিলেন। ছোট একটি বাজার, ডাকঘর, তারঘর, ডাকবাঙ্গলা, কালীমন্দির ধর্ম্মশালা, স্কুল, আদি আছে। এইখান হইতে এক রাস্তা কৈলাশ মান সরোবর নিতিঘাটী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কৈলাশ ১৩০ মাইল। অন্য রাস্তা বদ্রীনাথ ২০ মাইল। শীতকালে ৬ মাস বদরীনাথের পুজারী বা রাবল পূর্ব্বে এইখানে বাস করিতেন। এইখান হইতে তিন দিকে চির তুষার মণ্ডিত হিম পর্ব্বত দেখা যায়, দৃশ্য অতি মনোরম প্রায় ৯ হাজার ফুট উচ্চ। তপস্বীদের তপস্যার খুবই উপযোগী স্থান। ৯ মাইল যোশী মঠ হইতে পাণ্ডুকেশ্বর।

যোশী মঠ হইতে দুইমাইল একেবারেই উতরাই করিলে বিষ্ণু প্রয়াগ, এইখানে বিষ্ণুগঙ্গা বা ধৌলি গঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। খুবই সঙ্কির্ণ রাস্তা। আচ্ছা এইবার আগে চলুন।

বিষ্ণু প্রয়াগ

এই পঞ্চম প্রয়াগ। এইখান হইতে সূক্ষ্ম বদরী আরম্ভ হয়। ইহার আগে গন্ধ মাদন পর্ব্বত শ্রেণী। দক্ষিণের পর্ব্বতের

নাম নর পর্ব্বত আর বাম দিকে নারায়ণ পর্ব্বত। এই খানের দৃশ্য অন্য এক বিচিত্র রকমের। বিষ্ণু প্রয়োগের স্থান খুবই সঙ্কুচিত। ধৌলি গঙ্গার প্রবাহ অত্যন্ত প্রখর এবং প্রচণ্ড ভাবে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সঙ্গমের নিকটে যাইতে ভয় ধরিয়া যায়। রাস্তার ধারে বিষ্ণু মন্দির, অতি প্রাচীন ও সুন্দর মুর্ত্তি। বিষ্ণু প্রয়াগ হইতে এক মাইল দূরে ধল ছুড়া চটি। তাহার পর পাণ্ডুকেশ । প্রবাদ এইখানে মহারাজ পাণ্ডু তপস্যা করিয়া ছিলেন। এবং এইখানে পাণ্ডবদিগের জন্ম হইয়াছিল। পাণ্ডুরাজা এই পাণ্ডুকেশ্বর স্থাপনা করিয়া ছিলেন। ইহার বহু প্রাচীন, এবং বহু স্মৃতি আদি দেখিলে শুনা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। দৃশ্য অতি রমনীয়। ডাকঘরও আছে।

১১ মাইল পণ্ডুকেশ্বর হইতে বদরী নারায়ণ। (হরিদ্বার ১৮৩ মাইল) প্রাতঃকালে যাত্রীরা বোল বদরী বিশাল লাল কি জয়? বলিয়া উচ্চৈশ্বরে শব্দ করিয়া যাত্রা করিতেছে। চলুন আমরা ও জয়কার দিয়া যাত্রা করি। আজ আমরা বদ্রি নারায়ণে পৌছিব। শীতকালে বদরীনাথ এইখানে নিবাস করেন। অনেক ব্রাহ্মণ সকাল বেলায় বদরীনাথ যায় আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে। এক মাইল দূরে শেষধারা এবং শেষ নাথের মন্দির ভগবান রামানুজ কুটি, ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, ভগবানের পুষ্প বটিকা আদি অনেক স্থান আছে। শেষধারা হইতে কিছু দূরে বিশিক চটি, তাহার দুই মাইল দূরে

লাময় গড় চটি আসিবে। এই খানে কালী কমলীর ধর্ম্মশালা আছে. আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে বৈবানস্ টালা আসিবে। মহারাজ মরুত্ত এইখানেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইখানে অগ্নিদেবের অজীর্ণ রোগ হইয়াছিল। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া হাতীর শুড়ের সমান ঘৃতের ধারা আহার করিতে করিতে অগ্নিদেবের অজীর্ণ রোগ হয়। অর্জ্জুন যখন খাণ্ডব বন দাহন করেন, তখন হইতে অগ্নির অজীর্ণ রোগের শান্তি হয়, তখনও মাটী খুড়িলে ভস্মের মত কাল কাল ছাইয়ের মত মাটি বাহির হয়, অদ্যাবধিও বহু লোকে যজ্ঞ হবণাদি করিয়া থাকেন। এখন আমরা প্রায় ১০ হাজার ফুট উচ্চে আরোহণ করিয়াছি। নতুন যাত্রীদের মাথা ঘুরাইতে আরম্ভ করে। শীতলতাও খুব, সমস্ত শরীর অবশ করিয়া ফেলিতেছে, পুনঃ চড়াইয়েরও কোন অন্ত নাই, "হে বাবা বদ্রীনাথ আর কত কষ্ট এই অধম মহাপাপী সন্তানকে দিবেন, আর কত পরীক্ষা করিবেন। একবার মাত্র দর্শন দিয়া মনুষ্য জন্ম সফল করুন। এত কষ্ট সত্ত্বেও অনেক যাত্রী ও বৃদ্ধা মাতাদের মুখে হাসি, কেবল তোমারই দর্শনের নিমিত্ত কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত অর্থ ব্যয় করিয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিতেছে। একবারমাত্র দর্শন দিয়া তোমার ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ কর। আধ মাইল দূরে হনুমান চট্টি। পূর্ব্বে রাম ভক্ত হনুমান এইখানে নিবাস করিতেন। এই কথা মহাভারতে বড় সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যে সময়ে

পাণ্ডবদের বনবাস হয়, সেই সময় পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তাহারা অলকাপুরি যাইবার সময়ে ভীম দেখিতে পাইলেন, রাস্তায় একটি অতি রোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ বাঁনর পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু লেজ খুবই লম্বা ছিল, রাস্তা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ভীম ছিল বড় অহঙ্কারী, তিনি মনে করিতেন, আমার মতন বলবান পৃথিবীতে নাই, "ভীম বলিলেন,—"হে বানর শীঘ্রই রাস্তা হইতে সরিয়া যা, রাস্তা কেন বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছিস্। তখন বাঁদর অতি বিনীতভাবে বলিল—ভাই, আমি অতি বৃদ্ধ ও রোগা হইয়া গিয়াছি আমার উঠিবার একেবারেই শক্তি নাই, অতএব তুমি যদি দয়া করিরা আমার লেজটি সরাইয়া দিয়া চলিয়া যাও! ভীম তখন একহাতে লেজটি উঠাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

তখন পূর্ণ শক্তি লাগাইয়া চেষ্টা করিল, কিন্তু একটুও নাড়িতে পারিল না। তখন ভীমের আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন নিশ্চয় কোন দেবতা বৃদ্ধবেশ ধারণ করিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে আসিয়াছে। ভীম তখন সেই বানরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। দুইজনেই পবন সুত, ভীমের স্তুতিতে হনুমান প্রসন্ন হইয়া আপন স্বরূপে দর্শন দিলেন এবং দুই ভাইয়ে আনন্দের সহিত মিলিয়া কোলাকুলি করিতে লাগিল, ভীম হনুমানকে ত্রেতা যুগের সেই রূপ দর্শন করাইতে বলিল। তখন হনুমান তাহার সেই ভীষণ রূপ দর্শন

করাইলে, ভীম ভয়ে ভীত হইয়া গেল। পরে ভীমকে আশস্ত করিয়া শান্ত করিলেন। ভীম প্রার্থনা করিলেন, মহাসমরে তাহাদের সাহায্য করিতে, হনুমান "তথাস্তু", বলিয়া অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন। এখনও হনুমান সূক্ষ্মরূপে এইখানে নিবাস করেন। কারণ তিনি চারিযুগের অমর। অলকানন্দা পিছনে থাকিয়া যায়। কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা গঙ্গার তীরে আছে। কয়েকখানা দোকান আছে, ছোট ৩।৪ খানি পুল পার হ'তে হয়। তাহার পর চড়াই আরম্ভ হয়। হিমালয়ের শিখরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, মাথা যেন ঘুরাইতে আরম্ভ করে, রাস্তার দুইধারে নানাপ্রকারের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, মন্দ সুগন্ধযুক্ত পবন বহিতেছে, এই রাস্তায় যাত্রীদের যাত্রার সার্থকতা প্রতীত হয়।

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল, হেম মন্দির শোভিতম্।
নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল, শ্রীবদ্রীনাথজী বিশ্বাম্ভরম্॥

এইবার কাঞ্চন গঙ্গার পুল পার হ'লে দেব দেখলি আসিবে। এইখান হইতে আমাদের আরাধ্য দেবতার মন্দির দর্শন হয়। যাহার নাম আমরা নিত্য জপ করিতে করিতে আসিতেছি, ঐ সম্মুখে দেখা যাইতেছে, সব অশান্তি, সব দুঃখ, চিন্তা, ব্যাকুলতা একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। চেহারায় প্রসন্নতা ফুটিয়া বাহির হইবে, মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে

সিদ্ধিদাতা গণপতির দর্শন করিয়া চলেন, যেন কোনপ্রকারের বিঘ্নাদি না হয়, বল একবার উচ্চস্বরে (বদ্রী বিশাল লাল কি জয়)।

বদ্রীনাথ পুরী

সীধা বাজার হইয়া চলিয়া যান দুইধারে দোকান সব, জিনিষ পাওয়া যায়। শাক্, তরকারী, কাপড়, কম্বল, আটা, ডাল, ঘৃত, মসলা, দুধ চা বদ্রীনাথের ছবি, শিলাজিত, বড় বড় চর্ম্মাদিও অনেক ধর্ম্মশালা আছে তাহার মধ্যে অধিকাংশ পাণ্ডাদের নিজস্ব হ'যে গিয়াছে, ভক্তেরা তৈয়ার করিয়াছেন আর এখানের ব্রাহ্মণেরা দখল করিয়া তাহাদেরই লোক রাখিয়া থাকে, অন্য লোকের বাস করিবার অধিকার নাই। এই সব পাণ্ডারা এত অধিক অত্যাচার করিয়া যাত্রীদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া থাকে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। এই সব অত্যাচার আমার নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। ভগবান ভাল, খারাপ, লোক সর্ব্বত্রই রাখিয়াছেন। বাজার দেখিতে দেখিতে কিছুদূর যাইবার পর, সম্মুখে বদ্রী বিশালের সিংহদ্বার। ঐ যে নহবত বাজার শব্দ শোনা যাইতেছে। প্রথমে স্নান করিয়া দর্শন করা ভাল, সীড়ি দিয়া নামিলে তপ্ত কুণ্ডে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া দর্শন করেন, গরম কুণ্ডে স্নান করিতে প্রথমে একটু ভয় করে।

নামিলে বেশ আরাম মনে হয়। এইবার উপরে চলুন কয়েক সিড়ি উঠিতে আদিকেদার, চতুর্দ্দিক হ'তে কেবল যাত্রীরা হর, হর, বম, বম, শিব, শিব, শব্দে উচ্চস্বরে চিৎকার করিতেছে। ইহার বাম ভাগে পূজ্য শঙ্করাচার্য্যের মন্দির মালীরা সিড়ির উপরে বসিয়া বন তুলসির মালা বিক্রয় করিতেছে। মালা নিতে হয় লইয়া উপরে উঠুন সম্মুখে ভক্তরাজ গরুড় ভগবানের মূর্ত্তি, ইনি ভগবানের পরম ভক্ত ও বাহন—বোল বদ্রী বিশাল লালকী জয়, আকাশ বর্ণ মূর্ত্তি খালী মস্তকের উপরে সোনার ছত্র বহু মূল্য। রত্ন জড়িত সুন্দর মুকুট। কপালে চন্দন, গলায় বহু মূল্য হার, তথা পুষ্প ও তুলসীর হার শোভিত বহু মূল্য বস্ত্র পরণে। এই আমাদের আরাধ্য দেবতা শ্রীবদ্রী নারায়ণ। মহামুনি নারদের ইষ্টদেব। এই বদ্রী বনে জগতে ঈশ, এবং নিখিল বিশ্বের চরাচর স্বামী, দক্ষিণ দিকে কুবেরের মূর্ত্তি সম্মুখে বীণা হস্তে তাঁহার প্রধান অর্চ্চক ও ভক্ত নারদ বসিয়া বীণা বাঁজাইতেছেন। উৎসব মূর্ত্তি ভগবান চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। এমন সুন্দর মূর্ত্তি আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। হৃদয়ে আকিয়া নিন্ মনে এই ছবি হৃদয়ে বাঁধিয়া নিন্ ইনিই সূর্য্য মণ্ডলস্থিত মহান, জ্যোতির্ম্ময় পরুষ। এক পার্শে দুই ভাই নর-নারায়ণের অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি। মন্দিরে আরও অনেক মূর্ত্তি আছে, শ্রীদেবী ভূদেবী, এবং লক্ষ্মীদেবী, যুধিষ্টির আদি অনেক মূর্ত্তি বিরাজিত। এই বার আরতির ঘণ্টা বাঁজিতেছে। সব লোক সরাইয়া


पंचायतन

দিতেছেন। হা, হা, যাঁহার দর্শনের নিমিত্ত এত কষ্ট এত দুঃখ এত অর্থ ব্যয় করিয়া আসিয়াছি তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আবার সন্ধ্যায় দর্শন হইবে। এইবার ঘরে যাইয়া বিশ্রাম করি ও মনে মনে বদ্রীবিশালের কথা শুনি ও শুনাইয়া আনন্দ অনুভব করি এবং মনে মনে শত শত তাঁহার শ্রীচরণ যুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বদ্রী নারায়ণের অধ্যায় সমাপ্ত করি।

নমস্তে নমস্তে বিভো, বিশ্বমূর্ত্তে!
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্ত্তে!!
নমস্তে নমস্তে তপো যোগ গম্য!
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞান গম্য!!

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চদশ খণ্ড

শম্ভো! মহেশ! করুণাময়! শূলপাণে।
গৌরীপতে! পশুপতে! পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে! করুণয়া জগদেবদেকঃ,
ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি।

হে শম্ভো! হে মহেশ! হে করুণার মহাসাগর! হে শূলপাণে! হে গৌরীর একমাত্র পতি! হে জীবরূপ পশুদেরও পতি! পশুদের অবিদ্যারূপী পাশের নাশক! হে কাশী নগরীর স্বামী! আপনিই এই সমস্ত নিখিল বিশ্বের আপন, অহৈতুকী দয়াতে নাশ করেন, রক্ষা করেন এবং উৎপন্ন করেন, সেই জন্য আপনি মহান্, অর্থাৎ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, মহেশ্বর।

যাত্রার সময় যাত্রীরা বিচার করিয়া নিয়া থাকেন, পূর্ব্বে কেদার হইয়া বদরীনাথ যাইতে ৫৭ মাইলের চক্কর হয়, তাহার জন্য এত বড় প্রসিদ্ধ তীর্থ ছাড়িয়া যায় না। যদি কেদার হইয়া বদ্রীনাথ যায়, তাহার মাহাত্ম্য বিশেষ। কিন্তু কেদার হইয়া বদরীনারায়ণ গেলে মধ্যে কর্ণপ্রয়াগ, নন্দ প্রয়াগ ছুটিয়া যায়, কিন্তু ফিরিবার সময় পাওয়া যায়। দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে শ্রীকেদারনাথ প্রসিদ্ধ এবং প্রধান জ্যোর্তিলিঙ্গ, রুদ্র প্রয়াগ হইতে বদ্রীনাথের রাস্তা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণন

করিয়াছি, এখন রুদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারের মার্গ বর্ণন করিব।

(১১ মাইল) রুদ্র প্রয়াগ হ'তে অগস্ত মুনি। (হরি ১০৯ মা)

হরিদ্বার হ'তে রুদ্র ৯৮ মাইলের বিবরণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবার রুদ্র প্রয়াগ হ'তে মন্দাকিণীর তীর ধরিয়া চলিতে হইবে। কেদারনাথ ৫৫ মাইল। পাঁচ দিনের মধ্যে আরামের সহিত পৌঁছিতে পারেন। ৪৷৷০ মাইল দূরে ছাং তোলী চট্টি। ১৷৷০ মাইল দূরে তিলবাড়া চট্টি আসিবে, তারপর অলস তরঙ্গণী নদী মন্দাকিণীর সঙ্গে মিলিত হ'য়েছে। পূর্ব্বে এখানে সূর্য্য ভগবান তপস্যা করিয়াছিলেন। সেজন্য এই সঙ্গমের নাম সূর্য্য প্রয়াগ বলিয়া থাকে। তাহার পর মঠ ও রামপুর চট্টি, ইহার চারি মাইল দূরে অগস্ত্য মুণি চট্টি। শুনা যায় এখানে অগস্ত্য মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং লোপ মুদ্রার সঙ্গে বিবাহ করিয়া দৃঢ়শ্ব নামক পুত্র উৎপন্ন করেন। অগস্ত্য মুণির এক মন্দির আছে। ছোট একটি গ্রাম, ইহাও একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ, আজ পর্য্যন্ত অগস্ত্য মুণির মত পর-উপকারী ঋষি, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহার ছয় মাইল দূরে স্কন্ধ পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বতের উপরে পার্ব্বতী পুত্র দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের এক মন্দির বিদ্যমান। স্থান অতি মনোরম। অগস্ত্য মুণিতে এক খুব বড় মঠ, নিকটে মন্দাকিণী প্রবাহিত হইতেছে। আহার করিতে ক্ষয় করিতে পারেন। যখন হাওয়াই জাহাজ কেদারনাথ যাইত তখন

এখানে নামিয়ে দিত। এখানে ডাকঘর, তারঘরাদি আছে। একটু দূরে নারায়ণের মন্দির, তারপর চন্দ্রাপুরি চট্টি, সিরি চট্টি। পুল পার হ'লে কুংড় চট্টি আসিবে, তারপর তিন মাইল দূরে গুপ্ত কাশী, মার্গ খুবই শক্ত চড়াইয়ের।

গুপ্তকাশী

গুপ্ত কাশী বা বারাণসী, বেশ সুন্দর মনোরম স্থান। প্রাচীন কালে অনেক ঋষিমুণি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। রাজা বলির পুত্র বাণাসুরের রাজধাণী শোণিতপুর অতি নিকটে অবস্থিত। মন্দাকিণীর পরপারে উখী মঠ, ঐ খানে বাণাসুরের কন্যার নিবাস, এবং ঐ খানেই শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে বিবাহ হ'য়েছিল। গুপ্ত কাশীতে অর্দ্ধনারী, নটেশ্বর মন্দির, মূর্ত্তিখানী অতি সুন্দর, লিঙ্গাকার মূর্ত্তি, অষ্ট ধাতুর নন্দী, হিমালয় কন্যা পার্ব্বতীর মূর্ত্তি। নিকটে একটী কুণ্ড, অবিরত জলের ধারা পড়িতেছে। ঐ ধারার নাম গঙ্গা, যমুনা বলিয়া থাকে। কালি-কমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। এক মাইল দূরে নালা চট্টি। গুপ্তকাশী হ'তে দৃশ্যও সুন্দর।

(১২॥ মাইল) গুপ্তকাশী হ'তে বাদল চট্টি।

গুপ্তকাশী হ'তে সীধা রাস্তা, নানা প্রকারের সুগন্ধ যুক্ত ফুল ফুটিয়াছে। মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। কেদারনাথ দর্শন করিয়া যাত্রীরা নালা চট্টিতে আসিয়া মন্দাকিণীর তীরে

ধবিয়া চলিয়া যায়। নালা চট্টিব আগে নারায়ণ কুটী চট্টি। এখানে বহু প্রাচীন এক মন্দিব মাটিব নিম্ন হ'তে বাহির হ'য়েছে কোন এক সময় এখানে কোন রাজাব বাজধানী ছিল। রাস্তা ছাড়িয়া দুই তিন মাইল দূরে মঠ নামক একটী গ্রাম, এখানে পর্ব্বতশ্রেণী বড়ই শান্ত ও স্নিগ্ধ বলিয়া মনে হয়। একেবারেই নির্জ্জন, উত্তরা খণ্ডের এই স্থানকে ৫১ পীঠের মধ্যে অন্যতমঃ। ৺দুর্গা পূজাব সময় খুব বড় মেলা বসিয়া থাকে। শিল্প-জাত বহু দ্রব্য এই মেলায় বিক্রী হ'য়ে থাকে।

নাবায়ণ কুটী হইতে কুগ চট্টি। পুনঃ মৈখণ্ড চট্টি আসিবে এখানে মহিষমর্দ্দিণীব মন্দির আছে। ইহার পূর্ব্বের নাম মহিষা-রণ্য ছিল। মহিষাসুবের রাজধানী এখানে ছিল। ভগবতী ৺দুর্গা দেবী অসুরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পর্ব্বতের উপরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এর দু'মাইল দূরে ফাঁটা চট্টি, মৈখণ্ড পর্ব্বত হ'তে বড় শক্ত চড়াই করিতে হয়। ফাঁটা চট্টি পর্য্যন্ত একটু ভাল রাস্তা। কয়েকখানী দোকান আছে, তাহার পর দু'মাইল দূরে বাদল চট্টি। ইহা খুব বড় চট্টি, এখান হইতে এক রাস্তা ত্রিযুগী নারায়ণ তিন মাইল, খুব কঠিন চড়াই করিতে হয়। শীতলতার কোন ঠিকানা নাই। দ্বিতীয়ত বিষাক্ত মাছির উপদ্রব। পায়ের মধ্যে মোজা ও শরীরের মধ্যে ভাল করিয়া জামা পরিয়া নেওয়া ভাল, যদি কামড়াইয়া দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গে

ফুলিয়া উঠিবে। বাদলপুর চট্টি হ'তে দু'মাইল রামপুর চট্টি,। পুনঃ পাটী গাড নালার পুল পার হওয়ার পর, এক রাস্তা সীধা সোন প্রয়াগ হ'য়ে গৌরী কুণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। সীধা যদি সোন প্রয়াগ যান্, তবে দু'মাইল্ হয়, নাটী গাড হইতে দু'মাইল চড়াই করিবার পর সাকম্ভরী দেবীর মন্দির, এখানে যাত্রীরা চুড়ি আদি দেবীকে পরাইয়া থাকে। ভয়ানক জঙ্গল, একা পথ চলিতে ভয় ধরিয়া যায়। এই জঙ্গলে নানা রকমের হিংস্রক জন্তু আছে। আবার চড়াই করিতে করিতে যেন পেটের নাড়ি-ভূড়ি বাহির হ'য়ে যায়। আগে হিমাদ্রি শিখরের উপরে ত্রিযুগী নারায়ণের মন্দির। প্রায় ৫০।৬০ ঘর লোকের বাস। প্রবাদ আছে, এখানে শৈলসুতা পার্ব্বতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হ'য়েছিল। নারায়ণের দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতীর সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজিত। কিঞ্চিৎ উপরে সরস্বতী ও গঙ্গার ধারা বাহির হ'তেছে, ইহাদের নাম ব্রহ্ম কুণ্ড, বিষ্ণু কুণ্ড, সরস্বতী কুণ্ড, ও রুদ্র কুণ্ড, রূদ্র কুণ্ডে স্নান, বিষ্ণু কুণ্ডে আচমন, ব্রহ্মে মার্জ্জন, এবং সরস্বতী কুণ্ডে তিলাদি দিয়া তর্পন করিতে হয়। রূদ্র কুণ্ড সব থেকে বড় অন্যগুলি ছোট ছোট।

মন্দিরে এক অখণ্ড ধুনি প্রজ্জলিত হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন এই ধুনি তিন যুগ ধরিয়া প্রজ্জলিত হইয়া রহিয়াছে। একজন্য ইহাকে ত্রিযুগী নারায়ণ বলিয়া থাকে।

যাত্রীরা এইখানে যজ্ঞ হবণাদি করিয়া থাকে। কয়েকখানি দোকান আছে, কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। দর্শনাদি করিয়া এইবার সাকম্ভরীদেবী হইয়া সোন প্রয়াগে আসিয়া যান্। এইখানে সিদ্ধিদাতা মাথা কাটা গণেশ দর্শন করিয়া সীধা গৌরিকুণ্ডে পৌছিয়া যান্। কয়েকখানি দোকান কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে, এইখানে খুব গরম একটী কুণ্ড আছে। জল একেবারেই নীলবর্ণ; ইহাকে অমৃত কুণ্ডও বলিয়া থাকে। শুনা যায় হিমাল কন্যা গৌরিদেবী প্রথমে এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। গোমুখ হইতে সদা জলের ধারা কুণ্ডের মধ্যে আসিয়া পড়ে। স্নান করিতে ভয় ধরিয়া যায়। মন্দাকিনী অতি নিকটে প্রবাহিত হইতেছে। প্রবাদ আছে, গৌরিদেবীর এইখানেই জন্ম হইয়াছিল, পার্ব্বতীর মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দিরাদি দর্শন করিয়া বিশ্রাম করেন। এইখান হইতে খুবই শীত, হাত পা কন্‌কন্ করে। আট মাইল দূরে কেদারনাথজী।

(৮ মাইল) গৌরিকুণ্ড হইতে কেদারনাথ।

এইখান হ'তে প্রায় সমস্ত রাস্তা কঠিন চড়াইয়ের। কাল্টি চট্টি হ'তে শীত আরম্ভ হয়, গৌরিকুণ্ড পর্য্যন্ত কিছু কিছু সহ্য হয়, তাহার পর অসহ্য শীত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি বৃষ্টি হয়, অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। তবে হাত পা আগুনের মধ্যে রাখিয়া দিলেও গরম

গৌরিকুণ্ড হ'তে আধ মাইল দূরে চিরপটীয়। ভৈরব, ইহার পর অমর চট্টি, তাহার পর ভীম শীলা, এক মাইল দূরে রামবাড়া চটী, এইখানে কালিকমলীর ছোট একটি ধর্ম্মশালা, যদি কোন লোকের কম্বলের দরকার হয়, তবে কেদারনাথ দর্শন করিয়া আসা পর্য্যন্ত এইখান হইতে দেওয়া হয়। কেদারনাথ এইখান হইতে ৩।৹ মাইল, এখানের দৃশ্য অতি সুন্দর, সম্মুখে হিমালয়ের চির তুষার মণ্ডিত শ্বেত বর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী, পিছনে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসব শীর উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শীতলতার কোন ঠিকানাই নাই। কেবলমাত্র ঝরণার ও নদীর কুল্ কুল্ শব্দে মন নাচিতে থাকে। অন্যদিকে শরীর কাঁপিতে থাকে। আবার যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তখন ঠিক যেন সাগু দানার মত বরফ পড়ে তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়, এইসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ দেখিবার মতন। হিমাদ্রি শিখরে আরোহণ না করিলে সেই আনন্দ ব্যক্ত করা এক অসাধ্য ব্যাপার। আচ্ছা এইবার আগে অগ্রসর হইয়া বাবা কেদারনাথজীকে দর্শন করিয়া জীবন সফল করি। আর মুখে হর, হর, শম্ভো বলিয়া গাল বাদ্য করি।

ষষ্টোদশ খণ্ড

শ্রীকেদারনাথ দর্শন

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকাল মোঙ্কার সমলেশ্বরম্॥
পরল্যাং বৈদ্য নাথং চ ডাকিন্যাং ভীম শঙ্করম্।
সেতুব ন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকা বনে॥
বারানস্যাং বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমি তটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুষ্টেনেশং শিবালয়ে।

গৌরি কুণ্ড হইতে রাম বাড়া, দেখ দেখনি আসিলে কেদার নাথের মন্দির দেখা যায়। দেখ দেখনি হইতে এক মাইল দুরে মন্দাকিনীর পুল পার হ'তে হয়। মার্গ যেমন কঠিন, চড়াইও তেমন। বরফ প্রায় দুই মাইল, বরফের উপর দিয়া চলিতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কেদারনাথ আমাদের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক অন্যতম। সত্যযুগে মহাত্মা উপমন্যু দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসনা করিয়া আপন অভিষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন। আবার দ্বাপরে যখন পাণ্ডবেরা যুদ্ধে আপন ভাই বন্ধুদের মারিবার পর ভগবান বেদ ব্যাসের উপদেশে এইখানে আসিয়া তপস্যা করেন। ভগবান শঙ্কর ইহাদের জাতি নাশক কুল-দ্রোহী মহাপাপী মনে করিয়া ভগবান ভুত পতি কেদারেশ্বর মাটির নিম্নে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া ভীম তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া আসিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিল। এবং বলিল, হে মহারাজ এই কি

করেন কোথায় পলাইয়া যাইতেছেন, একটু দাঁড়ান, আমরা কত কষ্ট করিয়া আপনার দর্শনের নিমিত্ত এই মহান কঠিন স্থানে আসিয়াছি, এই বলিয়া চরণে পড়িয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান আশুতোষ ভোলানাথ ভীমের স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া তাহাদের বর প্রদান করিয়া অন্তর্ধান হইবার সময়ে চারি খণ্ডে খণ্ডিত হইয়াছিল। তাহা চারি স্থানে পড়িয়াছিল, সেজন্য চারি স্থান চারি তীর্থে পরিণত হইয়াছে। বাহু তুঙ্গনাথে, মুখ রুদ্রনাথে, নাভি মদ মহেশ্বরে এবং জটা কল্পেশ্বরে ও শরীর কেদারে। ইহাকে পঞ্চ কেদার বলে। কেদার কল্প স্বয়ং শিব আপন সমান। এই কেদার ক্ষেত্রকে অনাদি ও প্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শিবের নিত্য স্থিতি, নিত্য তিনি এখানে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকেন। এই খানে দেবতাদের ও দুর্লভ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেদারনাথ কোন নির্ম্মিত লিঙ্গাকার মূর্ত্তি নয়, এক ত্রিকোন পর্ব্বতের খণ্ডের মত। যাত্রীরা স্বয়ং পূজা করিয়া থাকে। মন্দির খুব বড় নয়, দেখ দেখিনি হইতে অতি সুন্দর দেখা যায়। এখানের রাধল বা পূজারী দক্ষিণের লিঙ্গায়ত শৈব, ইহাদের নামের পিছনে লিঙ্গ লিখিয়া থাকে। ইনি বিবাহ করিতে পারে না। কৌমার ব্রহ্মচারী অবস্থা থাকিতে হয়। পূজারী প্রায় সময় উখি মঠে থাকেন, কখন কখন আসিয়া থাকেন। কেদারনাথের ছয়মাস পুজা, এই উখি মঠে উৎসব মূর্ত্তির পুজা হয়। এখানে অনেক পাণ্ডারা বাস করেন এবং

বহু ধর্ম্মশালা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় ধর্ম্মশালা পাণ্ডাদের নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। সাইন্ বোর্ড লাগান ৩।৪খানি বাঙ্গালীর ধর্ম্মশালাও আছে দেখিলাম। কিন্তু তাহাতে তাহাদের যাত্রী ব্যতিত অন্য লোকের প্রবেশ করা একেবারেই নিষেধ। যদি কালিকমলির ধর্ম্মশালা না থাকিত তবে (আমাদের) সন্ন্যাসীর থাকাও অসম্ভব হইত। এইখানে পঞ্চ পাণ্ডবদের মূর্ত্তি তথা দ্রৌপদীর মূর্ত্তি, আবার কোন জায়গায় ভীম গুহা, ভীম শীলাদি দেখিবার মতন, জগৎগুরুর পুজ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিষয় এই মন্দির সম্বন্ধে শুনা যায়। এই কেদারের মন্দির ৩৫ শতাব্দিতে তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এবং এই খানেই তিনি এই নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়াছিলেন। মন্দিদের নিকট অনেকগুলি কুণ্ড আছে, তাহাতে যাত্রীরা তর্পনাদি করিয়া থাকে। উপরের দিকে একটি মাঠের মতন চির তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতের শিখরে চমৎকার পদ্মফুল ফুঁটিয়া থাকে। ইহাকে স্থল পদ্ম বলে, অথচ মনে হয় ইহা ঠিক স্থল পদ্ম নয়। পাণ্ডারা শ্রাবণ মাসে তুলিয়া কেদার নাথের মস্তকে দিয়া থাকে। শীতের সময় সব লোক আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যায়। দিনের দু'টার পর হইতে তুষারপাত হইতে থাকে, ঠিক যেন শাবু দানার মত। জ্যোৎস্না রাত্রে কি অপুর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়, চতুর্দ্দিকে হিমে আচ্ছাদিত, যেন প্রকৃতি দেবী

গিমের সঙ্গে মিলিত শান্তরসে ডুবিয়া যাইতেছেন। প্রকৃতি দেবীর কি অপূর্ব্ব লীলা খেলা। তপস্বীদের তপস্যার অতি শক্তিশালী ভূমি এই খানে হিমাদ্রি শিখরের দৃশ্য সত্য সত্যই জীবনের এক দেখিবার বস্তু, আমি এক সময়ে দুই মাস যাবৎ তপস্যার জন্য ছিলাম। এই লাইনে ডাকঘর আছে, কিন্তু তার ঘর নাই। মন্দাকিনী অতি নিকটে প্রবাহিত হইতেছেন; বহু যাত্রী এখানে আহার পর্য্যন্ত করে না। স্বর্গ হইতে আগতা, শিবের মস্তকে বিরাজিতা ও পরম পবিত্র পুণ্যদায়িনী মন্দাকিণীতে অনেকে শ্রাদ্ধ তর্পন করিয়া পিতৃগণকে মুক্ত করিয়া থাকেন। দরকার হয় কালিকমলীর প্রতিষ্ঠান হইতে কম্বলাদি নিতে পারেন। এই বার কেদারনাথ বাবাকে দর্শন, পূজাদি করিয়া বিদায় গ্রহণ করা যাক্। 'জয় বাবা কেদারেশ্বর'। মহাদেব হর, হর, শম্ভো, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে, মা মন্দাকিনী দেবীকে দণ্ডবৎ প্রাণাম করিয়া ও বাবার কিছু নির্ম্মাল্য এবং প্রসাদ নিয়া চলুন।—ওঁ নমঃ শিবায়।

কেদারনাথ হইতে চামলী

কেদার নাথ হইতে ২৩ মাইল নালা চট্টি পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব বর্ণিত সেই রাস্তা ধরিয়া ফিরিতে হইবে। কেদারনাথ বদ্রীনাথ ১০১ মাইল দুর, নালা চট্টি হইতে ১॥০ মাইল উতরাই করিয়া

মন্দাকিনীর পুল পার হইবার পর ১॥০ মাইল চড়াই করিলে তবে উখি মঠ আসিবে। এখানে ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, থানা, কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা, পাঠশালা, ও ছোট একটি বাজার আছে। বহু প্রাচীন এক মন্দির, মন্দিরে, মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ, প্রথমত পৃথক পৃথক পঞ্চ মূর্ত্তি মহাদেব,মহারাজ মান্ধাতা ওঁকেশ্বর শিব, ইহাব পার্শ্বে গণেশ, নন্দীকেশ্বর, শালেগ্রাম, মদমহেশ্বরের চল মূর্ত্তি, বদ্রীনাথ, কার্ত্তিকের মূর্ত্তি, কেদারনাথজী, পার্ব্বতী, তুঙ্গনাথজী, কালিদেবী, অর্দ্ধনারিনটেশ্বর, লক্ষ্মীদেবী, নারদ মুনি, শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি, এবং চতুর্ভুজ নারায়ণের মুর্ত্তি আছে, সব মুর্ত্তি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে হয়, এইখান হইতে গুপ্তকাশীর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়।

(৩॥০ মাইল) উখি মঠ হইতে গণেশ চটি।

রাস্তা সীধা ও পরিষ্কার, দুইচারখানী দোকান আছে। নিকটে ছোট একটী গ্রাম।

(৫ মাইল) গণেশ চট্টি হইতে পোত্তি বাসা। রাস্তা চরাইয়ের। এবং পাহাড়ী মাছিরও উপদ্রব, হাত পা ভাল করিয়া ঢাকিয়া নিন্। এইখানে কাঠের নানা প্রকারের বাসনাদি বিক্রি হয়। খুব জঙ্গলী জায়গা। শীতল স্থান। ২।৪ খানী দোকান আছে। দুই মাইল দূরে বলিয়া কুণ্ড চটি, কালি কমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। ২।৪ খানি দোকান

আছে। নিকটে জলের ভাল ঝরণা আছে, খুবই জঙ্গল। (২ মাইল) পোতি বাসা হইতে বলিয়া কুণ্ড। কালি কমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। দুই তিন খানি দোকান আছে। খুবই জঙ্গল. হিমালয়ের এই ভয়ানক জঙ্গল, দিবা সুর্য্যও প্রবেশ করা অসম্ভব। এক মাইল দূরে চোপতা চটি, এই চটি হইতে এক রাস্তা 'তুঙ্গনাথ, তৃতীয় কেদার' চলিয়া গিয়াছে। তিন মাইল খুবই কঠিন চড়াই করিতে হয়। চড়াই করিতে করিতে যেন নাড়ী ভূড়ি বাহির হইবার মত হয়। এই মহান্ শক্ত চড়াই করিবার পর তুঙ্গনাথ বাবার দর্শন হয়। এই পর্ব্বতের উপর হইতে, কেদার নাথ, বদরী নাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর সমস্ত পাহাড় দেখা যায়। দূর হইতে ঠিক যেন সমুদ্রের তরঙ্গের মতই দেখায়।

এই পর্ব্বতের শিখর হইতে এক ধারা বাহির হইয়াছে। ইহারই নাম পাতাল গঙ্গা বলিয়া থাকে। ইহাতে স্নান করা অসাধ্য। হিমের কথা বলা অসম্ভব। যেন তাহাদেরই ঘর বাড়ী, ইহার শিখর হইতে দৃশ্য অবর্ণনীয়, রাত্রে যখন তুষার পাত হয় এবং সঙ্গে যদি জ্যোৎস্নারাত্রি তখনকার দৃশ্য কি এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করে, সত্যই যেন এক মহামায়ার কুহকিনী রাজ্যে আসিয়াছি। বিশ্বকর্ম্মরূপী, বিশ্বকারীগরের কি বিচিত্র কারিগরী, প্রভুর কি অনন্ত সৃষ্টি রচনা। আমি প্রায় সময় রাত্রে বসিয়া বসিয়া সেই সৃষ্টি কর্ত্তার অনন্ত হিমালয়ের সৃষ্টি চিন্তা করিতাম।

ইহার উচ্চতা ১৪ হাজার ফুট, কয়েকখানী দোকান আছে। কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। এইবার তুঙ্গনাথ বাবাকে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায় নেওয়া যাক।

[৩ মাইল] তুঙ্গনাথ হইতে জঙ্গল চট্টি। এক মাইল উতরাই করিবার পর ভয়ানক জঙ্গল, একা সঙ্গীহীন চলিতে ভয় ধরিয়া যায়। এই জঙ্গলে বড়ই হিংস্রক জন্তু থাকে। এইখান হ'তে এক রাস্তা চোপথা চটিতে মিলিত হ'য়েছে। কিন্তু ভয়ানক জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। রাস্তা ও অনেক কম হয়। তিন মাইল দূরে পাঙ্গ বাসা চটি একেবারে উতরাই করিতে হয়। রাস্তা মন্দ নয়।

[৭ মাইল] গঙ্গাপার বাসা হইতে মণ্ডপ চট্টি।

রাস্তা উতরাই মার্গও বেশ ভাল, পার্শ্বে বাল খিলতা নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদীর পার্শ্বে নানা বর্ণের পুষ্প ফুটিয়া অতি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়া হিম গিরিকে আনন্দ দিতেছেন। কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে।

মণ্ডল চটি হ'তে চমৌনি ১১ মাইল। গোপেশ্বর ৪॥০ মাইল. গোপেশ্বর হ'তে আরও ছোট ছোট কয়েকখানি চট্টি আসিবে। গোপেশ্বর বড় গ্রাম, এখানে বহু প্রাচীন এক শিবের মন্দির আছে। মণ্ডল চট্টি হ'তে অনুসূয়া তীর্থ ও রুদ্রীনাথের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাস্তা নিতান্ত খারাপ, রুদ্রনাথ ও

গোপেশ্বরের একই পূজারী পূজা করে। এখানে অষ্টধাতুর নির্ম্মিত এক বহু প্রাচীন ত্রিশূল আছে, তাহাতে পালি ভাষায় কি যেন লেখা রহিয়াছে। ভাল ভাবে দেখা যায় না, শুনা যায় নৈপালের অনিক পাল রাজা হইয়া এস্থান জয় করিবার পর স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ এই ত্রিশূল স্থাপনা করিয়াছিলেন। গোপেশ্বরের শিব লিঙ্গ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ এখানে। আমি কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম। অতি সুন্দর স্থান, দৃশ্য অতি চমৎকার, কয়েকখানি দোকান আছে। একদিন হঠাৎ এক সাধুর দর্শন হইল, ইনি দুই দিন পর পর কেবল লঙ্কাবাটা দিয়া রুটী খাইয়া থাকেন। আর সন্ধ্যায় ও সকালে দুই ছিলিম গাঁজার ধূম পান করেন, একদমে গাঁজা পুরিয়া খাইবার পর ছিলিম ঢালয়া ফেলিলে প্রায় আট আনা পরিমান সোণা তৈয়ার হইত, তাহার দ্বারা বাবাজীর নিত্য খরচা হইত। আমাকে তিনি খুব ভাল বাসিতেন। প্রায় বিশদিন ছিলেন। তাহার পর আর তাহাকে দেখা যায় নাই। আমাকেও তিনি সেই কর্ম্মটী শিখাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যেই বৃক্ষের রস দিয়া গাঁজা মাখিতেন সে বৃক্ষ খুব ছোট হয়, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা একেবারেই স্মরণে নাই। কিন্তু তাঁহার চেহারাখানী বেশ মনে আছে। আমি মনে মনে নিত্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকি। ওঁ নমঃ নারায়ণনায়।

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তোদশ খণ্ড

গঙ্গোত্রী—যমুনোত্রী হইয়া বদ্রীনাথ।

পাপাপহারী দুরিতারি তরঙ্গ ধারি।
শৈল প্রচারি গিরিরাজ গুহা বিহারী ॥
ঝঙ্কার কারি হরি পাদরজোপহারি।
গাঙ্গ পুনাতু সততাং শুভকারি বারি ॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি উত্তরা খণ্ডে অসংখ্য তীর্থ বিদ্যমান। কিন্তু তাহার মধ্যে চার ধাম প্রধান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রিনাথ। যদি এই চারি ধামের এক সঙ্গে যাত্রা করিবার ইচ্ছা হয়, প্রথমে যমুনোত্রী যাইয়া থাকে, পরে গঙ্গোত্রী হইতে বুড়া কেদার; গুপ্তকাশী হইয়া সোজা কেদারনাথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার পরে বদ্রীনাথ দর্শন করিয়া থাকে। আমি নিজেই দুইবার গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী যাত্রা করিয়াছি। কাগজের অভাবের জন্য বিস্তারের ভয়ে অধিক বর্ণন করিব না, কেবলমাত্র আমি আপনাদের রাস্তার পরিচয় করাইয়া দিব, যেই যেই রাস্তা দিয়া আমি যাত্রা করিয়াছিলাম গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী যাইবার তিনটি রাস্তা

আছে। (১) হরিদ্বার হইতে ঋষিকেশ দেবপ্রয়াগ হইয়া টিহরী রাজধানী, এই নগর হইতে ধারাসু তাহার পর যমুনোত্রী, যমুনোত্রী হইতে গঙ্গোত্রী দর্শন করিয়া থাকে। (২) হরিদ্বার হইতে মংসুরী হইয়া যমুনোত্রী, পরে গঙ্গোত্রী। (৩) ঋষিকেশ হইতে নরেন্দ্র নগর ও টিহরী পরে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর যাত্রা সমাধা করে। ঋষিকেশ হইতে দেবপ্রয়াগ হইয়া, যমুনোত্রী ১৫২ মাইল দূরে। ঋষিকেশ হইতে দেবপ্রয়াগ ৪৪ মাইল, ইহার বর্ণন আমি পূর্ব্বে করিয়াছি।

এইবার আমি পূর্ব্বে দেবপ্রয়াগের পথ প্রদর্শনরূপে পরিচয় করাইব। দেবপ্রয়াগ হইতে ভাগীরথীর ধারে ধারে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর রাস্তা। খসাড়া দেবপ্রয়াগ হইতে ১০ মাইল, সামান্য সামান্য চড়াই উতরাই আছে। পর্ব্বতের ও নদীর দৃশ্য অতি রমনীয়, কোটেশ্বর খসাড় হইতে ৪ মাইল ; এইখানে এক শিব মন্দির ও কোটেশ্বর ভগবানের দর্শন কয়েকখানি দোকান আছে। (খাদ্যাদি সবই জিনিষ পাওয়া যায়) পার্শ্বে ছোট একটি পার্ব্বতীয় লোকের গ্রাম।

বড্রা—কোটেশ্বর হইতে ৬ মাইল। কয়েকখানি দোকান আছে। খাদ্যাদি সবই জিনিষ পাওয়া যায়। ক্যারী—বড্রা হইতে ৮ মাইল দূর। দুই তিনখানি দোকান আছে। খুব ছোট চট্টি। টিহরী—ক্যারী হইতে ছয় মাইল দূর। এখানে

ভাগীরথী ও ভিলঙ্গনা নদীর সঙ্গে সুন্দর সঙ্গম হইয়াছে। এই সঙ্গমের দৃশ্য অতি মনোরম হৃদয়গ্রাহী। ছোট খাট একটা হিন্দুকুল তিলক ক্ষত্রীয় বীর গড়বালের রাজধানী। সন ১৮১৯ ইংরেজীতে মহারাজ সুদর্শন সাহ ৯০০০ ফুটের উপরে এই নগর স্থাপন করেন। রাজধানী অত্যন্ত রমণীয়, এখানে কেদার নাথের মন্দির ও বদ্রিনাথের বিশাল মন্দির বিদ্যমান। টিহরী হইতে ৯ মাইল উত্তরে ৭৯০০ ফুটের উপরে মহারাজ প্রতাপ শাহজী দ্বারা স্থাপিত প্রতাপ নগর এবং ৩০ মাইল পূর্ব্বে সন ১৮৯৬ ইংরেজীতে মহারাজ সর কীর্ত্তিসাহ দ্বারা কীর্ত্তি নগর নামক রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগর শ্রীনগরের নিকটে অলকানন্দার তীরে অবস্থিত। দক্ষিণের দিকে ৪০ মাইল দূরে বর্ত্তমান মহারাজ নরেন্দ্র যাহা দ্বার স্থাপিত ১৯২০ ইংরাজীতে নরেন্দ্র নগর রাজধানী। যাহা হরিদ্বার ঋষিকেশ হইতে পর্ব্বতের উপরে দেখা যায়।

টিহরী হইতে ভিলঙ্গনী নদীর তীরে কেদারনাথ ৭০ মাইল। যমুনোত্রী ৭৪ মাইল। গঙ্গোত্রী ১০০ মাইল এবং মসুরী ৪০ (৫॥০) টিহরী হ'তে পিপল চটি। রাস্তা বেশ সরল আছে। (৬ মাইল) পিপল চটি হইতে ভণ্ডিয়ালা। ৩।৪ খানি দোকান আছে। কালিকমলীর ধর্ম্মশালাও আছে। আধ মাইল নীচে গঙ্গা মহারাণী কল কল রবে প্রবাহিত হ'তে দেখা যাবে।

নিকটে জলের নল। রাস্তা বেশ ভাল, দৃশ্য অতি রমণীয়। (৫ মাইল) ভণ্ডিয়ালা হ'তে ছামচটি। এক ধর্ম্মশালা আছে, ২।৩ খানি দোকান আছে।

(৫ মাইল) ছাম হ'তে লগুন। এখানে এক ধর্ম্মশালা আছে, দোকান আছে।

(৫ মাইল) লগুন হ'তে ধরাস্থু।

মস্থুরী হইতে যে রাস্তা আসিয়াছে তাহাও এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং ঋষিকেশ হইতে নরেন্দ্র নগর ও টিহরী হইয়া যে রাস্তা আসিয়াছে তাহাও এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এক রাস্তা উত্তর কাশী হইয়া গঙ্গোত্রী চলিয়া গিয়াছে। ধরাস্থু এক ছোট খাট বাজার, কালী কমলীর ধর্ম্মশালা আছে। খাদ্যাদি সব পাওয়া যায়। ধরাসু একটি জংসন বলিলেও হয়। সব সময় লোকের আগমন হইতেছে এবং সকাল বেলা জয় জয়কার ধ্বনি দিয়া বিদায় হইতেছে। অতি সুন্দর দৃশ্য, আমি কয়েকদিন এইখানে ছিলাম।

(৯ মাইল) ধরাস্থু হইতে বরমমালা। ৪ মাইল পিছনে কল্যাণী চট্টি আসিবে। কিছু কিছু চড়াই উতরাই আছে। ছ'খানি দোকান আছে, (১০ মাইল) বরমখালা হইতে বাড়ীধার। মধ্যে সিলক্যারী চট্টি আসিবে, এখান হ'তে এক রাস্তা বড় কোট বা চকরোতা চলিয়া গিয়াছে এবং অন্য এক রাস্তা

উত্তর কাশী গিয়াছে, ইহার পব কোন চট্টি আদি পাওয়া যায় না। ৯ মাইল পর ছোট ছোট চট্টি আসিবে, প্রথম ডংজল গ্রাম, তাহার পর সিমলি চট্টি ফিরিবার সময় এক রাস্তা উত্তর কাশী গিয়াছে। (৬ মাইল). বাড়ীধার হইতে গঙ্গানী চট্টি, এক কালিকমলীর ধর্ম্মশালা আছে, কয়েকখানি দোকান, খাদ্যাদি সব পাওয়া যায়, নিকটে একটি কুণ্ড দেখা যায়, ইহাকে গঙ্গাকুণ্ড বলে। প্রবাদ আছে---এই কুণ্ডে গঙ্গার জল আসিয়া পড়ে, কৃষ্ণ বিহারিণী মাতঃ যমুনা অতি মধুর ভাবে নৃত্য করিতে করিতে চপলার মত প্রবাহিত হইতেছে দেখা যাইবে। অতি মধুময়ী সম্মুখে হিমা রাজের উচ্চ হিম মুকুট পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অতি সুন্দর এইখানে দৃশ্য।

(৬ মাইল) গঙ্গানী হইতে যমুনা চট্টি। কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে, কয়েকখানি দোকান আছে। ইহার পর দু মাইল দূরে ছোট ছোট চটি আসিবে, প্রথম উজারী চট্টি, তাহার পর ডডোটা চটি, তাহার পর রাণাগ্রাম। ইহার পরে হনুমান চট্টী, রাস্তা মন্দ নয়, হনুমান গঙ্গার পুল করিবার পর বড় সুন্দর স্থানে আসিবেন, অর্থাৎ শীতলার জন্য রাত্র নিদ্রা করিতে থাকিবে। খুবই শীত প্রধান স্থান, (৮॥০ মাইল) হনুমান চট্টী হইতে ধরশালী। এইখান হ'তে বড়ই কষ্টকর চড়াই আরম্ভ হয়, চড়াই করিতে করিতে নাড়ি ভুড়ি পর্য্যন্ত বাহির

হইবার উপক্রম হয়, ইহার উপরে জঙ্গলী বিষাক্ত মাছির উপদ্রব, খুব ভাল করিয়া জামাদি পরিয়া সাবধান হইয়া যান। নতুবা রক্ষা নাই, কামড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুলিয়া উঠিবে, নীচে যমুনোত্রী পাণ্ডবদের একটি গ্রাম। এক মাইল নিম্নে যমুনা নদী পার করিলে বীফ্ গ্রামে বস্তি পাওয়া যায়। এখানে কয়েকখানি দোকান আছে, কালি কমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। ইহার পর যমুনোত্রী।

যমুনোত্রী

অয়ি মধুর মধু্ মোদ বিলাসিনী শৈল বিহারিণী,
বেগভরে পরিজন পালিনী, দুষ্ট নিষাদিনী বাঞ্ছিত
কাম বিলাশ ধরে।
ব্রজপুরবাসি জনার্জিত পাতক হারিণী
বিশ্ব জনোদ্ধারিকে যমুনে জয় ভীতি নিবারিণী,
শঙ্কট নাশিনী পাবয় মাম্॥

সকাল বেলায় যাত্রীরা সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া যমুনা মাই কি জয় দিয়া মার্গ চলিতে লাগিল। খরশালী—হইতে যমুনোত্রী ৪ মাইল দূর। এক মাইল সোজা রাস্তা, তাহার পর ৩ মাইল খুবই কঠিন চড়াই

করিতে হয়। রাস্তাও নিতান্ত খারাপ। কোন ভক্ত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটু রাস্তা করিয়া দিয়াছেন। নতুবা এই সব রাস্তা দেখিয়া পাহাড়ী লোকেরাও ভয় করিয়া বলিয়া থাকে, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী চড়াই, আর কাবুল কী লড়াই একই সমান। যমুনোত্রীর দৃশ্য অতি মনোরম। শীতের কোন ঠিকানাই নাই ; যেন মহাকাল সাক্ষাৎ দাঁড়াইয়া আছেন। প্রায় ২০০০০ কুড়ি হাজার উচু, এক বরফের পর্ব্বত হইতে যমুনার ছোট ছোট অসংখ্য বেগবতী ধারা বাহির হইতেছে। এই স্থানে এত অধিক শীত দাঁড়ান অসম্ভব হইয়া যায়, কিন্তু ভগবানের এমন কৃপা এইখানে এক গরম কুণ্ড আছে, ইহার জল সর্ব্বদা টক্ বক্ করিতে করিতে ফুটিতেছে। যাত্রীরা কাপড়ের কোনায় করিয়া চাইল, ডাউল, খেচরী আলু আদি ফেলিয়া দেয়, যখন সিদ্ধ হয়, তখন আপন হইতে উপরে ভাসিয়া উঠে, লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে বেশ সুস্বাদ্ আমি নিজে তুই॰ সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিত্য খেচরী খাইয়াছি। রুটি ভাল হয় না। এক ধর্ম্মশালা আছে। একটী যমুনার মন্দির আছে। খাদ্যাদি সবই দ্রব্য পাওয়া যায়। অনেক পাণ্ডারা বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এইখানে থাকে, যমুনোত্রী হইতে ফিরিবার কয়েকখানি রাস্তা রহিয়াছে। কিন্তু রাস্তা খুবই খারাপ। যমুনার উৎপত্তি

হিমগিরি পর্ব্বতটির এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়। দূর হইতে যেন যমুনা মাতঃ মস্তকে রৌপ্যময়রূপে অতি সুন্দর মুকুট ধারণ করিয়া বিরাজিত হইয়াছেন। বিশ্ব প্রভুও বিশকর্ম্মা বিভুর কি অপূর্ব্ব কারিগরি তাঁহার এই মনমোহন কারি-গরিকে আমি শত শত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এবং অন্তিম দর্শন করিয়া, এই খণ্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করি।

যেই রাস্তা দিয়া গিয়াছিলাম, পুনঃ সেই রাস্তা ধরিয়া ফিরিতে হইবে। ২৫ মাইল নীচে সিমলী চটি, এইখনে হইতে উত্তর কাশী।

(৭৷৷০ মাইল) নিমলী হইতে সিংগোট। যমুনোত্রী হইতে ফিরিয়া সিমলী চটী পর্য্যন্ত পূর্ব্ব কথিত মার্গে আসিলে, আগে একরাস্তা উত্তর কাশী এবং গঙ্গোত্রীর রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে। ইহার বর্ণন—আমি পূর্ব্বে করিয়াছি। এইবার এইখান হইতে প্রায় দুইমাইল চড়াই ও উতরাই করিতে হয়, এখানে অনেক পার্ব্বতীয় লোকের বস্তি আছে। ইহার ৩৷৷০ মাইল দূরে নাকোরী চটি। তাহার পর আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত, সেই ধরাসু চটি এখান হইতে ভয়ানক জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, হিমালয়ের এই একটি জঙ্গল দেখিলে ভয় ধরিয়া যায়।

উত্তর কাশী

আনন্দমানন্দ বনে বসন্তমানন্দ কন্দং হত পাপ বৃন্দম্।
বারানসি নাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্ব নাথং শরণ প্রপদ্যে

(৩ মাইল) ধরাসূ হইতে উত্তর কাশী। এই পরম পুণিত এবং সুপ্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন তীর্থ, এখানে অনেক প্রাচীন মন্দির আছে, যেই সময়ে দেবাসুরের ভীষণ সংগ্রাম হয় তখন এক শক্তি ছুটিয়া এইখানে পড়িয়াছিল, তাহা বিশেষ দর্শন করিবার তীর্থ, জয়পুর মহারাজের একাদশ রুদ্রের মন্দির দর্শন করিয়া নিন, অতি সুন্দর মন্দির। গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তায় এইখানেই একমাত্র ডাকঘর। কালিকমলীর ধর্ম্মশালা এবং অন্নছত্র আছে, সন্ন্যাসীদের নিত্য প্রাতে আহার দিয়া থাকে। বহু সন্ন্যাসী সংসারের মায়া ত্যাগ কবিয়া এই ঘোর হিমালয়ের বিজন প্রদেশে আসিয়া তপস্যা করিতেছেন। ইহাদের দর্শনেই পুণ্য, সাধুনাং দর্শনাৎ পুণ্যঃ। এইখানে একটি হাসপাতাল, পাঠশালা ও আশ্রমাদি আছে, যেই রকম পূর্ব্বে কাশী পুরি, তদ্রূপ এইখানে উত্তর কাশী, নিকটে বারনাবত পর্ব্বত হইতে বরুণা ও অসি, এই নদীর মধ্যে হওয়াতে বারাণসী হইয়াছে। এইখানেও মণিকর্ণিকার ঘাট রহিয়াছে, বিশাল বিশ্বনাথের মন্দির। যখন পরশুরামের পিতা জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্য দ্বারা হত হন, তখন পরশুরামজী এইখানে আসিয়াছিলেন

ঘোর তপস্যা করেন, তাহার তপস্যায় বিশ্বনাথ প্রসন্ন হ'য়ে তাহাকে সমর বিজয়ী করসা দিয়া ও বর দান দিয়া অন্তর্ধ্যান হ'লেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের পার্শ্বে অন্নপূর্ণার মন্দির, দত্তাত্রেয়ের ও পরশুরামের সুন্দর মন্দির। এই স্থান বিশেষ গরমও নয় শীতও নয়, গরমের সময় ও বর্ষাকালে অনেক বীতরাগ সন্ন্যাসীরা আসিয়া থাকেন। তপস্যার খুবই অনুকূল স্থান। একেবারে নির্জ্জন ও পরম পবিত্র ভূমি। আমি নিজেই দুই বৎসর কাল মৌন হ'য়ে এখানে তপস্যার নিমিত্ত বাস করিয়াছিলাম। এই মহান্ তপস্বী অতিবৃদ্ধ দণ্ডি সন্ন্যাসীর নিকটে কিছু যোগের অভ্যাস করিয়াছিলাম। নদীর ও পর্ব্বতের দৃশ্য অতি রমণীয়। এখানে বহু প্রাচীন এক ত্রিশূল আছে। পরম শান্তির স্থান। রাত্রে গঙ্গার কুল্ কুল্ রবে তপস্যার মহান্ সাহায্য করে। এই সব পর্ব্বতের মধ্যে কোন কোন স্থানের এমন শক্তি অনুভব হয়, যাঁহারা তপস্বী তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। (৩ মাইল) উত্তর কাশী হইতে গঙ্গোত্রী। নিকটেই ডোডিতাল হ'তে অসিগঙ্গা ভাগিরথীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এই তাল বা হ্রদ প্রায় ২ মাইলেরও উপরে লম্বা, চির তুষার মণ্ডিত হিম্‌গিরির মধ্যে এক সুন্দর মঠ, তাহারই পার্শ্বে ডোডি তাল। জল একেবারেই জমিয়া একটী শ্বেত বর্ণ মাঠের মতন হয়। এই রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম, রাস্তা তেমন নাই বলিলে হয়।

যখন তাদের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম, তখন সত্যই মনে হয়, কোন অলৌকিক দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি।

অতি সুন্দর মনোরম দৃশ্য এখান হ'তে দেখা যায়। প্রত্যক্ষ দেব ভূমি বলিলে মন্দ নয়। কেননা এই সব জায়গায় দেবতার মতন পুণ্যবান না হ'লে, আসিতে পারে না।

(৭ মাইল) গঙ্গোরী হ'তে মনেরি।

গঙ্গার খারে, ধারে, সুন্দর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ৩।৪ খানি দোকান আছে। খাদ্যাদি সব পাওয়া যায়। কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে।

(৬ মাইল) মনেরি হইতে মোল্লা চট্টি।

মার্গ বেশ ভাল, কোন চড়াই উতরাই নাই। যাত্রীরা গঙ্গোত্রী হ'তে ফিরিয়া চট্টিতে বিশ্রাম করিয়া থাকে। এখান হ'তে এক রাস্তা বুড়া কেদার হইয়া কেদার নাথ চলিয়া গিয়াছে। ২ মাইল আগে ভট বাড়ী চট্টি আসিবে। ইহার অন্য নাম ভাস্কর প্রয়াগও বলিয়া থাকে। কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। কয়েক খানি দোকান আছে। খাদ্যাদি সব পাওয়া যায়। নিকটে ঝরনার জল। পার্ব্বতীয় লোকের ছোট ছোট ঘরগুলি দেখিতে চমৎকার দেখা যায়। যাত্রার এই একটি জংসন বলিলেও হয়। সূর্য্যদেব এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

(১১ মাইল) মল্লা চট্টি হইতে গঙ্গানানী—

রাস্তা সীধা, নিকটে একটি জলের ধারা, জল একটু একটু গরম, ইহাকে ঋষিকুণ্ড ও ঋষিধারা বলিয়া থাকে। ইহাকেও একটি পরম পুর্ণিত তীর্থ বলিয়া থাকে। ২।৩ খানি দোকান আছে। কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। অতি মনোরম স্থান।

৯ মাইল গঙ্গাননী হইতে সুক্কী।

এই চট্টী হ'তে মজার চড়াই আরম্ভ হয়। যাত্রীরা চড়াই দেখিলে ভয় করিয়া থাকে। চড়াই করিতে করিতে নাড়িভুড়ি বাহির হইবার মতন হয়। গরম গরম দুধ খেতে ইচ্ছা হয়, খেতে পারেন, কয়েক খানি দোকান আছে। একটি ধর্ম্মশালা আছে। পর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং মার্গ অতিক্রম করিতে করিতে আগের চট্টীতে গিয়া বিশ্রাম করেন।

৫ মাইল সুক্কী হ'তে হর্সিল বা হরি প্রয়াগ।

অর্দ্ধ মাইল দূরে শ্যাম গঙ্গা এবং ভাগিরথীর অতি সুন্দর সঙ্গম। এখান হ'তে গঙ্গার অনেক ধারা হ'য়েছে। এই স্থান সমুদ্র হ'তে ১০ হাজার ফুট উচ্চ। এখানে পৌছাতে মনে হইবে যেন কোন দিব্য লোকে আসিয়াছি। এই শ্যাম গঙ্গা হ'তে গুপ্ত প্রয়াগ দু'মাইল দূরে। গুপ্ত প্রয়াগ হ'তে হরি প্রয়াগ অর্দ্ধ মাইল দূরে। কালিকমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। কয়েক খানি দোকান আছে। হর্সিল হ'তে আধ মাইল দূরে আনিয়া

চট্টী। ভাগীরথীর উপরে সুন্দর পুল। একটি দোকান আছে। অতি মনোরম দৃশ্য। দু'মাইল দূরে ধরালী। অর্নিয়ার পুল পার করিলে ধরালী, রাস্তা সীধা। এখানে ধরিয়াল বলিয়া এক জঙ্গলী লোকের বসবাস, ইহারা তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকে। এখান হ'তে এক রাস্তা, নেলঙ্গ খাটী হইয়া কৈলাস মানস সরোবর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ধরালীর আশে পাশে অনেক সাধুর কুঠী ও গুহা আছে। অনেক উন্নত যোগসিদ্ধ পুরুষ তপস্যা করেন। কালি কমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। কয়েক খানি দোকান আছে, এক ডাকবাংলা আছে। ঠিক সঙ্গমের উপরে এক অতি সুন্দর শিব মন্দির আছে। গঙ্গার পরপারে মুখরা মঠ; এক শিব মন্দির আছে। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডারা এইখানে থাকে, প্রায় ১৫০ ঘর বস্তি ইহারই এক মাইল দূরে মার্কণ্ডেয়জীর পবিত্র আশ্রম। অতি মনোরম স্থান, শীতের সময় ছয়মাস গঙ্গার পূজা এখানে হইয়া থাকে। ইহার চারি মাইল দূরে জাঙ্গলা চট্টি, এক ডাকবাংলা আছে। ২।৩ খানি দোকান আছে, খাদ্যাদি সব জিনিষ পাওয়া যায়।

(১০ মাইল) হর্সিল হইতে ভৈরো ঘাটী।

দুই মাইল খুব শক্ত চড়াই করিবার পর দু' মাইল উতরাই, পুনঃ ১॥ মাইল চড়াই করিবার পর একটি গন্ধকের পর্ব্বত আসিবে, এই স্থানের পর্ব্বত ও জমীন একটু একটু গরম।

শীতের দেশে গরম খুবই আরাম, অমৃতং শিশিরে বহ্নিঃ---দেব দারুর ঘোর জঙ্গল, এমন জঙ্গল সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করাও অসম্ভব। একটি ধর্ম্মশালা ও কয়েকখানি দোকান আছে, এক মাইল দূরে ভৈরবজীর মন্দির, পরম শান্তির স্থান, ইহার পর গঙ্গোত্রী।

অষ্টাদশ খণ্ড

গঙ্গোত্রী

শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজ জলে মজ্জজ্জনোত্তারিনী,
পারাবার বিহারিনী ভব ভয় শ্রেণী সমুৎসারিনী।
শেষাহেরনুকারিনী হরশিরোবল্লীদলা কারিনী,
কাশী প্রান্ত বিহারিনী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিনী।

(শঙ্করাচার্য্য কৃত্য)

অর্থাৎ :—

"মাতঃ গঙ্গা পর্ব্বত রাজ হিমালয় হইতে নিম্নদিকে প্রবাহিত হইতেছেন, যিনি তাঁহার নীরে স্নান করেন, তাহাদের সদ্য উদ্ধার করেন, আবার তিনি মহাসমুদ্রে বিহার করেন, সংসারের জন্ম মরণাদি ভয় সমুদয়কে ধ্বংস করেন, শেষ নাগের সমান বাঁকা চালে চলেন, ভগবান্ শ্রীশঙ্করে মস্তকের উপর লতা,

পত্রের সমান আকার, পরম পাবনী শ্রীকাশী প্রদেশে উত্তর বাহিনী রূপে প্রবাহিত হইয়া মন হরণ করিতেছেন, শ্রীগঙ্গা ভগবতী বিজয়িনী হইয়া রহিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীগঙ্গা মহারাণীর সদাই জয়। মাতঃ গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করা অসম্ভব, স্বয়ং সারদা দেবী অনন্তকাল পর্য্যন্ত যাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে পারিতেছে না, তাঁহার মহিমা আমার মত অজ্ঞানী জীব — কি বর্ণন করিবে? যদি কোন পুণ্যের প্রভাবে মায়ের মনোহর তরঙ্গের শোভা নয়নের সমক্ষে আসিয়া যায়, তবে তাহার সংসার সাগরের মহা সঙ্কটময় তরঙ্গের দর্শন কি রকমে হইতে পারে?

ভৈরব ঘাটী হইতে গঙ্গোত্রী সাত মাইল দূর। (হরি ১৯৩ মাইল) যেই স্থান হইতে ভাগীরথীর মুখ্য—উৎগম স্থান অর্থাৎ গোমুখ ১৮ মাইল দূর। রাস্তা অতি দুর্গম বলিয়া, যাত্রীরা আপন মনোকামনা এই খান হইতে পূর্ণ করিয়া থাকে। এই খানে স্নান তর্পনাদি করিতে হয়। এই খান হইতে গঙ্গাজল লইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরের উপরে চড়াইয়া থাকে। কিছুদূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমি, দেবদারুর অসংখ্য জঙ্গল। শীতের কোন ঠিকানা নাই বলিলেও চলে। এইখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মন্দির, এবং মহারাজ ভগিরথের মন্দির ও পূজ্য শঙ্করাচার্য্যের মন্দির বিদ্যমান।

গোমুখ হইতে গঙ্গার প্রধান উৎপত্তির স্থান। আমি এবং পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাংরা জিলার কৃপানাথজী মহারাজ দুইজনে অতি কষ্টের সহিত গিয়াছিলাম। এই খানে বসিয়া সগর বংশের উদ্ধারক মহারাজ ভগীরথ ঘোর তপস্যা করিয়া গঙ্গামাতা, পতিত পাবনী কলি কলুষনাশিনী পরম পুণ্যবতী জাহ্নবীকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। গঙ্গামাতা তাহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া, কপিল শাপাভীষ্ট সগর বংশ উদ্ধার করিয়া ভক্তের মহিমা প্রচার করিয়া ছিলেন।

ছোট খাট একটি পর্ব্বতের উপরে গঙ্গার তীরে একটী বাজার কালি কমলীর ও পাঞ্জাব সিন্ধু ছত্রের ধর্ম্মশালা এবং অন্ন ছত্র ও আছে। বহু সন্ন্যাসী সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই বিজনে হিমালয়ের তপস্যা করিতে আসিয়া থাকেন। এইখানে কোন ডাকঘর আদি কিছুই নাই। ইহার নিতান্ত প্রয়োজন। আমি নিজে বহুদিন যাবত এখানে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম। অতি উন্নত ও পরম পবিত্র ভূমি, দিবারাত্র কেবল একই শব্দ শ্রুত হইবে। গঙ্গার কুল কুল শব্দ ও হিমালয়ের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য চক্ষে না দেখিলে বর্ণন করা অসাধ্য। নিকটে পাহাড়ী লোকের বসবাস, দূর হইতে ঘরগুলি যেন এক একটি দেশলায়ের বাক্সের মত মনে হয়। একটি অতি প্রাচীন ত্রিশূল এখানে দেখিবার মতন। সমুদ্র হইতে

১৫ হাজার ফুট উচ্চ, সাধুদের তপস্যা করিবার জন্য মারওয়ারী কমিটি হইতে ভিন্ন ভিন্ন সব কুঠী করিয়া দিয়াছেন, এইবার সব দেবতা ও সাধুদের দর্শন ও প্রণাম করিয়া উত্তর কাশীর দিকে অগ্রসর হওয়া যাক এবং মনে মনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চলেন।

সন্থ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যঃদুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ॥

গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাত্রা ডেরাডুন মসুরী হইয়া।

ডেরাডুন হইতে রাজপুর সাত মাইল, রাজপুর পর্য্যন্ত টাংগা, মটর সব পাওয়া যায়। এক ধর্ম্মশালা ও একটি শিবালয় আছে। ডেরাডুন ষ্টেশন হইতে সীধা বাস্ (মটর) মুসুরী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, যদি হাঁটিয়া চলেন তবে প্রথমে রাজপুর সাত মাইল। রাস্তা প্রায় ৫॥ মাইল চড়াই করিবার পর বালুগঞ্জ আসিবে, ২ মাইল দুরে মসুরী বাজার। এখানে এক শিবালয় আছে, খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে বহুলোক গরমের সময় আসিয়া থাকে, এখানে ডেরাডুন ছোট একটি বাজারের মত দেখা যায়, অতি মনোরম দৃশ্য দেখা যাইবে। নিম্নদিকের দৃশ্যও অতি সুন্দর দেখা যায়।

(৬ মাইল) মসুরী হইতে সুবাখালী।

এখান হ'তে দুই রাস্তা, একটি উত্তর কাশী গিয়াছে।

অন্যটি কানাতাল হইয়া সীধা টিহরী রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছে। একটি ধর্ম্মশালা আছে, কয়েকখানি দোকান আছে।

(৬ মাইল) স্‌বাখালী হইতে খত্যুড়া।

রাস্তা উতরায়েই কোন কষ্ট হয় না।

(৫ মাইল) খত্যুড়া হইতে মোলধার।

রাস্তা এখান হইতে চড়াই, তবে তেমন কোন কষ্ট হয় না।

(৭ মাইল) অংধিয়ারী হ'তে ত্যাড় চট্টি। একটি ডাকবাংলা আছে, দু' মাইল উতরাই করিবার পর, ৪ মাইল কঠিন চড়াই করিতে হয়, চড়াই করিতে করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'বার মত হয়।

(৭ মাইল) ত্যাড় চট্টি হ'তে ধরায়ু।

ইহার ছয় মাইল দূরে গঙ্গোত্রীর রাস্তা পাওয়া যায়। যাহার বর্ণনা আমি পূর্ব্বে করিয়াছি।

ধরায়ু হ'তে গঙ্গোত্রী ৭৫ মাইল।

গঙ্গোত্রী হ'তে কেদার নাথ ১২৩ মাইল।

গঙ্গোত্রী হ'তে মল্লার চট্টি পর্য্যন্ত ৪০ মাইল। যাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ইহার আগে খুবই হৃদয় বিদারক ভীষণ রাস্তা। প্রথমে প্রথমে খুবই কষ্ট হয়, রাস্তা একেবারেই ভাল নয়। শীতের কোন অভাব নাই।

[৩ মাইল] মাল্লা চট্টি হইতে সৌরাকীগাড়।

রাস্তা একরকম মন্দ নয়। একটি ধর্ম্মশালা আছে। কয়েকখানি দোকান আছে। খাদ্যাদি সবই পাওয়া যায়।

[৬ মাইল] সৌরাকীগাড় হইতে ফ্যাল চট্টি।

ইহার পর মরণ সমান চড়াই আরম্ভ হয়। প্রায় ১২ মাইল পর্য্যন্ত চড়াই করিতে হয়। ইহার পর উতরাই। পঙ্গুরানা পর্য্যন্ত আসিয়া উতরাই আরম্ভ হয়।

[৪ মাইল] পঙ্গুরানা হইতে, ঝালা চট্টি।

প্রথমে ১ মাইল চড়াই, তাহার পর উতরাই। ঝালা চট্টি হইতে বুড়া কেদার পাঁচ মাইল দুরে। সুন্দর মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। তিন মাইল দুরে অঙ্গুটা গ্রাম আসিবে। তাহার পর বুড়া কেদার। অতি রমনীয় পবিত্র স্থান একটি ধর্ম্মশালা আছে। কয়েকখানি দোকান আছে। এই বুড়া কেদারে আমি কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম। এইখানে এক অতি বৃদ্ধ সাধুর দর্শন হয়, জানিতে পারিলাম তিনি এইখানে ৮০ বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। তাহার বয়স ১৫০ বৎসর। খুব কম কথা বলেন। কেবল সিদ্ধ আলু খাইয়া থাকেন। গত ১৯৪০ সনে শুনিলাম তিনি দেহ রাখিয়াছেন।

[৭ মাইল] বুড়া কেদার হইতে ভৈরব চট্টি।

মধ্যে তোলা চট্টি আসিবে। হনুমান ও ভৈরবের দর্শন করিয়া নিন্। কিছু জল খাবার খাইয়া চড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। প্রায় নয় মাইল কঠিন চড়াই করিবার পর, ভিল্লাঙ্গনা নদীর তীরে এক অতি সুন্দর রঘুনাথের মন্দির আছে। ইহার

পর পুনঃ ৭ মাইল কঠিন চড়াই করিবার পর পংবালী চট্টি আসিবে।

[১৪ মাইল] ভৈরব চট্টি হইতে পংবালী।

এইখানে এক কালিকমলীর ধর্ম্মশালা আছে। কয়েকখানি দোকান আছে। নিকটে ঝরণা, রান্না করিতে হয়, এইখানে করিয়া নিন। স্থান শীতল।

[০ মাইল] পংবালী হইতে মগু চট্টি।

পংবালী হইতে প্রায় ১॥ মাইল রাস্তা বরফের উপর দিয়া চলিতে হয়। সমুদ্র হইতে প্রায় ১৩ হাজার ফুট উচ্চ সমস্ত শরীর একেবারেই অবসন্ন হইয়া যায়। মৃত্যু যেন সম্মুখে, মনে হয় নৃত্য করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি যায় সে দিকে চির তুষারাবৃত বরফ, সত্যই যেন আমি স্বর্গ রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছি। চতুর্দ্দিকে চির শান্তিময়ী যেন শান্তরথে ডুবিয়া যাইতেছে, বরফের রাস্তা পার করিবাব পর অবশিষ্ট ৫ মাইল পথ মন্দ নয়। এখানে কয়েকখানি দোকান আছে, একটি ধর্ম্মশালা আছে, ইহার ৫ মাইল আগে ত্রিযুগী নারায়ণ, এখান হ'তে বড় রাস্তা আসিবে। যাহার বর্ণনা আমি পূর্ব্বে করিয়াছি। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কেদারনাথ বাবার দর্শনের পথ পাওয়া যাইবে।

নন্দ প্রয়াগ হ'তে গরূঢ় হইয়া আলমোড়া। বদ্রীনাথ হ'তে নন্দ প্রয়াগ ৫৫ মাইল, নন্দ প্রয়াগ পর্য্যন্ত বদ্রীনাথের রাস্তায়

ফিরিয়া আসিলে এক পথ সিধা গরুড় বৈদ্যনাথ চলিয়া গিয়াছে। গরুড় নন্দ প্রয়াগ হ'তে ৪০ মাইল, গরুড় হ'তে মটর করিয়া সীধা ৪ দিনের মধ্যে আলমোড়া চলিয়া যেতে পারেন। আমি নিজে একবার এই পথে গরুড় গিয়াছিলাম, পথ নিতান্ত খারাপ এবং ভয়ানক জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে হয়। প্রায় রাস্তা খুব কঠিন চড়াই, খাদ্যাদি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভাল, একা চলাই বিপদজনক, অনেক হিংস্র জঙ্গলী জন্তু আছে। গরুড়ে আসিলে আমার এক পূর্ব্ব পরিচিত রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তার শ্রীমান মন্মথ নাথ পালধির সঙ্গে দেখা হয়। তিনি এখানে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের একটি হাসপাতালের ডাক্তার হইয়া সপরিবারে বাস করেন। তিনি পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তার হইয়া কৈলাস যাত্রার পথে ধারচুলা নামক স্থানে আশ্রমে কাজ করিতেন। যখন আমি বদ্রীনারায়ণ হ'তে কৈলাস যাত্রা করিয়া আল্‌মোড়ার পথে ফিরিতে ধারচুলা আশ্রমে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়াছিলাম, তখন সেই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অনুভবানন্দজী মহারাজ ছিলেন। তিনিও দু'বার কৈলাস যাত্রা করিয়াছিলেন জানিলাম। গরুড়ে আরও একজন ভক্ত পাহাড়ী ভদ্রলোক সের সিংহ নামক লোকও বেশ কয়েকদিন সেবা করিয়াছিলেন। প্রায় একমাস এখানে আমি বাস করিবার পর মোটরে করিয়া আলমোড়ায় আসিয়া থাকি। গরুড় বেশ বড়

বস্তী, বৈদ্যনাথের বিশাল মন্দির, বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কয়েকখানি দোকান আছে, স্থান বিশেষ শীতল নয়।

কর্ণ প্রয়াগ হইয়া রাণীখেত

বদ্রিনাথ হ'তে সীধা পথ ধরিয়া কর্ণ প্রয়াগ পর্য্যন্ত আসিয়া যান, কর্ণ প্রয়াগ হ'তে বদ্রিনাথ ৬৭ মাইল দুর। কর্ণ প্রয়াগ হ'তে আদিবদ্রী ১২ মাইল। ছোট ছোট দুইটি চট্টি পাওয়া যায়। আদি বদ্রীর খুবই মনোহর মূর্ত্তি। এই মন্দির ও অতি প্রাচীন। দ্বিতীয় দিন ধুনার ঘাট ১১॥ মাইল। ইহা খুবই বড় চট্টি। তৃতীয় দিন ১৪ মাইল গনাই চট্টি। ইহাকে চটি না বলিয়া, ছোট খাট একটি বাজার বলিলেও হয়। চতুর্থ দিন গনাই হইতে দ্বারহাট ১২ মাইল দুরে। এই নগর আল্মোড়ার এক প্রসিদ্ধ স্থান। আমি কয়েক দিন এখানে বাস করিয়াছিলাম। এখান হ'তে ৪টি পথ চার দিকে চলিয়া গিয়াছে, এস্থান একটি জংসন বলিলে হয়। খুব স্বাস্থ্যকর স্থান।

কর্ণ প্রয়াগ হ'তে গণাই পর্য্যন্ত রাণীখেতের পথ ধরিয়া আসিলে, এক পথ রাম নগরের দিকে সীধা চলিয়া গিয়াছে। প্রথম দিন চলেন আপলা ৯ মাইল দুর। দুই তিন দোকান আছে। দ্বিতীয় দিন ৯ মাইল দুর ভিকিয়াসৈড্ নামক স্থান। খাদ্যাদি তৈয়ার করিয়া আহার করিয়া নিন্। এইবার ৫ম দিনের শেষ পথে রাম নগর চলিয়া আসেন এবং রেলে বসিয়া

বদ্রীনাথজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া যার যাহা গন্তব্য জায়গায় গমন করেন ও মনে মনে হিমালয়কে প্রণাম করিয়া অন্য অধ্যায়ে আরোহন করেন এবং মনে রাখিবেন হিমালয়ের অনন্ত পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য, অনন্ত বৃক্ষের সৌন্দর্য্য, অনন্ত হিমের সৌন্দর্য্য এবং প্রাণের সহিত অনন্ত পর্ব্বতের রচনাকারি মহান্ বিভুকে নিত্য প্রণাম করিয়া; এবং বাবা বদ্রীনাথজীর শ্রীচরণ কমলে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

করচরণ কৃতং বাক্যায়জং কর্ম্মজং বা,
শ্রবন নয়নজং বা মানসং বা পরাধম্।
বিহিতম বিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব,
জয় জয় করুনাব্ধে! শ্রীমহাদেব! শম্ভো॥

ষষ্টম অধ্যায়

কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা।

যস্য স্বাদু ফলানি ভোক্তুমভিতো লালায়িতাঃ সাধবঃ।
ভ্রাম্যন্তি হ্যনিশং বিবিক্ত মতয়ঃ সন্তো মহান্তো মুদা॥
ভক্তি জ্ঞান বিরাগ যোগ ফলবান সর্ব্বার্থ সিদ্ধি প্রদঃ।
সোহয়ং প্রাণি সুখাবহো বিজয়তে হৈমাদ্রি কল্পদ্রুমঃ॥

ভ্রমণ স্পৃহা আমার স্বভাব গত বলবতী। এ স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া এ শরীরে ভারত ও ভারতের বাহিরে বহুদেশ এবং তীর্থাদি ভ্রমন করিয়াছি। প্রায় ৮ বৎসর ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পুরঙ্গ নামক জায়গায় ইরাবতী গঙ্গার তীরে শিবালয়েও কালিদেবীর মন্দিরে থাকা কালীন, সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা মালয় দেশ এবং কলোন হইয়া হংকং চীনদেশ এবং জাপানে সাতমাস ভ্রমন করিয়াছিলাম। চীনে ভ্রমনকালে সাংহাই হইতে সাইবিরিয়ার রেলে করিয়া, মাঞ্চুরিয়ার সীমা পার করিলে সাইবিরিয়ার সীমার গাড়ী আসিলে, প্রাতঃকালে ৮টার সময় রুশের পুলিশের হাতে বন্দি হই এবং হাজতে এক সপ্তাহ থাকিবার পর পুনঃ পিছনে ফিরাইয়া দিলেন। অগত্যা পুনঃ হংকংএ ফিরিয়া আসিতে হয়। কারণ আমার নিকট রুশ ভ্রমণের অনুমতি (বা পাশ) ছিল না। কেবল চীন ভ্রমনেরই

অনুমতি পত্র ছিল। ইহার কিছুদিন পরে হংকংএ শেঠঝণ্ডুমল প্রসিদ্ধ তুলাআদির ব্যবসা করিয়া থাকেন, তাহার বাসায় আসিয়া কিছুদিন থাকার পর, জাপান ভ্রমনের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করি, কেবল সাত মাস মাত্র জাপান ভ্রমণের অনুমতি পাইয়াছিলাম। প্রথমে ইককোয়ামায় দু'মাস, ওসাকায় একমাস এবং টোকিওতে ৪ মাস বাস কালিন একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা হইল। এই বাঙ্গালীকে অনেকে জানেন বোধ হয়, তাঁহার নাম রাস বিহারী ঘোষ, এরূপ নির্ভীক সাহসী ও দেশ প্রেমিক লোক খুবই কম দেখা যায়। তাঁহার সাহায্যে আমি এখানের বস্তুবিষয় অবগত হ'লাম। যদি জাপান ভ্রমন লিখা যায়, তবে পুস্তক অনেক বড় হয়ে যাইবার ভয়ে বিশেষ বর্ণন করিলাম না। কিন্তু এখন তিব্বত ভ্রমণ পড়েন।

সাত মাস জাপানে অতিবাহিত করিবার পর, পুনঃ হংকংএর সেই বিকানেব ঝণ্ডুমলের বাসায় আসিয়া, বহুদিন ছিলাম। তিনি অতি সদয় ও পরোপকারী ভদ্র লোক। তাঁহারই সাহার্য্যে চীন, জাপান, কোরিয়া ভ্রমণ করিয়া, দু'বৎসর পরে পুনঃ ব্রহ্মদেশে আসিবার সময় সুমাত্রা, জাভা এবং সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তাহার পর ভারতে আসিয়া, কাবুল, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, হিরাট, কান্দাহার, 'গজনি এবং মক্কা মদিনাদি ভ্রমণ করিয়াছি। আফগানিস্থানে ভ্রমণ করিবার সময় গজনীতে বহু প্রাচীন হিন্দুর প্রতিমা ভগ্নাবস্থায় পরিয়া আছে, তাহার কোন ঠিকানাই নাই।

বেলুচিস্থানের অন্তর্গত কোয়েটা থাকা কালীন প্রসিদ্ধ ভূমিকম্প দেখিয়াছি এবং আমিও সামান্য আহত হইয়া হায়দারাবাদে আসিয়া, বিশ্রাম নিবার পর, পুনঃ ব্রহ্মদেশে চলিয়া যাই। কোয়েটার সেই বিচিত্র ও ভয়ানক দৃশ্য মনে আসিলে এখনও শরীর শিহরীয়া উঠে। এই সব স্থানে ভ্রমণ কালীন কত ধনী, মানী, বিদ্বান, মূর্খ এবং কত প্রকারের সাধু সন্যাসীর দর্শন করিলাম, তাহাও এক আশ্চর্য্য; সব যদি লিখা হয়, তবে একটি মহাভারত হইয়া যাইবে। সেজন্য কেবল আমি হিমালয়ের বিষয় মাত্র বর্ণনা করিব। এই সব ভ্রমণের সময় কত বিপদ হ'য়েছিল, এবং কত ডাকাত ও চোরের হাতে পড়িয়াছিলাম, তাহার কোন ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু ৺ভগবানের কৃপায় ও গুরুর কৃপায় সমস্ত বিপদ হ'তে রক্ষা পাইয়া, বঙ্গের সন্তান বঙ্গেই ফিরিলাম। যত দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, হিমালয়ের মত শান্তি আমি কোথও পাই নাই। যে সুস্বাদু ফল খাইবার জন্য দিবা-নিশি সাধুরা ভ্রমণ করিয়া থাকেন সেই সুস্বাদু ফল এই হিমাদ্রি শিখরে ভ্রমণ করিলে নিশ্চয় পাওয়া যাইতে পারে। আর একটি ইচ্ছা তিব্বতি লামা সাধুর সঙ্গ করা, দর্শন করা। ইহাদের মধ্যে অনেক যোগী পুরুষ আছে এবং আমার সঙ্গে ২।৩ জন অলৌকিক যোগী পুরুষেরও সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণন করিব। তিব্বত একটি সাধুর দেশ বলিলে হয়। ইহা একটি যোগী লোকের ও

দেবগণেরই স্থান। এই ভূমিতে দেবাদিদেব মহাদেব সদাই বাস করেন। সেই জন্য তিব্বতেই কৈলাস পর্ব্বত। গৌরি শঙ্কর আদি অতি উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত শিখর সৃষ্টির আদি হইতে দাঁড়াইয়া আছে। তিব্বতের জল, বায়ুও যোগীর পক্ষে অনুকুল। এইবার তিব্বত ভ্রমণের বিষয়ে বর্ণনা করিব। (আমি সন ১৯৩০ ইং ২০শে এপ্রিলে বাহির হইয়া পড়িলাম) ঋষিকেশে আসিয়া কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার পর এক বৃদ্ধ দণ্ডী সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ি। এই স্বামীজি দুইবার তিব্বত যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে তিব্বতের অনেক বিষয় জানিতে পারিলাম। ইনি যোগের বিষয়ে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন, আমিও কয়েক বিষয় ইহার নিকট শিক্ষা করি। প্রায় ৯০ বৎসর বয়স হইবে, কিন্তু চেহারা দেখিলে, মনে হয়, ৪০।৪৫ বৎসরের অধিক হইবে না। ইনি শ্রীনগর পর্য্যন্ত যাইবেন। তাঁহারই উৎসাহে আমারও যেন নব রক্তের সঞ্চার হইল। 'কই ডর নহী' নির্ভয়ে চলিয়া যাও। ভগবান তোমার সঙ্গি হইবেন। পূর্ব্ব বর্ণিত বদ্রীনাথের রাস্তা ধরিয়া যোশী মঠে আসিয়া, অপেক্ষা করিতে থাকি, কোন সঙ্গী মিলে কিনা; ভগবৎ কৃপায় হঠাৎ একদিন কয়েকজন তিব্বতি ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হইল। তাহারা জ্ঞানামা মস্তি পর্য্যন্ত যাইবে। ইহাদের সঙ্গে প্রায় ৪০টি ভেড়াও ছিল। এই দেশে ভেড়া ও চামরী গরুর

পিঠে করিয়া ব্যবসা করিয়া থাকে। তিব্বত হইতে ইহারা চর্ম্ম, শিলাজিত, কস্তুরী ইত্যাদি লইয়া আসে। নিম্ন হইতে লবন ও বস্ত্রাদি লইয়া যায়, আমি বুঝিলাম, ইহাদের সঙ্গে যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। অতএব একদিন সকালে ইহাদেরই সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। যাইবার পূর্ব্বে কিছু আটা ঘৃতের সঙ্গে চিনি মিলাইয়া কয়েকটি লাড্ডু করিয়া নিলাম এবং এক একটি করিয়া খাইয়া মার্গ চলিলাম। বদ্রী নারায়ণের পূজারী বা রাবণ আমার জন্য তাহাদের নিকট আরও একটু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। আমিও মনে করিলাম, হয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করিব নতুবা এই নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিব। (মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন) দুর হইতে পিতৃ পুরুষগণকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। প্রথম দিন যাত্রা ১৯৩০ ইং ১৭ই মে সোমবার প্রাতঃকালে সাত মাইল দুরে তপোবন যোশীমঠ হইতে—

মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পতয়াম্য হম্।
এবং ভাবং সমাশ্রিত্বা জপেণ্মন্ত্রং নিরন্তরম্॥

কৈলাস ১৩০ মাইল, প্রথম হইতে খুবই কঠিন চড়াই করিতে হইবে। রাস্তাও তেমন ভাল নয়। মাইলের কোন বিশেষ চিহ্ন না থাকাতে আমি বর্ণনা করিতে পারিলাম না। কেবল বড় বড় যায়গার নাম মাত্র দিলাম। সাত মাইল দুরে তপোবন সত্যই নামের সার্থকতা আছে। এত

সুন্দর ও শান্তিময় স্থান এই তপোবন তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। দূর হইতে হিমালয়ের চির তুষারাবৃত হিমগিরির উচ্চ শিখরগুলি দেখিলে মন মাতয়ারা হইয়া যায়। কোন সময়ে পাণ্ডবেরা এই খানে তপস্যা করিয়াছেন বলিয়া থাকে। আমি ইতিপূর্ব্বে এইখানে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম নিকটে একটি দেবীর মন্দির আছে। এই মন্দিরে বলি আদি হইয়া থাকে, শুনা যায়—এইখানে পূর্ব্বে নরবলিও হইত। সরকার তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

দার্ব্বাগ্রাম— তপোবন হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূর। কিছু-দূর যাইবার পর একটি নদী পার হইতে হয়, দড়ির ঝোলার মতন পুল, আমি কষ্টে পার হইয়াছিলাম। নদী পার তিব্বত লাগিয়া যায়। এইখানে ২।৩ টী দেকোন আছে। খাদ্য জিনিষ সব পাওয়া যায়। আমি একটি দোকানের বারাণ্ডায় আসন করিয়াছিলাম। কিন্তু রাত্রে এত অধিক বিচ্ছু কামড়াইল, নিদ্রা তেমন হইল না। আমার সঙ্গিরা দেখি যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল। এইবার মজার চড়াই ও উত্তরাই আরম্ভ হইল; এত কঠিন চড়াই যেন দম আটকাইবার উপক্রম হয়। শীতের কোন ঠিকানাই নাই বলিলে হয়। যেন পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্য্যন্ত শীতে জমিয়া যাইতেছিল।

দমপুম গ্রাম— দার্ব্বা হইতে প্রায় ২৫ মাইলেরও অধিক।

সাত মাইল কঠিন চড়াই করিতে হয়। একটি নদী পার হইবার সময়ে পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেলাম। যদি সঙ্গের লোকেরা না ধরিত, তাহা হইলে জীবনের কৈলাস যাত্রা এইখানে শেষ হইয়া যাইত। খাদ্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়। কাঠও কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাস্তা খুবই খারাপ, শীতের কোন ঠিকানা নাই। এই দেশের তিব্বতিরা ছাতু ও মাংস অধিক আহার করিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে চির তুষারাবৃত পর্ব্বত শ্রেণীর ভিতর দিয়া, নদীর ধারে ধারে রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। কোন কোন স্থানে বরফের উপর দিয়া মার্গ চলিতে হয়।

শিব চিলিঙ্গ—দমপুম হ'তে প্রায় ২৪।২৫ মাইল। এইখানে বৌদ্ধদের একটি মঠ আছে। কয়েকখানি দোকান আছে। নিকটে কালী নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই মঠের নাম ডুডুন গুম্ফা বলিয়া থাকে। এই মঠের একজন পরিব্রাজক ভিক্ষুক লামা সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি দুইবার ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। বড়ই উদার প্রকৃতির সাধু, তিনি যাবতীয় খাদ্য কাঁচাই খাইয়া থাকেন। তিনি নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিয়া, আমাকে দিয়া বলিলেন, তিব্বতে যে কোন মঠে এই পত্রখানি দেখালে, তোমাকে অতি আদরের সহিত রাখিবে। এমঠে যাইবার পর সঙ্গিদের সঙ্গ আমাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিতে হয়, কারণ ইহারা আর আগে যাইবে না।

এখানে ইহাদের বাড়ীঘর। সাধুটির সাহায্যে আমার আগে যেতে কোনও কষ্ট হয় নাই। তাঁহারই সাহায্যে তিব্বতে অনেক কিছু জানিলাম। প্রায় আমি এস্থানে ৬ দিন ছিলাম, তিব্বতের একটি ছোট খাট সহর বলিলে হয়। ভারতের দিক হ'তে বহু ব্যবসায়ী লোক ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে; ইহারা এখান হ'তে লোম ও লোমের কম্বল দ্রব্য চামরাদি ল'য়ে যায়। নিকটে তিব্বতী লোকের বসবাস। খুবই শীতপ্রধান স্থান। এখানের দৃশ্য অকথনীয়, দূর হ'তে বরফের পাহাড়গুলি বড় সুন্দর দেখায়। দোকানে খাদ্যাদি পাওয়া যায়। ইহার পর বড়ই কঠিন মার্গ অতিক্রম করিতে হ'য়েছিল, রাস্তা নাই বলিলে হয়। রাস্তায় চলিবার সময় মাথা ঘুরিতে থাকে। এত হালকা বায়ু শ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হয়। এই শিবচিলিঙ্গ হ'তে কয়েকজন তিব্বতী যাত্রীদের সঙ্গী হ'লাম। তাহারাও তিব্বতের সেই তপভূমি কৈলাস মানস্ সরোবর যাইবে। জানিলাম এবৎসর কৈলাসে কুম্ভ মেলা হইবে।

জ্ঞানামা মণ্ডি—শিব চিলিঙ্গ হ'তে প্রায় ২২ মাইল রাস্তা। প্রথম প্রথম বেশ একটু ভাল, পরে ভীষণ মার্গে চলিতে হয়। জ্ঞানামা মণ্ডি তিব্বতের একটি জিলার সহর ও বন্দর। বহু জিনিষের আমদানি রপ্তানি হ'য়ে থাকে। দুটি মঠ বা গুম্ফা আছে। যে পরিচয় পত্র শিবচিলিঙ্গ হ'তে সাধুটি দিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া মঠে দেখাতে আমাকে আদরের সহিত

ভিতরে নিয়া গিয়া একটী কোঠায় বিশ্রাম করিতে বলিলেন। এই মঠে আমি প্রায় আট দিন ছিলাম। দেশী সাধু বলিয়া আমাকে সকলে কাশীর লামা বলিয়া ডাকিত। এখান হ'তে যাত্রীরা কৈলাস যাইবার সব বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। পথ প্রদর্শক না থাকিলে যাত্রা সম্পূর্ণ করা অসাধ্য। ইচ্ছা হয়, এখান হ'তে (ঝব্ব) অর্থাৎ তিব্বতের চামরী গরু, তাহার পিঠে চড়িয়া তিব্বত যাত্রাও করিয়া থাকে এবং জিনিষ পত্র বহন করিয়া থাকে। এখান হ'তে বড় কঠিন রাস্তা, প্রায় ২।৩ দিনের আহার সঙ্গে করিয়া নিতে হয়। এনগর হ'তে আরও তিনটী রাস্তা তিন দিকে চলিয়া গিয়াছে। একটী তিব্বতের রাজধানী লামাতে একটী তীর্থ পুরী নামক স্থানে, অপরটী বদরীনাথে, কুম্ভ মেলা হওয়াতে, বহু ভুটানী ও তীব্বতী দল বাঁধিয়া যেতেছিল। এনগর অতি প্রাচীন স্থান ও রমণীয়। জ্ঞানামা মণ্ডি হ'তে তীর্থপুরী প্রায় ১২ মাইল রাস্তা। তীর্থপুরী শতদ্রু নদীর তীরে, ইহাও তিব্বতীদের পরম পবিত্র স্থান। তিব্বতে দু'বর্ণের লোকের বসবাস, একটী তাসীলামা, অন্যটী দলাইলামা। দলাইলামাই শ্রেষ্ঠ বর্ণের মধ্যে গণ্য। ইহারাই রাজ্য শাসন করিয়া থাকে। দলাই লামাই তিব্বতের রাজমুকুট ধারণ করিয়া থাকেন। এই তীর্থ পুরীতে একদিন ভারতীয় ক্ষত্রিয় বীরেরা হিন্দুর বিজয় পতাকা উড়াইয়া ছিলেন। ইহার কিছু দূরে অর্থাৎ প্রায় ১২ মাইল দূরে তাকলা 'কোট. এবং প্রাচীন হিন্দুর

দুর্গ, নদীর ধারে রাস্তা, পার্শ্বে তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত শ্রেণী। এই পর্ব্বতের নাম মান্ধাতা পর্ব্বত নামে পরিচিত, এই তীর্থ পুরী পর্যান্ত কে জয় করিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকগণকে করাইয়া দিব। কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোলাপ সিংহের এক সেনাপতি ছিল। তাঁহার নাম জোরাবর সিং। তিনি অতি সাহসী বীর যোদ্ধা এবং মহাপ্রতিভাশালী বীর পুরুষ ছিলেন, ইংরেজ যথন পাঞ্জাব গ্রাস করিতে ছিলেন, সেই সময়ে গোলাপ সিংহের সেনানি হিমালয়ের উত্তর ভাগ জয় করিয়া রণ বিষয়ক অনেক বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

জোরাবর সিং লাদক নামক স্থান জয় করিয়া, তাঁহার বিজয় বাহিনী লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। যে স্থানে তিনি উপস্থিত হয়েন, সেই স্থানে বিজয় লক্ষ্মী তাঁহার অঞ্চলগত হইতে থাকে। এইরূপভাবে জয় করিতে করিতে শতদ্রুর তটে, এই তীর্থ পুরীতে আসিয়া, তিনি তাঁহার বিজয় শিবির স্থাপন করেন। এই সময়ে তিব্বতী সেনাপতি ৮ হাজারেরও অধিক সেনা লইয়া, ভারতীয় সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছিল। জোরাবর সিং এ সংবাদ অবগত হইয়া, তিব্বতীয়দের উপর অতর্কিতভাবে একদিন আক্রমণ করিয়াছিল। বজ্রের ন্যায় প্রবল ভাবে বরখার প্রান্তরে তিব্বতীরা আক্রান্ত হইয়া, ৮ হাজার তিব্বতী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

ভারতীয় কেবল দেড় হাজার সৈন্যের হস্তে ৮ হাজার সৈন্যের পরাজিতের সংবাদ পাইয়া, তিব্বত বাসীদের দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইল, জোরাবরের নামে সকলে বিবশ হইয়া পড়িল, জোরাবরের অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা ভারতবাসী ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিব্বতীরা তাহাদের সেই দারুণ বিপদের কথা এখনও ভুলে নাই।

বীরবর জোরাবর সিং যে স্থানে অবস্থান করিয়া, এই পবিত্র তীর্থপুরীতে জয় পতাকা উড়াইয়াছিল, তাহার চিহ্ন নির্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও তাকলাকোটে সাক্ষি দিতেছে। জোরাবর সিং তিব্বতী সৈন্যগণকে পরাজিত করিলে, চীন সম্রাট ইহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বিপুল সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। জোরাবর সিং এই সংবাদ অবগত হইয়া, তাহাদের আক্রমণের প্রতীক্ষায় রহিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি রাস্তায় সৈন্যগণ সহ আক্রান্ত হইলেন। যে খানে তিনি আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছিলেন, তাহা তাকলা কোটের দুই মাইল দূরে তোয় নামক স্থানে, এক বীরাঙ্গনা চালিত তিব্বতি সেনা দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হন্। এই বীরাঙ্গনার বন্দুকের গুলিতে মহাবীর জোরাবর আহত হন। এদেশের স্ত্রীলোকেরাও অস্ত্রচালনায় পটিয়সী। জোরাবরের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল, তিববতীরা যাহাদিগকে বন্দী করিয়াছিল, তাহারা অত্যন্ত নৃসংশতার সহিত নিহত হ'ল, আর যাহারা

হিমালয়ের শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হ'য়েছিল, তাহারা অস্ত্রাদির বিনিময়ে এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ ক'রে কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিয়া ফিরিয়াছিল। আস্‌কোট নামক স্থানে এখনও সেই তিব্বতীদের উষ্ণ রক্ত পান—কারী অস্ত্র সব দেখা যায়। এই তীর্থপুরী অতি মনোরম ও শীতপ্রধান স্থান। এখান হ'তে কৈলাস ৩ দিনের রাস্তা, এ রাস্তা অত্যন্ত কঠিন, ইহার উচ্চতা সমুদ্র হ'তে ১৬ হাজার ফুট। এ রাস্তায় যাত্রা করিতে হইলে, পথপ্রদর্শক এবং বন্দুকাদি সঙ্গে করিয়া আনিতে হয়, নতুবা ডাকাতের হাতে প্রাণ দিতে হইবে; আমার সঙ্গে কয়েক বার দেখা হ'য়েছিল, কিন্তু আমাকে দেখিয়া কাশীর লামা বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহারা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, তিব্বতে ইহাদেরই প্রধান ভয়, কিন্তু ইংরেজী বন্দুক থাকিলে, আর ভয় করিতে হয় না। ইংরাজী বন্দুক দেখিলে ভয়ে পালিয়ে যায়, আমি আসিবার সময় অনেক যায়গায় রক্তের চিহ্ন দেখিয়া ছিলাম। এই ডাকাতের দল ঘোড়ায় চড়িয়া, এবং দল বাঁধিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে। তিব্বত প্রায়ই সমতল ভূমি, কিন্তু জমি পাথরীলা হওয়াতে বিশেষ ফসলাদি হয় না। ইহারা ছাতু এবং মাংস মদ্যাদি আহার করিয়া থাকে। মদিরাও এত অধিক পান করে, তাহা বলা যায় না। তিব্বত ভ্রমণ করিবার যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে শরীরের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বাহির হ'তে হয়। এসব দেশ ভ্রমণ করিতে ধনবান বা রাজা,

মহারাজা পারে না। অতি সুখী লোক কখনও আসিবেন না। যিনি নির্ভীক ও উত্তমী, তিনি নিশ্চয়ই গমন করুন, জীবনের এক মহান্ কার্য্য ও মহাপুণ্যের সঞ্চয় হইবে।

নবদশ অধ্যায়

কৈলাস দর্শন।

রুদ্রো ব্রহ্মা উমা বাণী তস্মৈ তস্মৈ নমঃ নমঃ।
রুদ্রো বিষ্ণু রমা লক্ষ্মী তস্মৈ তস্মৈ নমঃ নমঃ॥
রুদ্রঃ সূর্য্য উমা ছায়া তস্মৈ তস্মৈ নমঃ নমঃ।
রুদ্রঃ সোম উমা তারা তস্মৈ তস্মৈ নমঃ নমঃ॥

দারচিন—তোর হইতে প্রায় ২০ মাইল। এখান হ'তে এক রাস্তা কাশ্মীরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। কাশ্মীর অন্তর্গত লাদকের বহু যাত্রীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। কিন্তু আমি একাই, সঙ্গি একমাত্র ভগবান। এখানে তুজন মাদ্রাজী যুবকের সহিত দেখা হয়। ভারতীয় লোক বলিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইল। ইহারা আলমোড়ার রাস্তায় আসিয়াছে। এই দারচিন কৈলাস পরিক্রমারও রাস্তা, সেজন্য বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়, কয়েক খানি দোকানও আছে, খাত্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়। প্রায়

১৩ হাজার ফিট উচ্চতা। রাত্রে সেই মাদ্রাজী যুবক ও আমি এক সঙ্গে একটি তাঁবুতে রাত্রি কাটাইয়া ছিলাম। প্রাতঃকালে ইহারা চিরদিনের মত বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, পুনঃ একা সঙ্গিহীন অবস্থায় পড়িলাম। দারচিনের দক্ষিণ দিকে কৈলাসের তুষার বিগলিত এক ক্ষুদ্র নদীর স্রোত কুল কুল শব্দে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হ'তেছে। ইহার নিকটে কয়েকখানি পাথর দিয়া যাইবার রাস্তা এ রাস্তাটি কৈলাস পরিক্রমারও রাস্তা। কৈলাসের পরিক্রমা প্রায় ৩০ মাইলেও উপর হইবে, রাস্তা ভয়ানক বিকট চড়াইয়েরও কোন অন্ত নাই; আবার তাহার উপর শীতেরও মহান্ কষ্ট।

কৈলাশ দর্শন করিলে মনের মধ্যে কত প্রকারের ভাবনার উদয় হয়, "জ্যোস্না পুলকিত যামিনী" জীবমাত্রকে আনন্দ বিহ্বল করিয়া, ভূত ভাবন কৈলাস পতি ভগবান শিবের যেন ইহা এক লীলা নিকেতন রচনা করিয়া বসিয়াছেন। ভূত ভাবন ভগবান যেন অনন্ত আনন্দের আনন্দ স্বরূপ, তাই বুঝি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া, প্রভু আমার তাঁহার প্রিয় নিবাসে ক্রীড়া করিতেছেন। পূর্ণ কলা পরিপূর্ণ চন্দ্রমা সুধা ধারা বিতরণ করিয়া যেন জগতকে সুধাসিক্ত করিতেছেন। এই সুধা সিক্ত রজনী তাঁহার অতি প্রিয় বলিয়াই কি তিনি সুধাংশু শেখর নাম ধরিয়াছেন। চির তুষারকান্তি ধবল ভগবানের এ রূপ যিনি প্রত্যক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত

হউন না কেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইতে হইবে, তাহাকে মুগ্ধ হইয়া মস্তক অবনত করিতে হইবে, ভগবানের সত্তা অনুভব করিয়া তাঁহাকে পুলকিত হইতে হইবে। আজই পূর্ণিমা, ইহাকে আষাড়ী পূর্ণিমা বলিয়া থাকে। এই দিনে কৈলাসে কুম্ভের মেলা হয়, বহু ভুটিয়া, লামা এবং ভারতীয় যাত্রী আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। আমিও পরিক্রমা দিবার জন্য সকলের সঙ্গে প্রস্তুত হইলাম। দারচীন কৈলাসের দ্বারদেশ, প্রথম প্রনামস্তুতি ভিন্ন এই অধম কাঙালী আর কি দিয়া, সেই সর্ব্বারাধ্য দেবাদিদেব মহেশ্বরের পূজার অর্ঘ্য দিবে? এক তাঁহারই দেওয়া বাণী ভিন্ন বাচালের আর কি আছে।

কৈলাস পর্ব্বত ঠিক একটি শ্বেতবর্ণ লিঙ্গাকৃতি, গগনভেদ করিয়া অনাদি কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে, জ্যোৎস্না রাত্রে কি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য দৃষ্টি গোচর হয়, তাহা ব্যক্ত করা অসাধ্য যাঁহার একবার দর্শনের নিমিত্ত কোটি কোটি লোক পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন, তাঁহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া আত্ম হারা হইয়া যাইতে হয়। কেবল মাত্র একটি বার দর্শনের নিমিত্ত কত কষ্ট, কত অর্থ ব্যয় করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহাও চিন্তার বিষয়। জয় ভগবান বিশ্বকর্ম্মার বিশ্ব প্রভুর শ্রীচরণ কমলে যুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এ অধ্যায় হইতে বিদায় গ্রহণ করি।

ওঁ নমঃ শিবায়ঃ।

লিঙ্গাষ্টকম্

ব্রহ্ম মুরারী সুরার্চ্চিত লিঙ্গং নির্ম্মল ভাষিত শোভিত লিঙ্গম্ ।
জন্মজ দুঃখ বিনাশকং লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম ॥১॥
দেব মুনি প্রবরার্চ্চিত লিঙ্গং কামদহং করুণাকর লিঙ্গম্ ।
রাবণ দর্প বিনাশন লিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥২॥
সর্ব্ব সুগন্ধি সুলেপিত লিঙ্গং বুদ্ধি বিবর্ধন কারণ লিঙ্গম্ ।
সিদ্ধ সুরাসুর বন্দিত লিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥৩॥
কনক মহামুনি ভূষিত লিঙ্গং ফণিপতি বেষ্টিত শোভিত লিঙ্গম্ ।
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশন লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥৪॥
কুমকুম চন্দন লেপিত লিঙ্গং পঙ্কজহার শুশোভিত লিঙ্গম্ ।
সঞ্চিত পাপ বিনাশন লিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥৫॥
দেবগণার্চ্চিত সেবিত লিঙ্গং ভাবে ভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম্ ।
দিনকর কোটী প্রভাকর লিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥৬॥
অষ্ট দল পরিবেষ্টিত লিঙ্গং সর্ব্বসমুদ্ভব কারণ লিঙ্গম্ ।
অষ্ট দরিদ্র বিনাশন লিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥৭॥
সুরগুরু সুরবর পূজিত লিঙ্গং সুরবা পুষ্প সদার্চ্চিত লিঙ্গম্ ।
পরাৎপর পরমাত্মক লিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥৮॥
লিঙ্গাষ্টক মিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥৯॥

ওঁ নমঃ শিবায়ঃ ॥

শিব লিঙ্গ ও শিব রাত্রি।

এই শিব লিঙ্গের পূজা অনাদি কাল হ'তে জগৎ ব্যাপিয়া হ'য়ে আসিতেছে। রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের প্রচারের আগে পাশ্চাত্য দেশে প্রায় সব জাতিতে কোন না কোনরূপে শিবলিঙ্গ পূজা সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। রোম এবং যুনান দেশে ক্রমশঃ প্রিয়ম এবং ফল্লুসের নামে লিঙ্গের পূজা হইত। এই দুই রাষ্ট্রীয় প্রাচীন ধর্ম্মে লিঙ্গ পূজা প্রধান অঙ্গ ছিল। বৃষের মূর্ত্তিও লিঙ্গের সঙ্গে পূজা হইত, পূজায় হিন্দুদের ধূপ দীপ পুষ্পাদি দিয়া পূজা হইত। মিশ্র দেশে হর এবং ঈশী ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল, এ দেশে প্রায় ফাল্গুন মাসে বসন্তোৎসবের মত লিঙ্গ পূজা বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহের সহিত সকলে মিলিয়া আনন্দ করিত, এরূপ ভাবে সমস্ত পশ্চিম দেশে শিবলিঙ্গ পূজা হইত।

প্রাচীন চীন ও জাপানের বহু পরিচিত সাহিত্যে ও তাহার বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। জাভা, সুমাত্রা বর্ণিও আদি দেশেও বহু শিব মন্দির জীর্ণাবস্থায় রহিয়াছে, তাহা আমি নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। কর্ণল টাউক নামক একজন বিদ্বান বলিয়াছেন, মহম্মদ সাহেব প্রথমে লাত নামক অম্বের দেবতাদের উপাসনা লিগ নামে করিত, এবং সোমনাথজীর লিঙ্গকে পশ্চিম দেশীয় লোকের লীগ বা লাত বলিত। এই লিঙ্গ দুই জায়গায় অনেক বিশাল এবং বহু মূল্যের রত্নের দ্বারা বিরাজিত

ছিল, এই দুইটি লিঙ্গ একই পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। যে মন্দিরে স্থাপিত ছিল তাহাতে লিঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্য সোনা দিয়া বিরাজিত করিয়া প্রায় ৫৬ খাম্বা দিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুটেরও অধিক ছিল, মহম্মদ গজনী ইহাকে ধ্বংস করিয়া সমস্ত রত্ন নিয়া গিয়াছিল। এই দুই দেশ একই নামে প্রসিদ্ধ ছিল লাত বা লাট। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আল্লার বড় পুত্রীর নামও লাত বা লাট ছিল এবং ইহার চিহ্ন বা মূর্ত্তি লিঙ্গের মতন ছিল। যাহা হউক মুসলমানেরা ইহার ধ্বংশাবশেষ পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু মক্কেশ্বর এখনও লিঙ্গরূপে কাবাতে স্থাপিত হইয়াছে, এই মক্কেশ্বরের কথা ভবিষ্য পুরাণে ব্রহ্ম পর্ব্বতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে।

মক্কেশ্বরের লিঙ্গ কাল পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত, ইহাকে মুসলমান অসবদ বলিয়া থাকে। প্রথমে ইহাকে ইসরালি এবং ইহুদিরাই পূজা করিত, মহম্মদ সাহেবের সময়ে ইহাকে চারি যুগের লোকে পুজা করিত। যখন হইতে ইহার জন্য কাবাতে স্থান তৈয়ারি করা হইল, তখন ইহাকে উঠাইবার প্রশ্ন হইল, তখন চারটি কুলের, পাণ্ডারা ঝগড়া আরম্ভ করিল, ইহাকে উঠাইবার গৌরব কাহার হইতে পারে। তখন সকলে মিলিয়া হজরত মহম্মদ সাহেবের নিকট প্রশ্ন উঠাইলে তিনি যাহা মিমাংসা করিলেন তাহা সর্ব্বমান্য হইল। তখন চারটি কুলের

লোককে ডাকিয়া একটি চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কাবাতে আনিয়া স্থাপন করা হইল। তখন হইতে তিনি কাবেশ্বর নাম ধারণ করিয়া বসিলেন। যেমন আমাদের উপাস্য দেবতা মহেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, তদ্রূপ কাবেশ্বর, কিন্তু ইহার কোন প্রকারের পূজাদি হয় না। পরন্তু যে কোন মুসলমান হজ্জ যাত্রা করিয়া থাকেন তাহারা এই মূর্ত্তির চরণ চুম্বন অবশ্য করিয়া আসেন, নতুবা হজ যাত্রা সম্পূর্ণ হয় না, আমি স্বয়ং ইহা দেখিয়া আসিয়াছি।

এরূপভাবে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মান, কোজিয়ম আদি দেশেতেও আগে কোন না কোন রূপে লিঙ্গ পূজার প্রথা ছিল, এ সব বিষয়ের বিচার করিলে কোন প্রকার সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না।

আসুন এবার আপন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, হিমালয়ের উচ্চ শিখর কৈলাসও একটি লিঙ্গ। ইহা হ'তে কন্যা কুমারী এবং রামেশ্বর পর্য্যন্ত শিবলিঙ্গের ও শিবালয়ের গণনা করা এক অসম্ভব ব্যাপার এ দেশ সমস্ত শিবময় বলিলে হয়। এই হইল বর্ত্তমান কালের কথা। যখন সংসারময় এক সুদীর্ঘ কাল হইতে কখনও বৌদ্ধ কখনও মুসলমানে দেশকে নিজ নিজ ধারাতে আকৃত করিয়াছিল, তখনও শিবলিঙ্গ ও শিবালয় ভারতীয় সংস্কারের ও জাতির রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছিল। এখনও অনেক স্থানে মাটীর বহু নিম্নে শিবালয় বা শিবলিঙ্গ

পাওয়া যায়, আমাদের প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ ও বেদাদি শাস্ত্রে প্রায় শিব পূজা ও শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রাধ্যায়ে শিব নামের মহিমায় পরিপূর্ণ।

আমি যখন কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শনের নিমিত্ত গিয়াছিলাম। সেই সময়ে কোন একটা পাহাড় বৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া নদীর জলে পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সঙ্গে একটি ছোট মন্দির ও জলের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, আমি সেই মন্দির হইতে একটা শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হই, সেই লিঙ্গ কাশ্মীরাধিপতি শ্রীমান হরি সিং মহারাজজীকে দিয়া আসি, লিঙ্গে এই একটা বিশেষত্ব ছিল, লিঙ্গের ভিতরে জল নড়িত তাহা পরিষ্কার দেখা যাইত। যেমন একটি থার্ম্মোমিটারের পারদ মত, প্রায় /১॥ সের ওজন হইবে। এরূপভাবে বহু শিব লিঙ্গ মাটীর নিম্নদেশ হইতে পাওয়া যায় শুনা গিয়াছে। বহুকাল হইতে এই আর্য্য জাতির মধ্যে শিব পূজার বিষয়ে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; স্কন্ধ পুরাণে এইভাবে লিখিত হইয়াছে—

আকাশং লিঙ্গং মিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পিটিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়না লিঙ্গ মুচ্যতে ॥

আকাশ লিঙ্গ, পৃথিবী যাহার পিটিকা সমস্ত দেবতারা যাহাতে আলয় করিয়া আছেন এবং অন্তে সমস্ত যাহাতে লয় হয় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ বলিয়া থাকে।

লিঙ্গের প্রথম প্রাদুর্ভাব।

লিঙ্গের প্রথম প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে শিব পুরাণ এবং লিঙ্গ পুরাণে বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। লিঙ্গ পুরাণে অধিক বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন। দুইটাতে পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবতাদের আপন আপন কথা শুনাইয়াছেন। স্কন্ধ পুরাণে এই কথা অত্যধিক বিস্তার পূর্ব্বক নন্দীকেশ্বর মার্কণ্ডেয় মুনিকে শুনাইয়া ছিলেন।

বর্ত্তমান শ্বেতবারাহ কল্পের প্রথমে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ভার ব্রহ্মাকে দেওয়া হয়। যে সময়ে দেবতাদের সৃষ্টি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চার যুগ পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম শুকাইয়া গিয়াছিল। সমস্ত পশু, পক্ষী, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতাদি সমস্ত শুকাইয়া গিয়া পরে সম্পূর্ণ জলময় হইয়া এক অনন্ত সমুদ্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত দিশা অন্ধকার ময় হইয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে ক্ষীর সাগরে শয়নাবস্থা শ্রীমহাবিষ্ণু। ব্রহ্মা বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হইয়া বিষ্ণুকে জাগাইলে, বিষ্ণু ক্রোধিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? ব্রহ্মা বলিলেন আমি সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা। বিষ্ণু তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন "হে পুত্র, স্বাগতম্! ইহাতে ব্রহ্মা আরও অধিক ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, সৃষ্টি কর্ত্তা হইলাম আমি আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলে! বিষ্ণু বলিলেন

আমিই আদি সৃষ্টি কর্ত্তা। সৃষ্টি করবার জন্য তোমাকে আমি স্রষ্টা করিয়াছি এই বলিয়া দুই জনের মধ্যে বহু বাদ বিবাদ হওয়ার পর ঘোরতর যুদ্ধে পরিণত হ'ল, সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে আবার মহাপ্রলয়কারী ভীষণ যুদ্ধ হইতেছিল, হঠাৎ একদিন এক মহান্ প্রলয়কারী ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া দু'জনের ঝগড়া মিটাইবার জন্য দু'জনের সম্মুখে এক প্রচণ্ড অগ্নিরূপে এক মহাস্তম্ভ আবির্ভাব হ'ল এই স্তম্ভের ঊর্দ্ধ ও নিম্নের কোন অন্ত নাই। এক অনন্ত জ্যোতির্ময় লিঙ্গ ইহারা দেখিয়া বিস্ময় ভাবে ভাবিতে লাগিলেন। বিষ্ণু ইহাকে দেখিয়া বলিলেন, আমাদের ঝগড়া মিটাবার জন্য এই মহান্ জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হ'য়েছে অতএব এখন দু'জনে দুই দিকে এই মহালিঙ্গের খোঁজ করিয়া আসি, এই বলিয়া ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিলেন, আর বিষ্ণু ভগবান বরাহরূপ ধারণ করিয়া অতি তীব্র গতিতে দৌড়িতে লাগিলেন। দু'জনে এক সহস্র বৎসর যাবত দৌড়িয়াও সেই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের কোন অন্ত পাওয়া গেল না। শেষে দু'জনে শ্রান্ত হ'য়ে ফিরিতেছিল, এতদিন পর্য্যন্ত খোঁজ করিয়া দু'জনে একই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হ'লেন।

ব্রহ্মা ফিরিবার সময় উপর হ'তে একটি কেতকী ফুল পড়িতে দেখিলেন। সেই কেতকী ফুল শঙ্করের শক্তিতে, ব্রহ্মাকে বলিলেন, আমি এই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের মস্তক হ'তে মূল পর্য্যন্ত দশ কল্পের পূর্ব্বে চলিয়াছি। কিন্তু লিঙ্গের এখনও অর্দ্ধভাগ

পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারি নাই, তখন ব্রহ্মা কেতকীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই লিঙ্গের উপর ভাগ দেখিয়াছ? কেতকী বলিল হাঁ আমি নিম্ন ভাগ দেখি নাই কিন্তু উপর ভাগ দেখিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন তুমি বিষ্ণুকে বলিবে, আমিও উপর ভাগ দেখিয়া আসিতেছি। তখন তু'জনে ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে কেতকী বলিলেন, আমরা তু'জনে এই লিঙ্গের উপর ভাগ দেখিয়া আসিয়াছি। বিষ্ণু এই মিথ্যা সাক্ষী দিবার বিষয় বুঝিতে পারিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর স্তুতিতে শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া, সেইখানেই আবির্ভাব হইলেন, এবং লিঙ্গের বিষয়ে কেতকীফুলকে মিথ্যা সাক্ষী দিবার জন্য শাপ দিলেন, লিঙ্গ পূজায় তোমায় কেহ গ্রহণ করিবে না। তাহার পর হইতে কেতকী পুষ্পের দ্বারা কেহ পূজা করে না। তাহার পর ভগবান শঙ্কর ব্রহ্মা বিষ্ণুর ঝগড়ায় সৃষ্টীর রহস্য বলিয়া ইহার মিমাংসা করিলেন। ত্রিমূর্ত্তির উৎপত্তি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টীর জন্য মহেশ্বরের অংশে হইয়া থাকে। ইহার শক্তিতে পিতামহ স্রষ্টা, বিষ্ণুপালন কর্ত্তা, রুদ্র সংহার কর্ত্তা, তিনজনের সমান অধিকার কখনও কাঁহারও পিতা হন, আবার কখনও কাহারও পুত্র হইয়া সৃষ্টী, স্থিতি, সংহার করিয়া থাকেন। তখন হইতে ব্রহ্মার এক নাম হংস হইল। এবং বিষ্ণুর একনাম বরাহ হইল। তিনিই এক অভেদ,

একতা, কখনও কাহার মায়ায় মোহিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন। সে সময়ে বিষ্ণু শ্বেত বরাহ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া কল্পের শ্বেত বরাহ নাম হইল। তখন শতকের আজ্ঞায় কল্পের নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।

লিঙ্গ পুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন, ভগবান মহেশ্বর অলিঙ্গ, প্রভৃতি প্রধান লিঙ্গ, মহেশ্বর নির্গুণ। প্রকৃতি সগুণ এই প্রকৃতি বা লিঙ্গের বিকাশ এবং বিস্তার হইতে বিশ্বের সৃষ্টী হইয়া থাকে। সমস্ত সংসার লিঙ্গেরই অনুরূপ তৈয়ার হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডরূপী জ্যোর্তিলিঙ্গ অনন্ত কোটী, সমস্ত লিঙ্গেরই অন্তর্গত। এই নিখিল বিশ্ব লিঙ্গ ময়, অন্ত সময়ে সমস্ত লিঙ্গতে লয় প্রাপ্ত হয়। এমন সংক্ষেপে শিব-রাত্রির বিষয়ে বর্ণন করিব। প্রথমতঃ শিব কাহাকে বলে, ইহার জ্ঞান শিব কৃপা ভিন্ন লাভ হয় না। বস্তুতঃ ইহাকে জানা আর শিবের সাক্ষাৎ করিয়া লওয়া একই কথা, ইহা অনেক দূরের কথা। তবুও সাধারণ জ্ঞানের জন্য কিঞ্চিত আবশ্যকতা আছে।

শেতে তিষ্ঠতি সর্ব্বজগৎ যস্মিন্ সঃ শিব শম্ভুঃ বিকার রহিত :—

অর্থাৎ—যাহাতে সমস্ত জগৎ শয়ন করেন, এবং যিনি বিকার রহিত, সেই শিব। অথবা যিনি সব অমঙ্গলের হ্রাস করেন, অতি সুখময়, মঙ্গলময়, তিনিই শিব, আবার যিনি

সমস্ত জগৎকে আপনার ভিতর লীন করিয়া লন্, এবং করুণা সাগর তিনি ভগবান শিব। আবার যিনি নিত্য সত্য জন্ম রহিত, জগদাধার, বিকার রহিত, সাক্ষী স্বরূপ তিনি শিব।

রাত্রি কাহাকে বলে---

"রা, দানার্থক ধাতু হইতে, রাত্রি শব্দ হয়," অর্থাৎ যিনি সুখাদি প্রদান করেন, তাহাকে রাত্রি বলা হয়, ঋগ্বেদে রাত্রি সূক্ত মন্ত্রে বড় প্রশংসা করিয়াছেন।

উপমা পোপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত, উষ ঋণেব রাতয়।

হে রাত্রেঃ। অক্লিষ্ট যে তমঃ তাহা আমার নিকট যেন না আসে। রাত্রি সদা আনন্দ দায়িনী। সেইজন্য সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়দাত্রী হওয়াতে তাহার স্তুতি করিয়াছেন। এই-খানে রাত্রির স্তুতিতে প্রকৃতিদেবী, দুর্গাদেবী আদি নামে স্তুতি করিয়াছেন। এই প্রকারের শিব রাত্রির অর্থ, যিনি আনন্দ প্রদান করিতে পারেন, তাহাকে শিবরাত্র বলিয়া থাকে। আনন্দই ব্রহ্ম, যেখানে আনন্দ নাই সেইখানেই মহা মৃত্যু। যাঁহার শিব নামের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এইরূপ রাত্রি মাঘ, ফাল্গুন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। যাহার পূজায় উপবাস ও রাত্রি জাগরণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উক্ত ফাল্গুন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর

রাত্রে শিব পূজা করা এক মহাব্রত, ইহার নাম শিবরাত্রি হইয়াছে। পুরাণে উল্লেখ করিয়াছেন—

পরাৎ পরতরং নাস্তি শিবরাত্রি পরাৎপরম্‌
নপুজয়তি ভক্তেশং রুদ্রং ত্রিভুবণেশ্বরম্‌ ॥
জন্তুজন্ম সহস্রেষু ভ্রমতে নাত্র সংশয় ।

(স্কঃ পুঃ)

চির তুষারাবৃত কৈলাস ও একটী লিঙ্গের মতন এই লিঙ্গের কথা কবিকুলতিলক কালিদাস যেরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, অন্য কোন ভারতীয় কবি বর্ণন করিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। প্রাতঃকালে কৈলাসের কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। মহাকবি কালিদাস তাঁহার অমর কাব্য সমূহে নানা প্রদেশের ও নানা বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন। দশ মুখ মহাবলি রাবণ ভুজ দ্বারা ইহাকে উত্তোলন করাতে ইহার প্রস্থসন্ধি উচ্ছসিত হইয়াছে। যেই সময় রাবণ কৈলাসকে উঠাইয়া লঙ্কায় নিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সে সময় কার রজ্জু বন্ধন চিহ্ন এখনও তাহার সাক্ষী দিতেছে। ভক্তেরা সাগ্রহে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। সেই ভগ্ন স্থানে তুষার প্রবেশ করিতে না পারাতে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। শেষে কালিদাস মহাদেবের অট্টহাস্যের সহিত কি অনির্ব্বচনীয় কৈলাসের তুলনা করিয়া অপূর্ব্ব রসের অবতারণা করিয়া নিজের বৈশিষ্টের প্রমাণ দিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কৈলাস পর্ব্বত নানা প্রকারের বৃক্ষ

লতায় পরিপূর্ণ ছিল, এরূপ বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে স্থানে স্থানে, বিচ্ছু গাছ ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষ লতার চিহ্নও পাওয়া যায় না।

বিংশ খণ্ড

কৈলাসানন্দ

গত্বাচোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থসন্ধেঃ।
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতা দর্পণস্য তিথিঃস্যাঃ॥
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং।
রাশিভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ।

অর্থাৎ—"হে বারিদ! তুমি একটু উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া (বোধ হয় গবলা মান্ধাতাকে অতিক্রমণ করিবার জন্য কালিদাস মেঘকে উর্দ্ধ দিক্‌ দিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন)। কৈলাসের অতিথি হইবে। এই পর্ব্বত অত্যন্ত শুভ্র ও স্বচ্ছ হওয়ায় অমর অঙ্গনাদিগের দর্পণ স্বরূপ হইয়াছে। মহাদেব প্রতিদিন যে অট্টহাস্য করেন, সেই হাস্য সকল পুঞ্জিকৃত হইলে যেরূপ দেখায়, কৈলাস যেন সেইরূপ শোভা পাইতেছে। ঐ নগরাজ কুমুদ শুভ্র শিখর শ্রেণী দ্বারা আকাশ মণ্ডলে ব্যাপ্ত থাকিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছেন।

দশমুখ রাবণ ভূজ বলের দ্বারা ইহাকে উত্তোলন করাতে ইহার প্রস্থ সন্ধি উচ্ছসিত হইয়াছে।

যাত্রীরা যাত্রাকালে সংযত-মৌন-এবং ভগবৎ পরায়ণ হইয়া গমন করিতে লাগিল, আমিও তাহাদের সঙ্গি হইলাম। তিব্বতিবা কেহ কেহ ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন-কেহবা মনিপদ্মে "হুং" মন্ত্র পাঠ, কেহবা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটে রাবণ হ্রদের সুনিল জলরাশি বেশ পবিষ্কার ভাবে দেখা যাইতেছে। এই হ্রদ মান্ধাতা পর্ব্বতের ধারে। কৈলাস হইতে মান্ধাতা পর্ব্বত ৩৷৪ হাজাব ফুট্ উচ্চ। বিশ মাইলের মধ্যে এতবড় পর্ব্বত না থাকাতে ইহাব প্রাধান্য ও সৌন্দর্য্য অতি মনোরম দেখায়, নংগা পর্ব্বত ব্যতীত সমস্ত এসিয়ার মধ্যে এরূপ দ্বিতীয় পর্ব্বত আর নাই। পরিক্রমা করিবার সময় অনেক পাথরে পালি ভাষায় লিখা রহিয়াছে, "মণি পদ্মে হুং", এই সকল বিস্ময়প্রদ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, দুই মাইল দূরে যাইবার পর বাম দিকে একটু উন্নত ভূমির উপরে নন্দী গুম্ফা দেখিতে পাওয়া যায়, এই গুম্ফা ভূটানের অধিপতি কোন সময়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন আমরা সকলে প্রায় ২০ হাজার ফুট্ উচ্চে আরোহণ করিয়াছি। শ্বাস নিতেও কষ্ট হইতেছে বহু ক্লেশ, বহু কষ্ট সহ্য করিবার পর, যখন কৈলাসের উপর উঠিলাম তখন বোধ হইল, যেন এক কুহকিনীর রাজ্যে আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছি। বহু দূরের দৃশ্যকে নিকটবর্ত্তী করিয়া অস্পষ্ট রেখাকে স্পষ্ট করিয়া কিয়ৎকাল সূর্য্য কিরণে দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া কখনও ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত করিয়া ঐন্দ্রজালিক প্রবর যেন আপন মনে ক্রীড়া করিতেছেন! নানা বর্ণে রঞ্জিত তিব্বতের তৃণ বিহীন পর্ব্বতমালা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক হৃদয়ে অলৌকিক আনন্দ প্রদান করিতেছে। উৎভ্রান্ত হৃদয়ে যখন তিব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম তখন বোধ হইত সূর্য্য করোজ্জ্বল কৈলাস যেন গৈরিকাদি রঙ্গে রঞ্জিত শৈল শ্রেণী. প্রথম যখন আমি' দর্শন করি, তখন বোধ হইল অতি নিপুণ কুহকী ব্যতিত এই মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কনে অন্য কেহ অধিকারী হইতে পারে না। মনুষ্যের তুলিকা বা শব্দ এই অব্যক্ত বিষয়কে ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। কৈলাস ঠিক দেখিতে একটী শ্বেত বর্ণ লিঙ্গাকৃতি, এই লিঙ্গের উপরে এতক্ষণ আমরা সকলে বেশ পরিষ্কার নির্ম্মল আকাশ উপভোগ করিয়া আসিতেছি, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সমস্ত জগৎ'যেন ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল, এই অন্ধকারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হইয়া চতুর্দ্দিক শ্বেতবর্ণে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। আবার সামান্য সামান্য বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল, ইহার পর অসংখ্য তুষারপাত হইতে লাগিল। এই দুঃখ ও কষ্ট যদি উপভোগ না করিতাম, তাহা হইলে কৈলাস পরিভ্রমণের মধুরতাও বুঝিতে পারিতাম না।

কটিদেশ পর্য্যন্ত বরফে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, সঙ্গের যাত্রীরা কে কোথায় গেল, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। সমস্ত বিশ্ব যেন মহা প্রলয়কারী অন্ধকার ও তুষারাবৃত করিয়া ফেলিল। এইবার কতক্ষণ পরে আশ্রয় পাইব এই চিন্তাই প্রধান হইয়া উঠিল। কোথায় একটু মস্তক রাখিয়া দাঁড়াই এমন কোন স্থান নাই, এইভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কয়েকজন ভুটানি যাত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। তাহাদের মধ্যে একজন শীতের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল, এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া আমারও জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিলাম। মনে মনে কৈলাসপতির নাম নিতেছিলাম, এবং সামান্য সামান্য অগ্রসর হইতেছিলাম। কিছুদূর যাইবার পর একটি গুম্ফা দেখা গেল, পূর্ব্ব হইতে চারি পাঁচজন যাত্রী ইহাতে বিশ্রাম করিতেছে। ভুটানিরা হিন্দু তাহারা আমাকে দেখিয়া কাশীর লামা বলিয়া অতি আদরের সহিত ডাকিয়া বিশ্রাম করিতে বলিল, জিজ্ঞাসা করাতে বলিল এই গুম্ফার নাম জুন্ টুন্ গুম্ফা বাংলায় ইহার অর্থ হয়, আলোকিত গুম্ফা, সেই সময়ে প্রায় সন্ধ্যা হইতেছিল, অগত্যা সেই গুম্ফায় সকলে মিলিয়া, কখনও বসিয়া এবং কখনও ঠেস্ দিয়া অতি কষ্টে রাত্র যাপন করিলাম। পরদিন যখন বৃষ্টি ও বরফ থামিয়া গেল, তখন সকলে এই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দাতা জুনটুন, গুম্ফাকে চিরদিনের মতন দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিদায় নিলাম, পরদিনের বৃষ্টিতে ও বরফে

মার্গ চলিতে কষ্ট হইতেছিল। ইহার কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর কঠিন চড়াই করিতে হয়, গত কল্যের মতন তেমন বরফ নাই। বৃষ্টিতে অনেক বরফ গলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এইখান হইতে আসিবার পর আর এক অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্যই চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে ছিল, যেন প্রকৃতি দেবী স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া আমাকে শান্তিরসে পরিপ্লুত করিতে লাগিল, কিন্তু চড়াইয়ের জন্যও হিমের জন্য শরীর একেবারেই অবসন্ন করিতে লাগিল। এইভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর ডলমাপা নামক রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এইস্থান প্রায় ২১ হাজার ফুট উচ্চ। পরিক্রমার রাস্তার পার্শে প্রসিদ্ধ গৌরীকুণ্ড, ইহার বরফ কখনও গলে না। আমি নামিয়া একটু জল মস্তকে ধারণ করিলাম ও একটু পান করিলাম, কয়েকজন ভূটানি যাত্রিও জল স্পর্শ করিয়া আসিল। রাস্তা নিতান্ত খারাপ অতি কষ্টে নামিতে হয়। এই গৌরীকুণ্ড হইতে কিঞ্চিৎ উতরাই করিতে হয়। ইহার প্রায় দুই মাইল দূরে জণ্ডুফোক্ একটি মঠ পাওয়া যায়। যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম করিয়া থাকে অন্য জায়গায় দাঁড়াইবারও স্থান নাই। যাত্রীরা যার যাহা খাদ্য খুলিয়া খেতে লাগিল। আমিও আমার পূর্ব্ব বর্ণিত আটার লাড্ডু ২টি আহার করিয়া একটু বিশ্রাম করিবার পর আবার যাত্রার জন্য অগ্রসর হ'য়েছিলাম। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর প্রবল বায়ু প্রবাহিত হ'তে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কে কোথায়

গেল কিছু দেখা গেল না, এমন প্রবল ভাবে তুষার পাত হইতে লাগিল। এবার একেবারেই অন্ধকার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখন আমি সঙ্গিহারা হইয়া বরফের উপর দিয়া মার্গ অতিক্রম করিতে লাগিলাম: যে দিকে একটু রাস্তা দেখিতেছি সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। এবং মনে মনে কৈলাস পতিকে স্মরণ করিতে থাকি।

অন্ধকার ও তুষারপাত আর বন্ধ হয় না। কত পর্ব্বত পার করিলাম, শেষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে শরীর আর এক পাও চলিতেছে না। এইবার কোথায় দাঁড়াই, সঙ্গিহীন নিরাশ্রয় পুনঃ হিমপাত হইতেছে, এইবার বুঝি জীবনের শেষ, আর একটুও শক্তি পাইতেছি না। বিভ্রান্তভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতেছিলাম। হিমে শরীর কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ পা ফস্‌কে পড়িয়া গেলাম। আমার আর বাহ্য জ্ঞান নাই, কোথায় পড়িলাম, প্রায় সন্ধ্যাও গত হইয়া গিয়াছে। এই ঘোর অন্ধকার ও তুষারের মধ্যে একটি দীর্ঘকায় জটাজুটধারী সাধু আমার পিঠের উপরে একটি পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "কোন হে বুহুত মজামে শুতাহৈ, পদাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার বাহ্য জ্ঞান হইল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, বাবা আমি পড়িয়া গিয়াছি, মস্তকে হাত দিয়া দেখি প্রায় অনেকটা মাথা ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। এতক্ষণ যাবৎ তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, পরে বলিলেন, কই ডর নহি এস আমার সঙ্গে, আমি তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম।

এইবারে কিছুদূর যাইবার পর দেখি একটি খুব বড় গুহা, তিনি তাহার ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে ইঙ্গিত করিলেন বসিবার জন্য, আমি তাহার সম্মুখে গুহার দরজায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িলাম। গুহাটী খুবই গরম বোধ হইল। যেমন অমৃতং শিশিরে বহ্নিঃ, এমন সময় খুবই তুষার পাত হইতে লাগিল। তিনি গুহার বাহির হইয়া আসিয়া নিকট হইতে সামান্য তৃণ উঠাইয়া আমার আঘাত স্থানে লাগাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইয়া গেল। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন কিছু আহার করিবে। আমি হত-ভম্বের মত উত্তর দিলাম, "হাঁ, করিব", ক্ষুধাও অত্যধিক হইয়াছিল, মনে মনে চিন্তা করিলাম, ইহার নিকট কিছুই নাই, এমন কি এত হিমের মধ্যে একটী কম্বলও সম্বল নাই। কোথায় হইতে তিনি আহার দিবেন। দেখি কি করেন। পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি আহার করিবার ইচ্ছা আছে বল। আমি বলিলাম গরম গরম লুচি ও চানার ডাল খাইতে ইচ্ছা হয়, বাবাজী তখনই বলিলেন শীঘ্রই পাত্র লইয়া আস, আমার কমণ্ডলুটী তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম।

তখন তিনি কতকগুলি পাথরের টুকুরা কমণ্ডলুতে দুই হাতে করিয়া ভরিয়া বলিলেন, যাও শীঘ্রই ঐ গুহায় নিয়া গিয়া আহার কর। আমিও আজ্ঞানুসারে অন্য গুহায় গিয়া

দেখি সত্য সত্যই গরম গরম লুচি ও চানার ডাল, যেন এই-মাত্র রান্না করিয়া নিয়া আসিয়াছে। মনের আনন্দে বহুদিন পরে এমন সুখাদ্য অন্ন দেখিয়া প্রায় সম্পূর্ণ আহার করিয়া ফেলিলাম। এরূপ সুখাদ্য ডাল-লুচি জীবনে আর কখনও খাই নাই। মনে মনে কৈলাস পতিকে প্রণাম করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ইনি কি সত্য সত্যই দেবতা না মনুষ্য, কৈলাসপতি আমার বিপদ দেখিয়া আহার ও আশ্রয় দিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। এইরূপভাবে নানা চিন্তা করিতে করিতে গুহায় ঠেস্ দিয়া এমন নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম, তিব্বতে ভ্রমণ করা পর্য্যন্ত আর তেমন নিদ্রা হয় নাই। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি কোথায় বাবাজী এবং কোথায় সেই গুহা, আমি একটী ছোট গুহায় বসিয়া রাত যাপন করিয়াছি। এই কি কোন স্বপ্ন-রাজ্যে আসিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মস্তকের আঘাত দেখি প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। এইবার কোন দিকে গমন করি, এইভাবে সমস্ত দিন একাকি পথ চলিতে চলিতে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অন্য একটি গুহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

গত দিনের কথা মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে এবং সেই লুচি ও ডালের কথা ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটী গুহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

গুহার ভিতর গত দিনের থেকেও লম্বা জটাজুট বিশাল শরীর ধারি এক মহাপুরুষ চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যানাবস্থায় বসিয়া আছেন। এত দীর্ঘকায় শরীর আমার জীবনে আর দ্বিতীয় দেখি নাই। গুহার দরজা হইতে আমি ও নমঃ নারায়নায়, বলিয়া প্রণাম করিলাম। কিন্তু মহাপুরুষের কোনও শব্দ পাইলাম না। তিনি একটু চক্ষু খুলিয়াও দেখিলেন না। আমি মনের আনন্দে গুহার দরজার সম্মুখে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; যদি কখনও ধ্যান ভঙ্গ হয় তবে তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া বসিব। এইবার আর কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। এই সব ভাবনা ভাবিতেছি এমন সময় তিনি চক্ষু খুলিলেন, আমি ভয়ভীত হইয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কোন কথা বলিবার আর সাহস হইল না। কিছু সময় পর্য্যন্ত এইভাবে যাইবার পর হঠাৎ বাবাজী এমন একটি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন সমস্ত পর্ব্বতটী যেন কম্প হইতে লাগিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুই হাতে হাততালি দিতে লাগিলেন। কেবল মাত্র তিনটী হাততালি দিল তাহাতে এমন শব্দ শ্রুত হইল যেন কোন পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইলাম পর্ব্বতের নিম্ন দেশ হইতে একটী শ্বেত বর্ণের গাভী ঠিক গুহার দিকে উঠিতেছে। মনে করিলাম এইটী বোধ হয় বাবাজীর পালিত গাভী। কোথায় গাভীটি থাকে এই চিন্তা করিয়া চতুঃপার্শ্বে

দেখিলাম অন্য কোন গুহা আছে কিনা। কিন্তু এই একটি মাত্র গুহা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান নাই। বাবাজীর শরীরে একটি বস্ত্রের ও লেশ পর্য্যন্ত নাই। কেবল সম্মুখে একটি বৃহৎ পাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। গাভীটি সাঁধা গুহার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কত আনন্দের সহিত চামর যুক্ত শ্বেত বর্ণের লেজটি এদিক সেদিক করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। আমি গাভীটির গায়ে একটু হাত ফিরাইয়া দিলাম। এত কোমল গাভীটির শরীর এপর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় দেখি নাই। বাবাজী দেখিয়া একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া চুপ করিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে কিছুক্ষণ গাভীটি দাঁড়াইবার পর আপন হইতে দুধ পড়িতে লাগিল। এমন ভাবে দুধ পড়িতে লাগিল, যেন সত্যই কেহ যন্ত্রের দ্বারা দোহন করিতেছে। আমি ইতিমধ্যে বাবাজীর সহিত কথা বলিবার জন্য অনেক বার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হ'য়েছি। গাভীর দুধ যে নষ্ট হ'তেছে তাহা দেখিয়াও কিছু করিতে সাহস হইতেছে না। এক বার মনে আসিল আমার কমণ্ডলুটী ধরি। যেই পাত্রটী তাহার সম্মুখে পড়িয়াছিল তাহা তাড়াতাড়ি দুধের নীচে রাখিয়া দিলাম। ৫।৭ মিনিটের মধ্যে প্রায় ১০।১২ সেরের অধিক ধরিবে তাহা পূর্ণ হ'য়ে গেল। তবুও দুধ পড়িতেছে। পূর্ব্ব পাত্রটী সরাইয়া আমার প্রায় /৩ সের জলের পাত্রটী ধরিলাম। ২।৩ মিনিটের মধ্যে তাহা পূর্ণ হ'য়ে গেল।

দুইটি পাত্র বাবাজীর সম্মুখে রাখিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা শেষ, গাভীটি আস্তে আস্তে যেদিক দিয়া আসিয়াছিল ঠিক সে দিক দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। যতদূর দেখা যায় আমি দেখিয়া লইলাম। যখন একেবারেই চক্ষুর অন্তরাল হইল, তখন দুগ্ধের কথা মনে পড়িল। পূর্ব্ব হইতে দুগ্ধ দেখিয়া আমারও লোভ হ'য়েছিল। ক্ষুধায় পেটের যেন নাড়িভুড়ি বাহির হইবার মতন হ'য়েছিল। তবে সঙ্গে এখনও দুই চারিটী লাড়ু বর্ত্তমান আছে। এই ভাবে নানা চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে বাবাজী তাঁহার বাম হস্তে সেই দুগ্ধ পূর্ণ বড় পাত্রটী তুলিয়া লইয়া এক শ্বাসে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার এই সব কর্ম্ম দেখিতেছিলাম। এবং মনে মনে ভাবিতেছিলাম এবার বুঝি আমার কমণ্ডলুর দুগ্ধটীও শেষ করিবেন। কিন্তু তিনি আর আমার কমণ্ডলুর দিকে দৃষ্টিও করিলেন না। দুগ্ধটুকু পান ক'রে বাহির হ'য়ে নিকটে ঝরণার দিকে গেলেন। আমি মনে করিলাম বোধ হয় বাবাজী হাত মুখ ধুইতে গেলেন। একটুখানি দৃষ্টি করিতেই, অন্যমনস্ক হইতে, বাবাজীকে আর দেখিতে না পাওয়াতে আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিতে গেলাম। কিন্তু বাবাজীর আর কোন দেখা নাই। কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলন। অনেক খোঁজ করিয়াও তাঁহার দর্শন পাওয়া গেল না। এদিকে যেমন অন্ধকার, তেমন প্রবল বায়ু ও তুষার পাত হইতেছিল। অগত্যা পুনঃ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। অনেক রাত পর্য্যন্ত

অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার আর কোন আসিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া, শেষে দুগ্ধ পূর্ণ কমণ্ডলুটীর কিছু দুগ্ধ পান করিলাম। এখন সুস্বাদু ও মধুময় দুগ্ধ আমি আর জীবনে পান করি নাই। আমার শরীরে যেন নব রক্তের সঞ্চার হইল। মনের মধ্যে নূতন উৎসাহ ও উদ্যম, স্ফূর্ত্তি আপন হইতে আসিল। শীতের ও অত্যাচার অনেক কম হইতে লাগিল। ইনি কি সাক্ষাৎ দেবাদি-দেব মহেশ্বর। দুইবাব আমাকে আহার ও আশ্রয় দিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। অনেক রাত্র পর্য্যন্ত এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে ও নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে রাত্র প্রভাত হইল। কিন্তু বাবাজীর আর আসিবার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। এদিকে আমার নিকট আরও প্রায় দুই সের দুগ্ধ জমা রহিয়াছে। দুগ্ধ পান করিবার আব যেন ইচ্ছাও হইতেছে না এবং ক্ষুধাও হইতেছে না। তবুও জোর করিয়া দিনের বেলায় কিছু দুগ্ধ পান করিলাম। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই গাভীটি আসিবে কারণ গাভীটি, আর জানে না যে বাবাজী এস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আঁমি মনের আনন্দে সেই গাভীটির দুগ্ধ পান করিয়া এখানেই থাকিয়া তপস্যা করিব। আর যদি বাবাজী সন্ধ্যার সময় আসেন তবে এবার আর তাঁহাকে ছাড়িব না। চরণ দুটী ধরিয়া বসিব। দুবার মহারত্ন পাইয়াও হারাইলাম। আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন কখনও ঝরণায় কখনও পর্ব্বতের শিখরে ভ্রমণ করিতে দিবা

অবসান হইয়া গেল। এবার বাবাজীর মত গুহায় যাইয়া ধ্যান লাগাইলাম। কিছুক্ষণ পরে বাবাজীর মত খুব জোরে জোরে হাসিতে লাগিলাম ও হাতে তালি দিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন গাভীর সাড়াশব্দ পাইতেছি না, নীচের দিকে অনেকক্ষণ দেখিতে দেখিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আর বাবাজীও আসেন না গাভীটিও আসিল না। পূর্ব্ব দিনের যে অবশিষ্ট দুগ্ধ ছিল তাহা খাইয়া সে রজনীও গুহায় কাটাইলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া একটুখানি চড়াই করিবার পর ঠিক রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। গুহাটী ত্যাগ করিবার পর এত অধিক হিম পড়িতেছিল তাহা বলা অসম্ভব। এভাবে কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে পরিষ্কার রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এরূপভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বাম দিকে একটী বিস্তীর্ণ মাঠ। ইহাই প্রসিদ্ধ বরখার মাঠ। ছোট ছোট অনেক নদী, বিশাল মানস সরোবর, আর মান্ধাতার অপুর্ব্ব দৃশ্য নয়ন গোচর হইতে লাগিল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কয়েকজন তিব্বতী যাত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। পাঁচ দিন পরে মনুষ্যের দর্শন হইল। তাহারাও মানস সরোবরে যাইবে। তাহাদের নিকট আমার মহান্ বিপদের কথা ও মহাপুরুষের দর্শনের কথা ব্যক্ত করাতে, তাহারা আমাকে বলিল এই কৈলাসে অনেক মহাপুরুষ সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া বাস করিয়া থাকেন। এবং কোনও না কোন ভাগ্যবানের দর্শনও হইয়া থাকে। "সাধুনাং দর্শনাৎ পুণ্যং"—ইহাদের সঙ্গে

চলিতে চলিতে ও গল্প করিতে করিতে মার্গ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। এই ভাবে আরও কিছু দূর গমন করিবার পর দেখিলাম একস্থান হইতে যাত্রীরা কৈলাশের রজঃ সংগ্রহ করিতেছে। আমিও কিছু কৈলাশের রজঃ সংগ্রহ করিলাম। শুনিলাম এইখানেই মহাদেবের সঙ্গে ভস্মাসুরের ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে ভস্মাসুর যুদ্ধে পরাজয় ও পঞ্চত্বলাভ করেন। ভস্মাসুরের শরীর অবশেষে চুণের পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। যাত্রীরা সেই ভস্ম শ্রদ্ধার সহিত সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

পরম পবিত্র অনির্ব্বচনীয় কৈলাশ পরিদর্শন পরিক্রমন আর ইহার পাদপদ্মে দশম রাত্র অতিবাহিত করিয়াছিলাম। এবং মহান বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলাম। এই স্থানের অপূর্ব্ব জল, বায়ু, আকাশমণ্ডলও অলৌকিক দৃশ্যের তুলনা নাই। অনন্ত কাল হইতে অনন্ত লোক এস্থানে আগমন করিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃত্য মনে করিয়া থাকে। ইহার পর আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত দারচিন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহারা আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা আগেই এখানে বিশ্রাম করিতেছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল আমি বরফের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছি। রাত্রে বেশ ভালভাবেই নিদ্রা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া কয়েকজন আলমোড়ার যাত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। ইহারাও

মানস সরোবরে যাইবে তাহাদের সঙ্গে বর্খার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দারচিন হইতে বর্খা ৮।১০ মাইলের পথ হইবে। বর্খা একটি তিব্বতের 'মাঠ' যাত্রীরা এইখানে তাঁবু খাটাইয়া খাবারের আয়োজন করিতে লাগিল। আমাকে আলমোড়ার ভদ্রলোকেরা খেচুর আহার করাইয়া দিল। এবং তাহাদের তাঁবুতে বিশ্রাম করিলাম। এই বর্খার প্রান্তরের নাম আমাদের ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। সেনানী জোরাবর সিং পরিচালিত অল্প সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বহু সংখ্যক তিব্বতি সৈন্যের উপর অনন্য সাধারণ বিজয় লাভ করায় তিব্বতীদের নৈতিক বল ও বাহুবল পর্যুদস্ত করিয়া অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যে স্থানে একদিন তিব্বতি সেনার মৃতদেহে পরিপুর্ণ ছিল আবার সেস্থান একদিন আহত সৈনিকের আর্ত্তস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। যেস্থানে একদিন ভারতীয় সৈন্যের বিজয়দর্পে আর পলায়নপর বিভিষিকাগ্রস্ত তিব্বতী সেনারপদশব্দে ধ্বনিত হইয়াছিল, আজ সে স্থান শান্তরসে পরিপুর্ণ। প্রকৃতিদেবী যেন হাস্য করিতেছেন। দূর হইতে কৈলাশের শ্বেতবর্ণ শিখর উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর সম্মুখে বিশাল মানস সরোবর। এই বিশাল ভূমিতে আমরা নিরুদ্বেগে সেই বর্খার যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রি যাপন করিলাম। রাত্রে খুবই আনন্দদায়ক সুখস্বপ্ন দেখিলাম। চিন্তায় ভয়ে ছিলাম না। এই মাঠে কোন প্রকার শস্যাদি কিছুই হয় না। সম্পূর্ণ মাঠটী পাথরীলা। শীতঋতুতে প্রায় ৩।৪ ফুট বরফ জমিয়া যায়।

একবিংশ খণ্ড

মানস সরোবর

গঙ্গা সিন্ধু সরস্বতি চ যমুনা গোদাবরী নর্ম্মদা।
কাবেরী সরোজ মহেন্দ্র তনয়া চম্পাবতী বেণীকা।
ক্ষিপ্রা বেত্রাবেতী মহাসুর নদী খ্যাতা গয়া গণ্ডকী।
পূর্ণা পূর্ণাজলে মানস সহিতা কুর্ব্বান্তনো মঙ্গলম্।।

প্রাতঃকালে উঠিয়া কৈলাশপতিকে প্রণাম করিয়া, আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। বর্খা হইতে মানস সরোবর দশ মাইলের মধ্যে। মানস হইতে গুম্ফা অতি নিকটে ইহারই পাদদেশ হইতে কতগুলি উষ্ণধারা আছে। এইখানে সকলে একরাত্রি নিবাস করিয়াছিলাম। যু-গুম্ফা পিরামিডের ন্যায় একটি ছোট পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে কৈলাশ ও মানস নিকটে থাকায় দৃশ্য অতি মনোরম দেখায়। এক সময়ে মানসের ও রাবণহ্রদের একটি স্রোতের দ্বারা সংযুক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সেই ধারা না থাকিলেও চিহ্ন বেশ দেখিতে পাওয়া যায়. এইখান হইতে তেমন কোন কষ্টকর রাস্তা নাই। কেবল হিমের যাত্রা কষ্ট; এইখানে অতি আনন্দের সহিত স্নান আদি সমাপন করি। উক্ত ধারাগুলি কিছুদূরে যাইয়া এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

মানস সরোবরে বহু বাল-হংস খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। দুর হইতে বেশ সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু রাজহংসের কোথায় ও অস্তিত্ব দেখিলাম না। দিবাভাগে সে সৌন্দর্য্যের সুরমা লইয়া মানস আপন মনে লীলা করিয়াছিল। এখন সে সৌন্দর্য্য হইতে স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে লাগিল।

উপরের পরিষ্কার সুনীল আকাশ মণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়া মানস যেন অপূর্ব্ব ক্রীড়া করিতেছে। নক্ষত্র ভূষিত অম্বর মানসকে যেন কৃষ্ণাম্বরে সজ্জিত করিয়া জ্যোতীর্ম্ময় ভূষণ দিয়া জড়িত করিয়াছে। কবি ইহা কল্পনার চক্ষুতে দেখিলেন—প্রস্ফুটিত কমনীয় কনক—কমল মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে কম্পিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন আত্মগোপন করিতেছে। সুখস্পর্শ সমীরণ স্পর্শে মানসের বিশাল বক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল আবির্ভুত হইয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রচনা করিতেছিল। এ সঙ্গীতের তুলনা নাই। যেন প্রাণের সখাকে এই মধুর সঙ্গীত শুনাইবার জন্য অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতসারে তরঙ্গসকল আলাপ করিতেছে। এই অদ্ভূত ঐন্দ্রজালিক দেশে সকলই অদ্ভুত। নিশীথ নিস্তব্ধতা ঐন্দ্রজালিকের হস্তের যেন সম্মোহন দণ্ড। দর্শককে এই সম্মোহন দণ্ডের প্রভাবে অভিভূত করিয়া ঐন্দ্রজালিক প্রবর কল্পনাকে কুণ্ঠিত করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করিয়া আপন মনে স্বচ্ছন্দ চিত্তে ক্রীড়া করিতেছে। বামদিকে যুগুস্কার পাহাড় যেন

একটা মহাকাল পুরুষের মত অবস্থান করিয়া, কামরূপ মানস সরোবরের মধুর লীলা সম্ভোগ করিতেছে। সকল সৌন্দর্য্যের আধার ব্রহ্মার মানস পুত্রের এই মানস দৃষ্টি, দেবতা-দিগের লীলা নিকেতন, মানুষের অধিক দিন থাকিতে দেন না।

মানস সরোবরের পরিধি প্রায় ৪৫ মাইল হইবে। দেখিতে চারিদিক গোলাকার। ইহার পরপার পর্য্যন্ত বেশ দেখা যায়। ভক্তগণ মানসের চতুর্দ্দিক পরিক্রম করিয়া থাকে। ইহার তীরে অনেকগুলি মঠ আছে। এই সব মঠে লামা ভিক্ষুক থাকিয়া তপস্যা করেন। আমি পূর্ব্বে সেই শিবচি লিঙ্গ হইতে পারিচয় আনিয়া ছিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, আমি যেই স্থানে আছি, সেই স্থান হইতে প্রায় বিশ মাইলের মধ্যে সেই আন-ডু-মঠ। দুইদিন বিশ্রাম করিবার পর আলমোড়ার সঙ্গিদের এইখান হইতে বিদায় করিয়া সেই মঠের উদ্দ্যেশ্যে মানসের ধারে ধারে চলিলাম। অনেক লামা ও ভূটানি যাত্রী পরিক্রমের উদ্দ্যেশ্যে অগ্রসর হইতেছে। মানস সরোবরে অনেক বড় বড় মাছ দেখিলাম। মরা মাছ লামারা খাইয়া থাকে। কিন্তু জীবন্ত মাছ কেহ ধরে না। প্রাতঃকাল হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে বলিয়া খুবই শীত হয়। বেলা ১২টার সময়ে আমি সরোবরে আসিয়া অনেক বার স্নান করিয়াছিলাম। এই উচ্চ প্রদেশ সাধনের পক্ষে বড়ই উপযোগী স্থান। শরীর নিশ্চল হইলে মনের চঞ্চলতা দূর হয়।

এদেশের প্রাকৃতিক অবস্থান শরীরকে নিশ্চল করিবার পক্ষে খুবই উপযোগী। অল্প শ্রমেই শরীর ক্লান্ত হইয়া পরে। প্রকৃতি দেবী যেন ইঙ্গিত করিতেছেন। চঞ্চল হইও না। শান্ত ভাব ধারণ কর, পরম শান্তি পাইবে। স্থির হ'য়ে অবস্থান কর। ধ্যান পরায়ণ হও! বিনা রোধে বায়ু কুম্ভকে স্থির হইবে। মনন যোগী ও হঠযোগীর পক্ষে অতি উত্তম স্থান। তিববতে অনেক হঠযোগী যোগ অভ্যাস করিতে দেখিলাম।

মানস-সরোবরের জলের মতন সুস্বাদু জলযুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল—কিটানুবিহিন জল জগতে দুল্লভ। ইহার উচ্চ উচ্চ পারে অনেক গুম্ফা আছে। দূর হইতে দেখিতে অতি মনোরম দেখায়। কখনও কোন কোন গুম্ফায় একটু একটু বিশ্রামও নিয়াছিলাম। তথায় অনেক ভিক্ষুকের সঙ্গে আলাপও করিয়াছিলাম। মানস জলের একটু উপর দিয়া পরিক্রমের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। মানস সরোবরে অনেক ঝাঁকে ঝাঁকে বালহংস জলের উপরে খেলা করিতে দেখা যায়। পার্শ্বে চিরতুষার মণ্ডিত হিম পর্ব্বতের ছায়া পড়িয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পথিককে আনন্দ প্রদান করিতেছে। এই রাস্তা দিয়া দক্ষিণের প্রায় শেষ সীমায় যাইতে হয়। ইহার প্রায় ১০ মাইলের মধ্যে গোসন গুম্ফার মঠ। এই মঠে আমি দুই দিন বাস করিয়া চারি মাইল দূরে আন-ডু মঠে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এবং সেই পরিচয় পত্রখানি একজন

ভিক্ষুকের হাতে দিলাম। পত্রে কি লেখা ছিল তাহা তিব্বতী ভাষায় থাকায় আমার জানা ছিল না। পত্রখানি পাইয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিল। এবং আমার বিশ্রামের জন্য একটি জায়গা দেখাইয়া দিল। ঐ মঠে আরও ৮।১০ জন ভিক্ষুক সাধু ছিলেন। সকলে আমাকে কাশীর লামা বলিয়া ডাকিত, এবং খুবই আদর যত্ন করিত। আমি পরম আনন্দের সহিত ১০ দিন এইখান আন-ডু-মঠে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। শীতঋতুতে মানসের জল জমিয়া এত শক্ত হয়, পশু সকল তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। এই মানসের শোভা হংসাদি জলচর পক্ষী ও মাছ সকল শীতের আগমন বুঝিতে পারিয়া নীচের দিকে আসিয়া শীত ঋতু অতিবাহিত করে। মানসের মৎস্যের ধুম বালকের রোগের পক্ষে বড়ই উপকারী। যেই দিন মানস পরিত্যাগ করিব সেই দিন পুনঃ স্নান করিয়াছিলাম। অমি নিত্যই মানসের জল পান করিতাম। রাবণ হ্রদ যেমনি নাম তেমনি ইহার গুণ, কেহই ইহার জল স্পর্শও করে না। দেখিতে যেন ক্রুর প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু মানস আমাদের নিকট যেমন পবিত্র, তদ্রূপ তিববতী ও ভুটানিদের নিকটও পরম পবিত্র তীর্থ। এই মহান্ পবিত্র হ্রদ হইতে শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও ইরাবতী, গঙ্গার মতন পরম পবিত্র নদীর উৎপত্তি হইয়া পুণ্য ভূমি ভারতোভিমুখে গমন করিয়াছে।

এই স্থান হইতে প্রণাম করিয়া আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত তাকলাকোটের রাস্তায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাক্‌লাকোটে আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। যাত্রার পুর্ব্বে ও এক সপ্তাহ কাল বাস করিয়াছিলাম। এই তাক্‌লাকোট হইতে এক রাস্তা খেচর নাথ চলিয়াগিয়াছে। খোঁচরনাথ বা খেচর নাথ এইখান হইতে প্রায় ১০ মাইল। মানস খণ্ডে ইহার যথেষ্ট মাহাত্ম্যের বর্ণন করিয়াছেন। যেই সকল যাত্রী কৈলাস দর্শনের নিমিত্ত আসিয়া থাকেন, তাহারা সকলে কৈলাস, মানস এবং খোঁচরনাথ তিনটি তীর্থ দর্শন না করিলে যাত্রা পূর্ণ হয়না। কর্ণালি নদীর ধারে ধারে সীধা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময়ে বহু পাথরের উপরে পালি ভাষায় "ওঁ মণি পদ্মে হুং, মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। জন মানব শূন্য রাস্তা, কিন্তু যাইবার সময়ে বহু যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, তাক্‌লাকোট আর খোঁচর নাথের মধ্যে একটি ছোট তিব্বতীদের সূজি নামক গ্রাম পাওয়া যায়, কিছুদুর অগ্রসর হইলে কর্ণালী নদীর সঙ্গে সাবিত্রী নদীর সুন্দর সঙ্গম হইয়াছে। এই সঙ্গমের স্থান অতি মনোহর কাঠের তিব্বতীদের পুল পার হইলে ছোট একটী বাজার আসিবে। অনেক ব্যবসায়ীকে মেষের লোম, চামর ও কম্বলাদি ক্রয়-বিক্রয় করিতে দেখা যাইবে। ইহারই নিকটে খোঁচর নাথের প্রসিদ্ধ মন্দির। নদীর সম্মুখে মন্দিরের দ্বার, প্রথমে রামসীতার মূর্ত্তি, তাহার পর মহাকাল-মহাকালীর সুন্দর মূর্ত্তি,

ইহার পার্শ্বে গণেশ মূর্ত্তি, আর চতুর্দ্দিকে ভগবান বৌদ্ধদেবের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অনেক ছোট ছোট মূর্ত্তি, এই সকল মূর্ত্তি আমাদের কালী, তারার মূর্ত্তির মত। আরও অনেক মূর্ত্তিতে মন্দির ভরপুর। মন্দির বেশ বড়, কিন্তু মন্দিরের ভিতর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। মন্দিরের পুজারী ভুটানী, অতি সদাশয় লোক। পুজারী রাত্রে আমাকে যথেষ্ঠ আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে খোঁজ নাথ বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অন্তিম বিদায় নিয়া পুনঃ তাক্‌লাকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখিলাম যাত্রীতে সমস্ত যায়গা পরিপূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম এই বৎসর কৈলাসে কুম্ভ মেলা। তিব্বতীদের ঘোটক বৎসর। এই ঘোটকের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন অগ্নি ঘোটক, জল ঘোটক, লৌহ ঘোটক, কাষ্ঠ ঘোটক প্রভৃতি। এই তাক্‌লাকোট, তাকুলা ঘর বা পুরাং নামেও পরিচিত। এই স্থানে বীরবর জোরাবর সিংহের কীর্ত্তি কিল্লার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে আমি প্রায় ১০ দিন বাস করিয়াছিলাম। একদিন এক ভুটানির দোকানে বসিয়াছি এমন সময়ে একজন তিব্বতি স্বর্ণরেণু ও মুক্তা বিক্রি করিতে আসিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, অতি উত্তম স্বর্ণ ও মুক্তা, তাহাদের নিকট শুনিলাম কৈলাস অঞ্চলে অনেক স্বর্ণের খনি আছে। এবং অনেক নদীতেও মুক্তা পাওয়া যায়, ইহারা

সেইখান হইতে গুপ্তভাবে লইয়া আসে। সম্পূর্ণ তিব্বত রাজ্য খানি সাধুদেরই সাম্রাজ্য বলিলে হয়।

ইহাদের সাধুর উপর বেশ শ্রদ্ধা দেখা যায়। কিন্তু জটাধারী না হইলে হইবেনা এইখান হইতে পিপুলিখ খাটি দশ মাইলরে মধ্যে। এই তাকলা কোট তির্ব্বত প্রদেশের সর্ব্ব প্রথম অন্তিম বস্তি, বরখা এইস্থান হইতে নিকটে এইখানে তির্ব্বতি রাজ্যধিকারী তর্জ্জনের নিবাস স্থান, লাসাস্থিত দলাই লামা তিব্বতের সর্ব্বমান্য ধর্ম্মগুরু এবং সর্ব্বোচ্চ রাজ্যাধিকারী ইহঁারই অধিনে সব রাজকার্য্য ধর্ম্ম কার্য্য হইয়া থাকে, তাকলা কোটে জুংপগের নিবাস স্থান, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ মঠ ও ধর্ম্ম প্রচার হয়, মঠের নাম এইদেশে গুম্ফা বলিয়া থাকে। এইমঠে প্রায় একশত ভিক্ষুক ও ভিখারিণী স্থায়ী রূপে বাস করে, এই মঠের প্রবন্ধাদি কিছু লাসা হইতে আসে, কিছু স্থানিয় অর্থের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাক। এইখানের বাজারে ভারতীয় মুদ্রার একেবারেই প্রচলন নাই। কিন্তু নৈপালী সিক্কা চলে তিব্বতী ভাষা বুঝিবার কোন উপায় নাই, ইহার প্রধান কারন শিক্ষার একেবারেই কেন্দ্র নাই। তৎজন্য ভাষা শিক্ষা করা অসম্ভব। ইহাদের উচ্ছিষ্টাদির কোন জ্ঞান নাই। অন্য দেশীয় লোকের সঙ্গে বিশেষ মিলা মিশাও করে না। কিন্তু ভুটীয়াদের সঙ্গে ব্যপার বাণিজ্যাদি করিয়া থাকে। তাকলা কোট হইতে ভারতের রেল ষ্টেসন্ টনকপুর প্রায়

দুইশত মাইলের মধ্যে। গুম্ফা শব্দে একান্ত স্থান। প্রত্যেক মঠের মঠাধীশ লামাগুরু হয়, ইহাদের দলাই লামা দ্বারা লাসা হইতে নিযুক্ত করা হয়। দলাইয়ের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলে। ইহাদের প্রধান আহার ছাতু, চা মাংস। এসব মঠে পালি ভাষায় একটি করিয়া পুস্তকালয় আছে। এইসব মঠে নানা প্রকারের দেব মূর্ত্তি আছে, অনেক দৈত্য দানবের বড় বড় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় মন্দিরে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। প্রায় মঠ কাঠের তৈয়ারী দোতালা হয়। ইহারা ভোজনের পূর্ব্বে ও পশ্চাতে সম্মিলিত ভাবে প্রার্থনা করে। ভিক্ষুক ও ধার্ম্মিক লোক এক পিতলের গোলাকার চক্র হাতে রাখে, ইহা প্রায় সময়ে ঘুরাইতে থাকে। এই চক্র পরম পবিত্র জপমালা, ওঁ মনি পাদ্মেহুং, অঙ্কিত থাকে। ইহা ঘুরাইবার তাৎপর্য্য জপ করা। কৈলাস এবং মানস সরোবরের সব মঠ প্রায় একই প্রকারের ৮।১০টি মঠ মানস সরোবরের তীরে অবস্থিত। কৈলাসের চতুর্দ্দিকেও ৬।৭ টি মঠ বা গুম্ফা আছে। এসব মঠের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে যেমন দারচিন, জগড়া, শিরলুঙ্গ ছুকুরী, মগিচর্চী, থান-ডু, জিড়ফুং এবং রুতফু আদি। ইহাতে কিছু না কিছু কোন্ কোনটী একটু পার্থক্য আছে। এই সব মঠের উপরে স্বর্ণ কলস সুশোভিত আছে। তিব্বত একটী মঠ বা গুম্ফার দেশ বলিলে হয়। তিব্বতে শাসনাদি কার্য্য এই সব মঠের অধীন। এখানে লোকের জীবন ও আচরণ এসব মঠের

দ্বারা নিয়মিত এবং সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহাদের ধার্ম্মিক রহস্যের যে সার ও আধার স্বরূপ। তাহা মঠই প্রদর্শক, পালক ও রক্ষক রূপে বিরাজিত হইয়াছে। একটি মেয়েকে তুই তিন জনে বিবাহ করে। কেহই জীবন পর্য্যন্ত আবার বিবাহও করে না; চুল দাড়ী কেহ কাটায় না।

ভারতের সীমা লিপুলেখ পার হইবার পর তিব্বত আসিয়া যায়। এই ঘাটী হইতে চারি মাইল চলিবার পর পালা নামক স্থান বা চৌকি আসিবে। এখান হ'তে পাথরের মাঠ কঠিন ভূমি। এখানে তুইটী বস্তু সহজ প্রাপ্ত, একটী তুষার দ্বিতীয় প্রাণ হন্তাকারী দস্যু, পদে পদে ডাকাতের ভয়, সর্ব্বদা যেন তীখ্ন তরবারী মস্তকের উপরে ঘুরিয়া মৃত্যুকে ডাকিতেছে। যাত্রীরা দল বাঁধিয়া পথ প্রদর্শক ও ইংরাজী বন্দুক বিছানা ও শুকনা খাদ্যাদি সঙ্গে করিয়া তিব্বতের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য। তিব্বত দেশে বৃষ্টি প্রায়ই কম হয়। পরন্তু এই উচ্চ শিখর প্রদেশে হিমপাত সদা সর্ব্বদা হইয়া থাকে। তিব্বতে ভূমি প্রায় সমতল এবং পাষাণ যুক্ত সেজন্য এখানে কৃষি কর্ম্ম আদি খুবই কম হয়। সমস্ত প্রদেশ যেন নির্জীব ও তৃণ শূন্য ভূমি, এখানে কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিছুই নাই। এখানের জল বায়ু অত্যন্ত শীতল। তিববতের ভূমি বড়ই নির্ম্মল ও পবিত্র। এখানে কোন মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গ আদি কিছুই নাই। কেবল মনুষ্য,

ভেড়া, ছাগল, চামরী গরু বা জর্ব্ব্ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের জন্তু দেখা যায় না। কেহ কেহ সর্প পূজা করিবার জন্য ক্রয় করিয়া পোষিয়া থাকে। ইএখানের লোক বড়ই কঠোর ও নির্দ্দয়ী হইয়া থাকে। এইখানের লোক বিচিত্র বিচিত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন বীজয়া, দাবা, ও নীক্রো এই তিন শ্রেণী। বীজায় বলে তিব্বতের ব্যাপারীকে। দাবা কৃষক, আর নীক্রো চোর, ডাকাত, ঠক্ ও ভিখারী। ইহারা শীতঋতুতে আলমোড়া পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে। ইহার নীচে অর্থাৎ ভারতের দিকে বিশেষ আসে না। ইহাদের ধর্ম্মের উপর খুবই বিশ্বাস। ইহারা ভূত প্রেতাদির ভয়ে ভীত থাকে। তিববতীয় রাজধানী লাসায় মহাগুরু দলাই লামাই সমস্ত প্রদেশের একমাত্র শাসক। ইনিই রাজা, ইনি খুবই অল্পবয়স্ক, বৃদ্ধ হইবার পুর্ব্বে শাসন ভার আপন হাতে রাখে না। ইহাদের এই বিশ্বাস, গুরু যদি অল্পবয়স্ক হয় তবে তাহাদের উপরে কেহ প্রভুত্ব স্থাপিত করিতে পারিবে না। এক লামা গুরুর মৃত্যুর পর অন্য গুরুকে নিযুক্ত করিয়া থাকে। ঐ সময় হইতে নিযুক্ত হয় যখন শিশু থাকে। তাকলাকোটের নিকট খোঁজর নাথের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠের নিকটে এক অন্য মঠ আছে, তাহাতে আমি দেখিয়াছি, একটী ৮।১০ বৎসরের নাবালক শিশু গদীর মালিক। তিববতীরা লবণ ও চা বিক্রয় করিয়া থাকে। এই বস্তুর এইখানে অভাব। ইহাদের মৃত দেহ জ্বালান হয় না। বোধ হয় কাঠের অভাবের জন্যই এই প্রথা। কেহ

মরিলে হয় মাটিতে পুতিয়া রাখে, নতুবা নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া থাকে। অথবা মাঠের উপর ফেলিয়া দিয়া আসে। বৎসরের মধ্যে বোধ হয় ২। দিন স্নান করে কিনা সন্দেহ। নিজ হাতে ইহারা লোমের কাপড় তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করে। বিদেশী লোককে ইহারা শত্রু বলিয়া মনে করে। যখন কোন পর্ব্বাদি হয় তখন ইহারা এত অধিক মদ খায় এবং নৃত্য করে তাহা বলা যায় না।

এই খণ্ডে তিব্বতের সামান্য সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ মানচিত্র মাত্র দিলাম, পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব কার্য্য। পরন্তু তিব্বতে এই ভাগের মধ্যে কৈলাশ মানস সরোবর, জ্ঞানামামণ্ডি, তাকলা কোট, এবং তীর্থ পুরি আদি স্থান উপেক্ষা কদাপি করিবার নহে। অতি সাহসী উদ্যমী লোকের দরকার। আমি এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া যাহা অনুভব ও দর্শণ করিয়া আসিয়াছি, যৎ সামান্য ভাবে বর্ণণা করিলাম। যাহারা অতি ভোগী মনুষ্য তাহারা যেন এই প্রদেশে কদাপি ভ্রমণ করিতে না আসেন। শাস্ত্রেতে তাহাদের বিষয়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ভিক্ষা ভুজো নিবর্ত্তন্তাং ব্রহ্মনা যতয়শ্চ যে।
ক্ষুত্তৃষ্ণোঽধ্ব শ্রমায়াম শীতার্ত্তিম সহিষ্ণবঃ॥
তে সর্ব্বে বিনিবর্ত্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ।
পাকান্ন লেহ্য পানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ॥
তেঽপি সর্ব্বে নিবর্ত্তন্তাং যেঽপি যদ্দানু যায়িনঃ॥

অর্থাৎ—যাঁহারা ভিক্ষা-ভোগী যাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা, পথের ক্লেশ ও শীত সহ্য করিতে পারে না। এরূপ ব্রাহ্মণ, যতি প্রত্যাবর্ত্তণ করুণ, আর যাঁহারা মিষ্টান্ন ভোজী, পাকান্ন প্রিয়, লেহ্য চুষ্য, লেহ পেয় ভোজী এবং নানা প্রকারের মাংস আহার করেন তাহারা দয়া করিয়া নিবৃত্ত হইবেন। যাহাদের ফুস্ ফুস্ (হাট) কম জোর তাহারাও পর্ব্বতের শিখরে আসিবেন না। আর যাহারা চাকর ও পাচকের পশ্চাতে অনুগমন করেন তাঁহারাও এই হিমাদ্রি শিখরে আরোহন করিবেন না।

দ্বাবিংশ খণ্ড

রাক্ষস তাল

তাকলাকোট হইতে মানস সরোবর পর্য্যন্ত প্রায় ১৭০০০ ফুট চড়াই করিতে হয়। তাকলাকোট ১৪৩০০ ফুট। মানস সরোবর ১৯৮০০ ফুট। রাক্ষসতাল ১৮৯০০ ফুট। প্রথম যাইবার সময় আমি রহসঙ্গ আসিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকি। রহসঙ্গ ১৭৯০০ ফুট। রহসঙ্গ হইতে সুজঙ্গ ১৪৫০০ ফুট উচ্চ।

ইহার পর তালকা কোট। এইখান হইতে বর্খার বিস্তৃত মাঠ। এই মাঠ হইতে জঙ্গলী ঘোড়া দৌড়াইতেছে দেখা যাইবে। এই মাঠ পার হইবার পর পুনঃ মানস সরোবর অন্তিম দর্শন হইয়া থাকে। ইহার পর বিশাল রাক্ষস তাল। যেমন নাম তেমন ইহার রূপ গুণ। ইহার কেহই জল পান করে না (এমন কি কেহই স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না)। ইহার পরিধি ৫০ মাইলের ও বেশী হইবে। ইহার মধ্যে এক গুমফা আছে। শীতের সময়ে যখন জল জমিয়া যায়, সেই সময়ে লামারা ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহার তীর দিয়া রাস্তা। মানস হইতে রাক্ষস তাল অনেক বড়। মানস সরোবর এবং রাক্ষস তাল কোন সময়ে একই ছিল। পরন্তু কালচক্রে ইহার মধ্যে ছোট একটী পর্ব্বত হইয়া যায়। এই খানে কোন প্রকারের বৃক্ষাদি ও তৃণ পর্য্যন্ত কিছুই দেখা যায় না। যেন সর্ব্বত্র শ্মশান ভুমির মতন। প্রকৃতি দেবী যেন উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ভীষণ, যেন রাক্ষস মুর্ত্তিতে হাঁ করিয়া মুখ বিস্তার করিয়া তপ্ত রক্ত শীতল করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্ধত হইয়া রহিয়াছে। ইহার তরঙ্গ রাশীও ক্রুড় বলিয়া মনে হয়।

মানস সরোবরের নিকট জীজ গুম্ফা ১৫০০০ ফুট। ৮ মাইল দূর। ইহার পর বুম্পপু ১২ মাইল। এইখান হইতে কৈলাশ দর্শন হয়। বুম্বপু হইতে ৯ মাইল ডিণ্ডিফু গুম্ফা ১৭৪০০ ফুট

ডিণ্ডিফু, গুমফা হইতে ৫ মাইল চড়াই করিলে গৌরিকুণ্ড ১৮৭০০ ফুট। গৌরীকুণ্ড হইতে ১৩ মাইল ঝিণ্ডফু গুমফা সহজল নদীর ধারে। রাক্ষসতাল হইতে বর্থার মাঠ পার করিলে লীপুলেক, লীপুলেক পার করিবার পর ভারতের সীমা আসিবে। লীপুলেকের উচ্চতা ১৬০০০ ফুট। এই সব উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এইখান হইতে আলমোড়া ১৭৪ মাইল। যাত্রীরা প্রায় এই রাস্তায় কৈলাশ দর্শনের আশায় তিব্বত আসিয়া থাকে। এই রাস্তা অনেকটা ভাল। বরফ কম পাওয়া যায়। তাকলাকোট ১৩ মাইল। সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইতে হয়। লিপুলেকের ঘাটীতে পৌঁছাইতে তিব্বত ভ্রমন যে কি প্রকার কষ্টকর তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইখানে আসিলে অনুভব হয়। প্রায় ৭ মাইল চড়াই করিবার পর তিব্বতে পালা নামক প্রথম স্থান। এইখান হইতে লীপুলেক খুবই কষ্টকর রাস্তা। এক এক চরণ ফেলিতে বিপদের আশঙ্কা। তাহার পর বিশ্রাম শাঞ্চম নামক স্থান। প্রায় ৭৷৮ মাইল হইবে, এবং দুই মাইল উতরাই, তৎপরে মহান্ প্রানান্ত কষ্টকর চড়াই, যেমন চড়াই, তেমন হিম। এইখানের উচ্চতা ১৫৬৮০ফুট। এখানে হিমের জন্য রাত্র যাপন মহা কষ্ট কর। ইহার পর হিন্দু রাজত্বের সীমা আসিবে। রাত্রে অত্যাধিক তুষারপাত হওয়াতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। প্রাতঃকালে ভোলানাথের নাম করিয়া

কালাপানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবার হিন্দু রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। ইহার পর হইতে তুইচারিটি বৃক্ষের দর্শন হইতে লাগিল। কৈলাস যাত্রার সময়ে এইখান হইতে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়।

এ জনমানব শূন্য নির্জ্জন প্রদেশে কেবল নদীর কুলু কুলু শব্দ ব্যতিত অন্য কোন শব্দই কানে আসে না। এইখান হইতে তিন জন ভারতীয় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়। তুইজন বাঙ্গালী রাম কৃষ্ণ মিশনের, অন্য একজন এলাহাবাদের। চারিজন মিলিয়া একইস্থানে অনেক কথাবার্ত্তার পর রাত্র যাপন করি। আমি যাইবার সময়ে যোশী মঠের রাস্তায় যেমন সঙ্গিহীন অবস্থায় গিয়াছিলাম কিন্তু ফিরিবার সময়ে আলমোড়ার রাস্তায় যখন ফিরিতেছিলাম তখন বহু সংখ্যক যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। ইহারা মায়াবতী টনকপুর হইয়া আসিয়াছেন। এই কালাপানী অতি রমনীয় ইহার উচ্চতা ১২৫০০ ফুট। নদীর তীরে সামান্য ভূমি সমতল। প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। এইখান হইতে কালি নদীর কিনারে কিনারে যাইবার পর প্রথমে নৈপালের সীমা আসিবে। পুনঃ হিন্দু রাজত্বের অন্তর্গত ৮ মাইল যাইবার পর কালা পানি। রাস্তা নাই বলিলে হয়।এই কালী নদীর জল শীতের ঋতুতে একেবারে জমিয়া যায়। ইহার পর চীর ও দেবদারুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ। নিকটের পর্ব্বত হইতে কালী নদীর উৎপত্তিস্থান, কালী নদীর

সঙ্গে অতি কোপবতী কুটীয়াংতী নামক অন্য একটী নদী মিলিত হইয়াছে। ইহার উদ্গম ব্যাস নদীর উপরের ভাগ হইতে মছাঙ্গ নামক ঘাটীর নিকটে, যাহা তিব্বত ও হিন্দু রাজ্যের সীমায়। কালী নদীতে এই দুই ধারা মিলিয়া অতি তীব্র গতিতে গার্ব্বায়াং হইয়া ধৌলি নদীর সাথে মিলিত হইয়াছে। ইহার প্রবাহ অতি তীব্র উৎপত্তি স্থান হইতে ৭৫ মাইল যাইয়া গোরি গঙ্গায় মিলিত হইয়া পাচেশ্বর যাইয়া সরযূ নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই খানের সঙ্গমের দৃশ্য অতি মনোরম। এখন কালাপানি হইতে নিম্ন দিকের রাস্তার দূরত্বের ও স্থানের নাম দেওয়া গেল।

গর্ব্বিরাং—কালাপানি হইতে ১০ মাইল নীচে। ১৫০০ ফুট। এই হিন্দু রাজ্যের অন্তিম ডাকখানা। তিববতে যাইবার জন্য সমস্ত জিনিষ পত্র ও কুলি আদি এইখান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া তৎপর আগে অগ্রসর হইতে হয়। এখানে সমস্ত ভুটীয়াদের বস্তী। এখানে খুব উপজাও হইয়া থাকে এখানের বস্তী কাশ্মীর নেপাল ও তিববতের নিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে আছে। তিববতী লোক প্রায় তিববত যাত্রীদের কুলি পথ প্রদর্শকের কাজ করিয়া থাকে। এই গর্ব্বিয়াং সব মানবীয় লীলা ও কলার অন্তিম স্থান। আমি প্রায় এক মাস গর্ব্বিয়াং থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম। খড়গসিং নামক একজন পাহাড়ী লোক যারপরনাই সেবা করিয়াছিলেন।

এখানের মধ্যে তিনি একজন গ্রামের গন্য মান্য লোক। উল্ এবং ক্ষেতিই মূখ্য ব্যবসা। ইহার আগে প্রায়ই বরফের দেশ। এস্থানকে যেন পর্ব্বতের কেল্লার দ্বারা রক্ষা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত শ্রেণী। এখানের জলবায়ুও বেশ স্বাস্থ্যকর। ছোট একটি স্কুলও আছে। কয়েকখানি দোকান আছে। প্রায় খাদ্যাদিও পাওয়া যায়।

বুধি—গর্ব্বিয়াং হ'তে ৭ মাইল নিম্নে। তিন মাইল শক্ত চড়াই। তিন মাইল উতরাই করিলে এক মাইল সীধা মার্গ অতিক্রম করিলে বুধি নামক ঘাটী আসিবে। আমার চির-কালের সাঙ্গীনি কালী নদী যাহাকে মধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, পুনঃ এখানে অতি তীব্র গতীতে প্রবাহিত হ'তেছে। ইহাকে দেখিলে মনে হয় যেন তাড়াতাড়ি কোথায়ও পলাইয়া যাবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অতি সুন্দর দৃশ্য। নিকটে প্রকাণ্ড দেবদারু ও চীরের বৃক্ষের মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

মালপা—মালপা হইতে বুধি ৭ মাইল, ৭০৫০০ ফুট। প্রায় রাস্তা চড়াই ও উতরাই। এই স্থানটী খুঁবই দুর্গন্ধ যুক্ত। ভেড়া, ছাগলের মল মূত্রে পরিপূর্ণ। নিকটে ভুটিয়াদের বস্তী। এইখানের মাটীও যেন কাল রঙের।

জুপতী—মালপা হইতে প্রায় ১০. মাইল ৯০৭০০ ফুট। এ রাস্তা ভয়ানক কঠীন। ভীষণ : চড়াই। তাহার উপর

অনেক পাহাড় ভাঙ্গিয়া গিয়া আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে। এক এক চরণ ফেলিতে অতি সাবধান হ'তে হয়। ইহা প্রসিদ্ধ নৈপালী মার্গ। পূর্ব্বে যখন রাস্তা ছিল না তখন যাত্রীরা ঘাস, লতা, বৃক্ষাদি ধরিয়া ধরিয়া ক্ষুধায় পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়া এই রাস্তায় আসিতেন। পরন্তু বর্ত্তমান সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মীহশুর মহারাজ যখন কৈলাশ যাত্রা করেন, সেই সময় তিনি নদীর ধারে ধারে একটী রাস্তা করিয়াছিলেন। সেই জন্য একটুখানি সরল হইয়াছে। এই রাস্তায় চলিবার সময় মৃত্যু যেন চক্ষের সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে, এই জন্য কোন যাত্রী এই পথের অন্তে মালপার নিকটে নদীর তটে বসিয়া বসিয়া শান্ত মনে বড় ভাবোৎপাদক শব্দে বলিয়া গিয়াছেন মরিবার পর আমার লাশ মধু বনে গড়াইয়া দিও। ইহার অর্থ কীর্ত্তির মর্গে শ্মশান হইতে আসে। মহান কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে হইলে, মহান মৃত্যু সমান কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এই নদীর ধারা অতি বেগের সহিত চলিয়া যাইতেছে। নদীর ধারে ধারে রাস্তা। নদীর জলে এরূপ ভয়ঙ্কর অদ্ভুত শব্দ হয়, যেন সমস্ত পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া একাকার করিয়া দিবে। এখানে গেহু ও ধান্যাদি কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে। খাদ্যাদি খুবই সুলভে পাওয়া যায়। একটী ছোট পাঠশালা ও আছে। রাত্র বাস করিবার জন্য কোনরূপ

অসুবিধা হয় না। ইহার পর ভয়ানক জঙ্গল। দিনের বেলায় বাঘ ডাকে, চিতা বাঘের সম্রাজ্য বলিলেও হয়, এই ঘোর জঙ্গলের নাম বাংঝ বলিয়া থাকে। দিনের সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না। কোন কোন বৃক্ষকে বড় বড় সর্প জড়াইয়া ধরিয়াছে দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কিছু দূরে আলগার নামক একটী গ্রাম পাওয়া যায়। দুই তিন খানি দোকান রাস্তায় ধারে আছে। বেশ সুন্দর শীতল ছায়া, দূর হইতে নদীর কুল কুল শব্দে তপস্বীর চিত্ত আকর্ষণ করে। শান্তিময় উত্তম স্থান। সিরঘা—জুপতী হইতে ১১ মাইল চড়াই ও উতরাই করিয়া যাইতে হয়, রাস্তা কিছু দূর পর্য্যন্ত একটু ভাল তাহার পর খুবই খারাপ। আবার সিধা চড়াই প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চ শিখরে। তিখল নামক স্থান, জল খুবই শীতল, অত্যন্ত রমণীয় স্থান। আমি এই গ্রামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম ইহা ভুটিয়াদের বস্তী। এই স্থানের ঘর বাড়ী দ্বিতল হয়। ইহারা মঙ্গোলিয়ান জাতীয় হিন্দু। ইহাদের রং গৌরবর্ণ হইয়া থাকে। মুখ ও নাক কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা হয়। ইহাদের বস্তী ধারচুলা হইতে আরম্ভ হয়। দুইটী স্কুল আছে। শিক্ষক মহাশয় বেশ ভক্ত লোক। তাঁহার নাম রাম সিং। এ রসাহয্যে ভুটানীরা আচার বিচার কিছু কিছু অবগত হইয়া থাকে। ইহাদের ভুটিয়া নাম কি কারণে হইল, তাহার সম্পূর্ণ তত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব। পরন্তু এইটাই অনুমান করা যায়

ভোট শব্দ হইতে ভুটিয়া হইয়াছে। কুমায়ুর লোকেরা ইহাদের এই ভাগকে ভোট দেশ বলিয়া থাকে। এই কারণে ভুটিয়া নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা স্বাধীন ভোটের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে ভোটের কিছু অংশ হিন্দু রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ইহারা সর্পাদিকে পূজা করিয়া থাকে। ভূত প্রেতাদিরও খুব ভয় করিয়া থাকে। যখন গ্রামে মহামারী আদি হয়, তখন ইহারা দেবীর পূজা দিয়া থাকে। পূজা আমাদের তান্ত্রিক পূজার মতন। মদ্য ও মাংসাদি পূজায় ব্যবহৃত হয়। তাহা প্রসাদ রূপে আহার করিয়া স্ত্রী পুরুষাদি খুবই নৃত্য গীত করিয়া থাকে। উত্তর দিকে বরফের পাহাড় ইহার পর তিন মাইল পিথিল নামক স্থান। মধ্যে শ্রদ্ধাঙ্গা নামক গ্রাম পাওয়া যায়। এই খানে দুই তিনটী দোকান আছে। ইহায় পর খেলা নামক স্থান। ইহার উচ্চতা প্রায় ৬০০০ ফুট। খেলাতে বহু লোকের বাস আছে। কয়েক খানি দোকান আছে। একটি স্কুল ও একটি পোষ্ট অফিস আছে। এখান হ'তে ধারচুলা ১০ মাইল। রাস্তা বিশেষ ভাল নয়। জায়গায় জায়গায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখা যাইবে। দেখিতে প্রাণ বায়ু উড়িয়া যাইবার মতন হয়। খুবই সতর্কতায় সহিত আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'তে হয়। আমি কয়েক দিন এখানেতে বাস করিয়াছিলাম। খেলা হ'তে আসিবার সময় পাঙ্গু নামক গ্রাম পাওয়া যায়। সম্মুখে পর্ব্বতের দৃশ্য অতি চমৎকার।

ধারচুলা—খেলা হ'তে ১০ মাইল নিম্নে। এস্থান ৪৫০০ ফুট, এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একখানি শাখা ছিল। বর্ত্তমান কয়েক বৎসর যাবৎ উঠিয়া গিয়াছে। দুই মাইল দূরে তপোবন নামক পরম পবিত্র স্থান। এস্থানে রূমা দেবী নামক এক বিধবা স্ত্রীলোক তপোবন নামক এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি কৈলাশ যাত্রীদের অতি যত্নের সহিত সেবাদি করিয়া থাকেন। আমিও কয়েকদিন এই আশ্রমে বিশ্রাম করিয়াছিলাম। এই ধারচুলা হ'তে কীর্ত্তি শিখরের মার্গ অত্যন্ত খারাপ। কৈলাশ যাত্রী এই প্রথম চড়াই দেখিয়া অনেকে ফিরিয়া আসে। প্রায় ৫ মাইল কঠিন চড়াই করিবার পর তবে উতরাই।

বলবাকোট—ধরাচুলা হ'তে ৮ মাইল। ৬০০০ ফুট উচ্চ। ৪ মাইল যাইবার পর কালীকা নামক স্থান। এস্থান অতি মনোরম। ইচ্ছা হয় বিশ্রাম করিয়া আগে অগ্রসর হবেন।

দিদি হাট—বলবাকোট হইতে ৯ মাইল, প্রায় ৭০০০ ফুট· উচ্চ। এক মাইল দূরে আমকোট নামক স্থান। আমকোটের পার্শ্বে জঙ্গলী লোকের বস্তী। ইহাদের ভ্রমক লোক বলিয়া থাকে। ইহাদের ভাষা ও বেশ-ভূষা বিচিত্র প্রকারের। প্রায় স্ত্রী পুরুষ নগ্ন কাল কাল ভূতের মতন। ইহাদের আরাধ্য দেবতা বাধনাথের উপাসনা করিয়া থাকে। তাহারা প্রাচীন রাজবংশের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা অতি সরল হৃদয়, ঘরে তালা দেওয়া পর্য্যন্ত জানে না। চুরি আর মিথ্যা, ছল,

কপটাদি ইহারা জানে না। কারণ ইহারা জঙ্গলী অসভ্য। আর আমরা সভ্য জাতি আমরাই এই সব বিষয়ে নিপুণ। ইহারা বন্য পশু আদি শিকার করিয়া উদর পূর্ণ করে। দিদির হাট সমান মাঠের উপরে অবস্থিত। অনেক দোকান আছে। নিকটে দেবীর মন্দির, স্কুল ও ডাকঘর আছে।

থল—দিদিরহাট হ'তে ১০ মাইল। প্রায় ৩৫০০ ফুট, স্কুল, ডাকঘর ও কয়েকখানি দোকান আছে। নিকটে রাম গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। বিশ্রামের জন্য অতি উত্তম স্থান। আম গাছ, কলা গাছ, চীর গাছের অতি সুখকর ছায়া, এমন সুন্দর বায়ু প্রবাহিত হ'তে থাকে। শ্রান্ত পথিককে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। দিদিরহাট হ'তে থল পর্য্যন্ত জঙ্গল। এখান দিয়া একাকী মার্গ চলা উচিৎ নয়। হিমালয়ের মধ্যে এত বড় ঘোর জঙ্গল কমই দেখা যায়। ৩০০০ ফুট উচ্চ হইতে ৭০০০ ফুট পর্য্যন্ত চীর গাছ। ৬০০০ হইতে ৯০০০ ফুট পর্য্যন্ত ভোজ পত্রের বৃক্ষ হয়। ইহার পর হইতে বৃক্ষ বিহীন পর্ব্বত। কোন কোন পর্ব্বতে একটু ঘাস মাত্র দেখা যায় না। ইহার উচ্চে কেবল বরফ ও পাথর। পর্ব্বতের বনের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের এক বিচিত্র লীলা দেখা যায়। দাবানলের নাম বোধ হয় শুনিয়াছেন। পরন্তু কম লোকের দেখা হ'য়ে থাকিবে। পাহাড়ে অগ্নি গগন চুম্বি এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে মহাকাল আসিয়া যেন সংসারকে এখনই ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। সমস্ত

আকাশ মণ্ডল ধূম্রবর্ণ অন্ধকারময়, তাহার উপর বৃক্ষাদি জ্বলিবার সময়ে এমন শব্দ হয়, যেন জার্ম্মানের কামান দাগিতেছে। বৃটিশ সরকার সেজন্য এই সব জঙ্গল খুবই সতর্কতার সহিত সুরক্ষিত ভাবে রক্ষা কবিয়া থাকেন। বাজ বলিয়া এক প্রকারের বৃক্ষ হিমালয়ে উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষ ৪ হাজার হ'তে ৮।৯ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। দিদিরহাট হ'তে থল যাইবার মার্গে বাজ বৃক্ষের ভয়ানক জঙ্গল পড়ে। এত অধিক জঙ্গল সূ) .কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। এই জঙ্গলে অনেক হিংস্র প্রাণী বাস করে। জঙ্গলী ভল্লুক যদি সম্মুখে পড়ে তাহা হইলে জীবন শেষ। ইহাদের সম্মুখ হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। ইহারা গাছেও উঠে জলেও সাতার দেয়, তবে এক উপায় যদি অগ্নি দিয়া মশাল জ্বালাইয়া দিয়া ইহাদের দেখান হয়, তখনই পলাইয়া যায়। নতুবা কিছুতে ইহারা ভয় করে না। এত বৃহৎ সর্প এই জঙ্গলে দেখিয়াছি যাহা আমি পূর্ব্বে কলিকাতার যাদুঘরে দেখিয়াছিলাম। রাত্রে এরাস্তায় কেহই চলা ফেরা করে না। এই বাজ বৃক্ষ কোন প্রকারের কর্ম্মে আসে না। পাহাড়ী লোক কেবল জ্বালাইবার জন্য নিয়া থাকে। বৃক্ষও খুব বড় বড় হয়। এই জঙ্গল আমি অতি কষ্টের সহিত পার হ'য়েছি

বেরীনাগ—থল হইতে ১০ মাইল। প্রায় ৭ হাজার ফুট রাস্তা ভয়ানক চড়াই। পর্ব্বতের শিখরের উপরে এই বস্তী। এইখানে ডাকঘর, ডাকবাঙ্গলা, স্কুল, তথা ছোট একটী বাজার।

অতি রমণীয় স্থান। দূর হইতে চির তুষারমণ্ডিত শ্বেত পর্ব্বত দেখিতে অতি সুন্দর দেখায়। ইহার দুই মাইল দূরে গড়বল নামক একটী গ্রাম আছে।

গণাই—বেরীনাগ হইতে ১২ মাইল। সরযু নদীর তীরে বিশ্রামের জন্য অতি সুন্দর স্থান। বৃক্ষের শীতল ছায়া, ডাক ঘর, ডাকবাঙ্গলা, কিছু দূরে তপোবন নামক সুন্দর স্থান।

সীরাঘাট—গণাই হইতে ৭ মাইল। নিকটে সরযু নদী ছোট একটি বাজার। ৬ হাজার ফুট উচ্চ, নিকটে জল।

ধোলাদিন—সীরাঘাট হইতে ১১ মাইল। ৬০০০ ফুট উচ্চ। এই খানে কয়েক খানি দোকান ডাকঘর, স্কুল, ডাক-বাঙ্গলাদি আছে। ইহার ৫ মাইল দূরে বারছীনা, আলমোড়া, হইতে ৭ মাইল। ছোট একটি বাজার, ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর, একটি ছোট স্কুল। নিকটে গ্রাম।

আলমোড়া

কৌশিকিশাল্মলী মধ্যে পুণ্যাঃ কাষায় পর্ব্বতং

কৌশিকিশা শাল্মলী নদীর মধ্যে পূর্ণ জনক কাষায় পর্ব্বত অবস্থিত। কৌশিকা বা কোশী নামে কথিত হইয়াছে। আলমোড়ার নিকট কোশী নদীও আছে। ৩ ক্রোশ দূরে কাষায়েশ্বর ও কাশায়েশ্বরীর মন্দির বিদ্যমান।

আলমোড়া নাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“আলম” শব্দ হইতে

আলমোড়া শব্দে পরিণত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এক রাজা স্বর্ণ নির্ম্মিত পাত্রে অম্লদিয়া এক মন্দিরে দান করিয়াছেন বলিয়া আলমোড়া নাম পড়িয়াছে। সঙ্গে এই পর্ব্বতকেও দান করিয়া ছিলেন। সেই অবধি এই স্থানের নাম অমল শব্দ হইতে আলমোড়া হইয়াছে। এই হিমালয়ে পূর্ব্ব হইতে বহু ব্রাহ্মণের বস বাস ছিল। যখন দেশে মুসলমানরা খুব অত্যাচার করিতেছিল, তখন বহু ব্রাহ্মণ আপন আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য এই সব অঞ্চলে চলিয়া আসেন, কাঠ গোদাম ষ্টেশন হইতে ১৫ মাইল উপরে গর্গাচল পর্ব্বত শুনা যায়। এখানে গর্গঋষি তপস্যা করিতেন, আমি নিজে প্রায় ৪ মাস এখানে বাস করিয়া ছিলাম। এই গর্গ পাহাড়ে বর্ত্তমানে আপেলের বাগান আছে। প্রায় ৭ হাজার ফুট উচ্চ। জলবায়ু অতি উত্তম। কিন্তু গরমের দিনে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তণের আলমোড়াই ভাল। এই আলমোড়া বহু পুরান ঐতিহাসিক নগর। পুরাকালে এখানে কার্ত্তিকেয় শব্দ হইতে "কাতুর" শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান বৈজনাথ নামক স্থানের নিকট এই বংশীয়রা করবীরপুর নামক একটী নগর স্থাপন করেন। ইহার ভগ্নস্তুপ দেখিলে বেশ বুঝা যায়। কালক্রমে এস্থান অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় লোক চলিয়া যায়। এই বংশের শিলালেখ ও তাম্রলিপি বাগেশ্বরের ও পাণ্ডুকেশ্বরের মন্দিরে এবং কতিপয় ভুস্বামীর নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই রাজ বংশের বংশধরেরা আনকোট প্রভৃতি স্থানে এখন ও পূর্ব্বে গৌরবের নাম মাত্র অবশেষ রক্ষা করিয়া পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া থাকে।

কাতুর রাজ বংশের হীন অবস্থার সহিত এদেশে চন্দ্র বংশের আবির্ভাব হয়। এই বংশের আদি পুরুষ সোমচন্দ্র নামক কোন চন্দ্রবংশের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাহার পর পবম্পর ভাবে এই বংশ রাজত্ব করেন।

এই চন্দ্রবংশের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে নেপালীরা কুমায়ু ও গরবাল প্রদেশ আক্রমন করেন। নেপালের এই সময়ে অভ্যুদয়ের আরম্ভ হয়।

নেপাল রাজ সমদর্শি হ'লেও তাঁহার কর্ম্মচারীরা অমানুষিক অত্যাচারী ছিল। জন সাধারণের বৃথা কষ্ট দিয়া, মহান অপ্রিয় হয়। এক সময়ে নেপালীরা তাহাদের উপর যাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগকে এক রাত্রিতে নিহত করিয়াছিল। যে বাত্রে এ ঘটনা সাধিত হয়, সে রাত্রির কথা কুমায়ু বাসীদের মধ্যে প্রবাদ বাক্যরূপে পরিণত হইয়াছে। "মঙ্গল কি রাত, বলিয়া বিভীষিকার সহিত উচ্চারণ কয়িয়া থাকে। পুনঃ এক সময়ে নেপালীরা, কুমায়ু বাসীদের উপর নূতন কর স্থাপন করেন। কিন্তু কুমায়ু বাসীরা ইহা দিতে ইতস্ততঃ করাতে নেপালী শাসন কর্ত্তা ১৫ শতের উপরে গ্রামের মণ্ডলদিগকে আলমোড়ায় আসিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। গ্রামবাসীরা কল্প

বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আগমন করিলে, তাহারা সকলে নৃশংস ভাব নিহত হইয়াছিল। আবার হরিদ্বারে প্রায় দু লক্ষ দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিল। এই সব নানা কারণে পর্ব্বতের অধিবাসী নীচে আসিয়া বাস করিতে থাকে। নেপাল রাজ যদি সে সময় হইতে সৎভাবে রাজত্ব করিত, তাহা হলে সমস্ত হিমালয়ে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের একচ্ছত্র শাসনাধীন থাকিত। এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আলমোড়া স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বিশেষত যক্ষা রোগীর পক্ষে, চির বৃক্ষের বায়ুতে আদ্রতা না থাকা বসতঃ ফুস্ ফুস্ রোগীর পক্ষে, অতি স্বাস্থ্যকর। এই খানে প্রায় ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে। এজন্য এই স্থানের শুষ্কতা রোগীর পক্ষে অনুকূল। এই স্থানে এক কুষ্ঠালয় আছে। ৫৫০০ ফিট উচ্চ। শীতকালে তুষার পাত হয়। এখানে আমি অনেকবার গিয়াছি। বহু ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রথম যখন আমি আলমোড়া যাই (১৯৩১ইং) তখন পল্লী মহল্লাতে জীর্ণ শীর্ণ একটি প্রাচীন মন্দিরে আশ্রয় নেই। তাহার পর এক সুব্রাহ্মণ শ্রীমান পণ্ডিত কৃপাল দত্ত যোশী এ মন্দিরের জীর্ণ উদ্ধারের জন্য অনেক সাহায্য করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের একটি আজমীরে পুস্তকালয় আছে। সে পুস্তকালয়ে মুক্তিপত্র, হিন্দি, বাংলা গুজরাটি ও পাঞ্জাবী ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে সব বিক্রি হইয়া গিয়াছে। এইরূপে জল বায়ু ও প্রাচীণ স্মৃতি বিজড়িত আলমোড়া

নগর। কুমার পাণ্ডের চড়াই প্রায় কাঠ গোদাম ২২মাইল দূরে নৈনিতাল। চারিদিকে বৃক্ষ এবং পর্ব্বতের মধ্যে প্রায় ২মাইল লম্বা এক মাইল চওড়া একটি সরোবর। নৈনিতাল ৭হাজার ফুট উচ্চ। প্রাকৃতির সৌন্দর্য্যের এক বিচিত্র লীলা। গরমের দিনে সংযুক্ত প্রান্তরের সরকার এখানে বাস করেন। অনেক ভদ্রলোকও বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আসিয়া থাকেন। কাঠ গোদাম হ'তে সীধা মোটরের রাস্তা। নৈনিতাল হ'তে ভুবানি ৬ মাইল। এই রাস্তা রাণীখেত হ'য়ে আলমোড়ায় যায়। নৈনিতাল জেলায় প্রায় ৬০টি তাল বা সরোবর আছে। ইহার মধ্যে কোনটি ছোট কোনটি বড়। দেড় মাইল নিচে নৈনিতাল হ'তে মোহংস্বামীর আশ্রম ছিল। বর্ত্তমানে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। ভুবানী হইতে ৬ মাইল দূরে ভীমতাল, এইখানেও আমি অনেক বার গিয়াছিলাম। এইখান হ'তে ৪ মাইল দূরে ও উপরে গর্গাচল পর্ব্বত। এই খানে ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ডাক বাঙ্গলা, তার ঘর, ডাকঘর ও ছোট একটী বাজার আছে। গরমের দিনে পাঞ্জাব অন্তর্গত জিন্দ মহারাজ এইখানে বাস করেন। এই খানের জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ, প্রায় ৪ হাজার ফুট উচ্চ এই ভীমেশ্বরের মন্দিরের জীর্ণ উদ্ধারও আমি করিয়াছিলাম। ইহার জন্য ৩ হাজার টাকা জিন্দ মহারাজ হইতে লইয়া ছিলাম। ইহার দুই মাইল দূরে নল দময়ন্তি তাল। ইহার নিকটে ছোট একটী শিবালয়, এইখানে আমি

এক সময়ে চারি মাস বাস করিবার পরে একদিন স্বপ্ন দেখি। এই তালের উত্তর কোন অতি প্রাচীন দুইটী নারায়নেব মুর্ত্তি রহিয়াছে। প্রাতঃকালে জলে নামিয়া খোঁজ করাতে সত্যই মুর্ত্তি পাওয়া গেল। ইহার স্থাপনা স্থানীয় ভদ্রলোকেব সাহায্যে করিয়া থাকি, মুর্ত্তি দেখিলে মনে হয় বহু প্রাচীন অতি সুন্দর কাল পাথরের। এই স্থান বড়ই মনোরম, তিন দিকে জঙ্গল, তপস্যার অনুকুল। ভীমতাল হ'তে ৪ মাইল দূরে নয় কুচিয়া তাল, ইহারও খুব বড় তাল, ইহার পরিধি প্রায় ২ মাইল। দময়ন্তি তাল হ'তে ২ মাইল চড়াই করিলে সাত তাল এই খানে ছোট ছোট অনেক তাল, যেমম বাম তাল, পান্না তাল, সীতা তাল, গরূঢ় তাল, আদি অতি সুন্দর তাল বা সরোবব আছে, এই কুসায়ু বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। এই সব অঞ্চলে আমি অনেক রার ভ্রমণ করিয়া ছিলাম। এবং যৎ সামান্য এ পুস্তকে বর্ণন করিলাম। ঋষিকেশ হ'তে যাত্রা করিয়া প্রায় দেড় হাজার মাইলেরও অধিক রাস্তা অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের একপ্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি কঠিন রাস্তা মহাত্মার আশীর্ব্বাদে ভ্রমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাহাদের সকলের চরণে দণ্ডবৎ প্রণামি করিয়া এবং পাঠক পাঠিকা সকলের শুভ কামনা করি।

বিধাতু বিশ্ব রূপস্য ত স্যোছায়া প্রভাবতঃ।
তাস্মা জ্যেতির্ম্মায়াদ্ দেবা জ্যোতী রূপেন নির্গতঃ॥

হিমাদ্রি শিখরে গ্রন্থ সন্নাম শুদ্ধতাং গতঃ।
তদ্ বিশ্ব মুর্ত্তি পূজায়াস্ অস্তু দীপঃ শিবান্বিতঃ॥

সেই বিশ্বরূপী বিধাতার ইচ্ছা প্রভাবে সেই জ্যোতীর্ম্ময়, লীলাময় দেবতা হ'তে জ্যোতী রূপে নির্গত এবং তাঁহারই নাম দ্বারা শুদ্ধতা প্রাপ্ত এই মহা গ্রন্থ হিমাদ্রি শিখরে তাঁহারই বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বনাথের পূজার উপচার স্বরূপ মঙ্গলময় প্রদিপ হউক।

ইত্যোম্—

শিবমস্তু

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅন্নদা চরণ মিত্র, ৮।এ, *দেবেন্দ্র* ঘোষ রোড, ভবানীপুর কলিকাতা। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা—২৫। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় পাওয়া যাইবে।